Based on "Mind Wars" by Marie D. Jones and Larry Flaxman

মাইন্ড ওয়ারস

সরকার, মিডিয়া ও গোপন সংস্থা যেভাবে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে

রূপান্তর
ইরফান সাদিক

মুখোশের অন্তরালে
ভয়ংকর গোয়েন্দা ষড়যন্ত্র
নাজমুল চৌধুরী

গ্যাড সিমরনের "MOSSAD EXODUS" অবলম্বনে
মোসাদ এক্সোডাস
রূপান্তর
তাইরান আবির
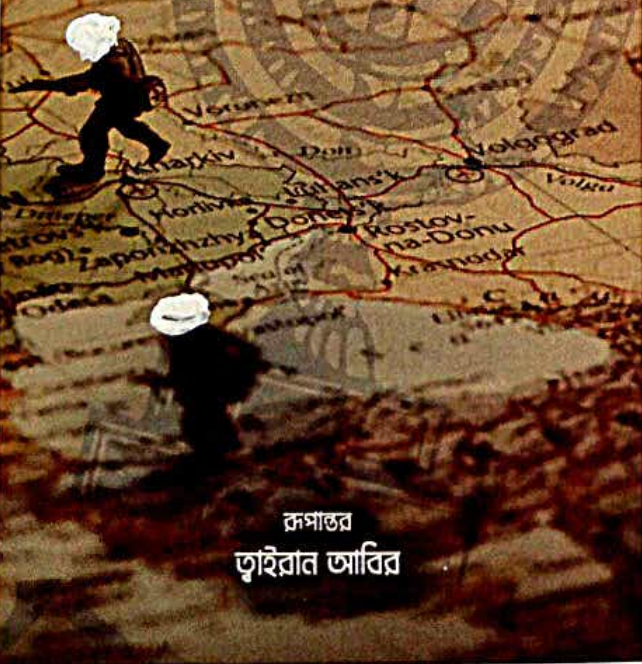
মাইন্ড ওয়ারস

কে আপনাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে?

মাইন্ড ওয়ারস

কে আপনাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে?

মূল:

ম্যারি ডি জোনস ও ল্যারি ফ্লাক্সম্যান

রূপান্তর:

ইরফান সাদিক

সম্পাদনা:

আহমদ মুসা

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮

facebook.com/projonmopublication

www.projonmo.pub

মাইন্ড ওয়ারস

কে আপনাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে?

প্রকাশকাল: বইমেলা ২০২১

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/projonmo

amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Mind Wars by Marie D. Jones & Larry Flaxman, Transformed by Irfan Sadik, Edited by Ahmod Musa

Published by Projonmo Publication

ISBN: 978-984-95187-1-6

“বর্তমান বিশ্বে Mind Control কিংবা মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ খুবই সুক্ষ্মভাবে পরিচালনা করা হয়। ভালো হয় যদি এ কৌশলগুলো শিখে নেওয়া যায়। এ বিষয়টির উপর জোনস ও ফ্লাক্সম্যান আমার দেখা সবচেয়ে ভালো পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। ব্যাপকভাবে গণমাধ্যম ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের দিক থেকে মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ দুর্বৃত্ত অভিজাত মানুষদের জঘন্যতম অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। যদি জ্ঞানই শক্তি হয়, তাহলে এ বইটি হলো মানসিকতা নিয়ন্ত্রণের ক্রিপ্টোনাইট!”

–গ্রেগ কার্লউড।

Conspiracy পডকাস্টের পরিচালক।

The Higherside Chats.

“যারা মনে করে আমাদের নিয়ন্ত্রণ ও জানার চাহিদা আজকালকার ঘটনা... পুনরায় ভাবুন! বইয়ে ম্যারি ডি জোনস ও ল্যারি ফ্ল্যাক্সম্যান দেখিয়েছেন যে সমগ্র ইতিহাসজুড়েই পরাশক্তিগুলো কীভাবে গোয়েন্দাবৃত্তি, প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। সাথে সাথে তারা আমাদের মানসিকতাকে তাদের ইচ্ছেমতো পরিবর্তনের জন্য নজরদারি করেছে। এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে! কিছু বছরের মধ্যেই দেখা যাবে প্রযুক্তি আমাদের ব্যক্তিগত বোধবুদ্ধিকে সেকেলে করে দিয়েছে। অবস্থাটা তখন কত খারাপ হতে পারে তা বোঝার জন্য “Mind Wars” বইটি পড়ুন। এখন ভাবার সময় নেই। ‘তারা’ নিষিদ্ধ করে দেওয়ার আগেই বইটি পড়ে ফেলুন!”

–জিম হ্যারোল্ড

প্রেসিডেন্ট, Jim Harold Media LLC; আয়োজক, The Paranormal Podcast and Jim Harold's Campfire; লেখক, Jim Harold's Campfire: True Ghost Stories and True Ghost Stories: Jim Harold's Campfire 2

সূচিপত্র

লেখকের কথা

বিষয়টি খুবই জটিল। এ নিয়ে অনেক ধরনের বিরোধী মত, বিতর্কিত প্রমাণাদি, কল্পনা, ষড়যন্ত্র ও তত্ত্ব আছে। পরিসংখ্যান বা বিচ্ছিন্ন মতগুলো নাই বা বলি। আমরা মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির ব্যাপারে কোনো তথ্যই অবহেলা করিনি। গভীর পর্যবেক্ষণ করেছি, যাচাই করেছি। প্রতিটি শব্দই যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা অনেক বিষয়েরই সুগভীর আলোচনা করেছি। আমরা আমাদের সাধ্যমতো মূল বিষয়গুলো আলোচনার চেষ্টা করেছি এবং প্রয়োজনমতো সুগভীর আলোচনাও করেছি। আমরা পাঠকদেরও অনুরোধ করি যেন তারা তাদের জ্ঞান থেকে আমাদের বইকে সমৃদ্ধ করেন। এখানে অনেক লেখার সাথেই প্রকাশক একমত নন। কিন্তু সবক্ষেত্রে প্রকাশকের পছন্দের দিকে নজর রেখে লিখতে গেলে বই মান হারায়। আমাদেরকে সে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমরা বিষয়টির প্রতি পাঠকদের কৌতূহল সৃষ্টির জন্য শক্তিশালী তথ্য আনার চেষ্টা করেছি। বিষয়টি খুবই গুরুতর। জ্ঞানই শক্তি আর বিবেক নিয়ে জুয়া খেলা সবচেয়ে বড় বোকামী।

একে ভালোভাবে ব্যবহার করুন।

বুদ্ধির খেলা: সামষ্টিক বিবেকের পরিবর্তন

"ব্রেইনওয়াশ করার মাধ্যমে আপনার চিন্তাকে ধোঁয়াশাপূর্ণ করে দেওয়া হয়। গ্রহণযোগ্যতার স্বতন্ত্র মাপকাঠি দাঁড়িয়ে যায়। আকর্ষণ ও ঘৃণার সংজ্ঞা বদলে যায়। আপনি বাস্তবতা থেকে ছিটকে পড়েন। আপনার আকর্ষণ ও ধোঁয়াশা নতুন বাস্তবতা তৈরি করে।"

- এডওয়ার্ড হান্টার, Brainwashing।

"সবচেয়ে ভয়ংকর প্রযুক্তি হলো সামষ্টিক বিবেককে পরিবর্তনের প্রযুক্তি। যে কেউ এভাবে সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব করতে পারে।"

- তালবোট মান্ডি।

আমরা প্রত্যেকেই একটা কল্পনার রাজ্যে হাবুডুবু খাই। আমরা প্রবেশ করি, দর্শন করি ও উপভোগ করি। আমাদের মনে এক আলেকজান্ডার ধরনের ভাব আসে। "আরেহ! আমি তো স্বাধীন! এই যে, যা খুশি তাই করছি!" আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি দিই, প্রশংসা পাই, খুশি হয়ে উঠি। আর ভাবি যে আমরা অনেক নিরাপদ। দিচ্ছি, রিয়েক্ট পাচ্ছি- ব্যস! অথচ আমাদের মাথায়ই থাকে না যে অনলাইনের সকল তথ্য একটা গ্লোবাল আর্কাইভের আওতায় থাকে। আপনার ডিলেট মানে শুধু আপনার পিসি থেকেই ডিলেট। আমরা পলিথিনের মতোই আবৃত—ঢেকে থেকেও সব উন্মুক্ত।

বাস্তব জগতের এ অবস্থা দেখে আমরা ভেবে নিই, "আচ্ছা যাই হোক, আমার অন্তরের গোপনীয়তা তো আর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না!" কেননা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট হওয়া ছাড়া তো কেউ আমাদের একেবারে একান্তের অনুভূতি, গোপন ব্যক্তিগত চাহিদা, চিন্তা বুঝবে না। আমরা মনে করি, আমাদের মন কেবল আমাদেরই। আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষও আমি না জানালে কিচ্ছু জানবে না।

আমরা, কেবল আমরাই আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করি, আমাদের মনে ভাবি, আমাদের কাজের পরিকল্পনা করি, আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করি, কেবল আমরাই আমাদের জগৎ নিয়ন্ত্রণ করি।

আমাদের মন কেবলই আমাদের।

মানবসভ্যতার প্রথম থেকেই কিছু মানুষ আমাদেরকে তাদের মতো ভাবানোর চেষ্টা করেছে। আমাদের পবিত্র, Golden Fleece, a Holy Grail এর মতো অন্তরটাকে তারা তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও এজেন্ডায় কাজে লাগিয়েছে। তারা এভাবে তাদের প্রভুকে খুশি করে।

আমরা যবে থেকে আমাদের অন্তরকে নিজের ভাবতে শিখেছি, তখন থেকেই কেউ না কেউ আমাদের বিবেক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় মত্ত।

ইতিহাসে মন নিয়ন্ত্রণকে অনেক নামেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কিন্তু সবসময়ই এর লক্ষ্য ছিল আমাদের চিন্তার শক্তি ছিনিয়ে নেওয়া এবং আমাদের কাজ ও স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা। Brainwashing, coercion, thought reform, mental manipulation, psychological warfare, programming, conversion, gas lighting, indoctrination methods, psychic driving, crowd control—যে নামেই আপনি একে ডাকুন না কেন, এটি আপনার চিন্তাশক্তি, বিবেককে ধ্বংস করার কাজেই লাগানো হয়। অনেক সময় আমাদেরকে অন্যের মতো ভাবতেও শেখানো হয়। হতে পারে আপনাকে তারা একজন দক্ষ গুপ্তঘাতক কিংবা যোদ্ধা বানিয়ে তুলবে, নিজেদের ধর্ম বা রাজনৈতিক আদর্শে আপনাকে প্রবেশ করাবে ও বিজয়ী শক্তির মতাদর্শ অনুযায়ী আপনাকে ভাবতে শেখাবে। এমনটা আগেও করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে, সন্দেহ নেই ভবিষ্যতেও হবে।

অনেকেই দাবি করেছেন, বিজ্ঞানী ও পর্যবেক্ষকরা একে কেবলই একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে দেখেন। বাস্তবতা তা নয়। American Psychological Association এর বার্ষিক সভায় মূল সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তাদের এজেন্ডা ছিল , সন্ত্রাসী, ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলোর বিবেক নিয়ন্ত্রণের শিকার লোকদের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা। ২০০২ সালের নভেম্বরে APA এর প্রেসিডেন্ট কলামে "Mind Control: Psychological Reality of Mindless Rhetoric," শিরোনামে ড. ফিলিপ জি জিমবারডো লিখেছেন, "সামাজিক বিজ্ঞান আমাদেরকে জানায় যে, বিবেক নিয়ন্ত্রণের স্বীকার যেকোনো ব্যক্তিই মিথ্যা বা ভুল স্বীকারোক্তি দিতে পারে। তারা তাদের শিখিয়ে দেওয়া শত্রুদেরকে হত্যা, নির্যাতন করতে পারে। মিথ্যা বা ভুল যেকোনো উদ্দেশ্যের জন্য তারা তাদের সম্পদ,

পরিবার এমনকি জীবনও দিয়ে দেয়"। জিমবারডো আরো বলেন, "এ তুমুল শক্তি ও শক্তিশালি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। নয় আমরা একে প্রতিরোধ করতে পারবো না এবং প্রতিদিন আমাদের উপর নির্মম ও বেআইনি এক্সপেরিমেন্ট করা শয়তানদের সহজ শিকারে পরিণত হবো"।

জিমবারডো আসলে সকল ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি, সরকার, পাদ্রী, সন্ত্রাসী নেতা ও গোয়েন্দাবাহিনীর কথাই বুঝিয়েছেন। প্রত্যেকেই আমাদের অন্তরের অংশ চায় এবং তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

বিবেক নিয়ন্ত্রণে পপ কালচার

ক্ষমতাসীন কিংবা বিজয়ী শক্তিদের মারাত্মক ব্রেইনওয়াশ নিয়ে যখন কথা আসে, তখনই চলে আসে পপ কালচারের কথা। পপ কালচার ক্ষমতাসীন, সরকার কিংবা সরকারের গডফাদারদের ইচ্ছানুযায়ী গল্প ও ছবি চিত্রায়িত করে। ওয়ার মুভিগুলোতে দেখানো হয় যুদ্ধবন্দিদের উপর বিজয়ীদের কী মারাত্মক নির্যাতন! তাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখা হয়, এমনকি সূর্য বা আলোর সংস্পর্শেও আসতে দেওয়া হয় না। এসবই করা হয় তথ্য আদায়ের জন্য। জিজ্ঞাসাবাদ, প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তুমুল নির্যাতনগুলো মানসিকভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালি লোককেও টলিয়ে দেয়।

Brainwashing শব্দটি আমরা সবাই জানি। প্রথম এ ধারণাকে পরিপুষ্ট করে চাইনিজরা। তারা মাও সে তুং এর সময় প্রত্যেককে 'সঠিক পথ' দেখানোর জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করতো। ১৯৫০ সালের অক্টোবরে Miami News এ প্রথম ইংরেজি ভাষায় এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। সংবাদের শিরোনাম ছিল , "Brain Washing Tactics Force Chinese Into Ranks of Communist Party," সাংবাদিক ছিলেন এডওয়ার্ড হান্টার। হান্টার আসলে সিআইএর একজন প্রপাগাণ্ডা কর্মী ছিলেন। তিনি সাংবাদিক হয়ে এ কাজ করতেন। সংবাদটা এতই জনপ্রিয়তা পায় যে পুরো ঠান্ডা যুদ্ধের সময় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আজও বিবেক নিয়ন্ত্রণকে আমরা Brainwashing বলেই সম্বোধন করি। ব্রেইনওয়াশড মানুষ ভুলে যায় তার নিজস্ব চিন্তা চেতনা, নৈতিকতা এবং এ সুযোগে ব্রেইন ওয়াশকারীরা ইচ্ছেমতো তাকে পরিচালনা করে।

কোরিয়ান যুদ্ধে যুদ্ধবন্দিদের উপর এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। তবে এটা সত্য যে তারা মারাত্মক নির্যাতন ও অপমানজনক পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। "Communist Interrogation, Indoctrination, and Exploitation of Prisoners of War" শিরোনামে মোট ১৯৫৬টি ডকুমেন্ট উদ্ধার করা হয়। সেগুলোর কোথাও নির্যাতনের কারণ হিসেবে বিবেক নিয়ন্ত্রণ বা ব্রেইনওয়াশের উল্লেখ নেই। নির্যাতন হয়েছে, তবে সেটা ঠিক কেন তা জানা যায় না। অনেকেই দাবি করেন যে আমেরিকা যুদ্ধবন্দিদের একেবারে ব্রেইনওয়াশ করে ছেড়েছে, ফলে তারা চাইনিজদের শত্রুদের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

যুদ্ধবন্দিরা পালানো শুরু করে জেল থেকে। তখন সবাই সেদিকে নজর দেয়। যুদ্ধবন্দিদের পালানোর কারণ হিসেবে সিআইএকে অভিযুক্ত করা হয়। বলা হয় যে তাদের ব্রেইনওয়াশ প্রজেক্টের কারণেই মূলত এ দশা। পুরো পলায়নকে ব্যাখ্যা করতেই এ দাবি করা হয়। দাবিদাররা অনেকে আবার নিজেরাও ব্রেইনওয়াশিং কার্যক্রমে যুক্ত। আমরা বিষয়টি সামনে আরো ব্যাখ্যা করবো।

Unification Church–এর সাবেক সদস্য ও কাউন্সিলর, বর্তমানে Freedom of Mind Center–এর পরিচালক স্টিভেল আলান হাসান তার ওয়েবসাইটে বিবেক নিয়ন্ত্রণের নিকৃষ্টতম পদ্ধতিগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি চারটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন–

১. আচরণ

২. তথ্য

৩. চিন্তা

৪. আবেগ

এ চারটি বিষয় নিয়ন্ত্রণে আনা গেলে মানুষের 'মানসিক বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতাকে' হাতে নিয়ে আসা যায়। বোঝা যাচ্ছে, কেন চার্চ তাদের অনুসারীদের নির্জন স্থানে রাখে। ভিক্টিমের তথ্যগুলো ব্যবহার করেই তারা চার্চের সদস্যদের জন্য আলাদা এক বাস্তবতা তৈরি করে। অনেকটা মিথ্যা বলতে গিয়ে সুন্দরভাবে সত্যকে ব্যবহার করা। ধরুন, আপনি পায়ে ব্যথা পেলেন। আপনার বাবাকে আপনি বললেন, "বাবা, পায়ে ব্যথা পেয়েছি। সারাতে ৫০০০ টাকা লাগবে।" ব্যথা

পেয়েছেন সত্য, কিন্তু এতো টাকা আপনি আসলে হাতিয়ে নিচ্ছেন। এটাই সত্যকে ব্যবহার করে মিথ্যা বলা। এভাবেই কাল্ট সদস্যদের নির্বাচন করা হয়।

আমাদের কাছে বিবেক নিয়ন্ত্রণের বাস্তবতা, তথ্য ও সম্ভাব্য কারণগুলো আসে মুভি, গোয়েন্দা গল্প কিংবা কট্টরপন্থী সংগঠনগুলোর বার্তা (যেমন: "তুমি আমাদের সাথে যোগ দাও। তুমি কখনোই ছেড়ে যেতে পারবে না!"), বাচ্চাদের উপর স্যাটানিক অপপ্রচার, কোনো যোদ্ধার জীবনবন্দনা, LSD বা ইলেক্ট্রিক শক থেরাপির মাধ্যমে বন্দি নির্যাতনের খবর, কিংবা বন্দিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে। আমরা এসব থেকে পুরো বাস্তবতা যাচাই করা ঠিক হবে না। পপ কালচার কীভাবে আমাদের মানসিক ফ্যান্টাসি বা চাহিদা নিয়ে খেলে তা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করবো।

আমরা আগে মনে করতাম যে পাগল কোনো বিজ্ঞানী গরীব, পাগল জনগোষ্ঠীর উপর তার এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছেন। আমাদের কাছে বিবেক নিয়ন্ত্রণ ছিল এতোটুকুই। আজকে তথ্যগুলোকে আরো রঙচঙ মাখিয়ে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা ভালো গল্প, কল্পনা এমনকি সফল প্রযুক্তির ব্যবহারও এতে যোগ করেছে। আমরা এ গল্পগুলো খুবই পছন্দ করি। বাহ! কী আবেগ, কী থ্রিলার! একটু থামুন! ঘুরে দাঁড়ান, জিজ্ঞেস করুন, "এগুলো কতখানি গল্প ও কতখানি বাস্তব?" বিষয়টি বিনোদন না মোটেই। বিনোদনও ভেবেচিন্তেই নেওয়া উচিত। জীবন তো আর ছেলেখেলা নয়!

একটি উদাহরণ দিই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ইউরোপে চালানো এক জরিপে ৬২% মানুষ জার্মানির পতনের পেছনে মূল যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সোভিয়েতকে, ২৩% ব্রিটেনকে ও বাকিরা আমেরিকাকে। ২০০৪ সালে একই জরিপ চালালে দেখা যায়, ৬৫% মানুষ বলছে এ জয় আমেরিকার, ১০% বলছে সোভিয়েতের। অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন কীভাবে হলো? The Imitation Game দেখুন। বুঝবেন পপ কালচারের প্রভাব কাকে বলে।

Mind Control বা বিবেক নিয়ন্ত্রণের উপর *The Manchurian Candidate* হয়তো সবচেয়ে জনপ্রিয় মুভি। এটি রিচার্ড কন্ডনের লেখা একটি রাজনৈতিক থ্রিলার। একে দুইবার মঞ্চায়ন করা হয়। ১৯৬২ সালে মূল চরিত্রে ছিলেন ফ্র্যাংক সিনাত্রা ও এঞ্জেলা ল্যান্সবারি। একই চরিত্রে ২০০৪ সালে ছিলেন ডেনজেল ওয়াশিংটন এবং মেরিল স্ট্রিপ। মুভিটি ছিল সম্ভ্রান্ত এক রাজনৈতিক

পরিবারের ছেলের আসাসিন বা গুপ্তঘাতক হয়ে ওঠার গল্প। মুভির প্রেক্ষাপট ছিল কোরিয়ান যুদ্ধ। মেজর ব্যানেট মার্কোকে তার প্লাটুনসহ কিডন্যাপ করা হয় এবং ম্যানকুরিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে ও তার সৈন্যদেরকে ব্রেইনওয়াশ করা হয়। পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসার পর মেজর ব্যানেট হয়ে ওঠেন একজন ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক। অথচ তাকে তার সার্জেন্টরা হিরো মনে করতো। তিনি অসংখ্য গোয়েন্দাকে ধোঁকা দিয়েছেন এবং অনেকের দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে উঠেছেন। অবশ্য তিনি পরে আবিষ্কার করেছেন যে শুধু তিনিই না, ভিক্টিম আরো অনেক আছে।

পুরো ট্রাজেডির মূল কারণ ছিল শক্তিশালি ও শয়তান এক নারী। ল্যান্সবারি ও স্ট্রিপ তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সেই পেছন থেকে পুরো গেইমটি খেলেছে।

মুভিটির ব্যাপারে অনেক সমালোচনাই আছে। তবে যারা আসলে Sleeper Assassin বা গোপন গুপ্তঘাতকদের সম্পর্কে জানেন, এ সম্পর্কে সরকারের পরিকল্পনা কিছুটাও জানেন, এ মুভিটি তাদের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। সিআইএর MKUltra প্রজেক্ট এমন একটি প্রজেক্ট। এটি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

আরো একটি মুভি হলো *Conspiracy Theory.* এখানে MKUltra-কে এক ক্যাব ড্রাইভার- জেরির (অভিনেতা মেল গিবসন) মাধ্যমে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে US Justice Department এর সুন্দরী আইনজীবী এলিসকে (অভিনেত্রী জুলিয়া রবার্ট) পটাতে চেষ্টা করছিল। জেরির চরিত্র ছিল একেবারেই বাস্তব। সে অতীত ভুলতে পারে না। তার মনে MKUltra থেকে ফিরে আসার একটি ঝাপসা স্মৃতি বারবার ভেসে উঠত। সে একসময় বুঝতে পেরেছিল সিআইএর লোকরা তাকে অনুসরণ করছে। এলিসও বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। একসময় সে এক ভয়াবহ ফলাফলে উপনীত হয়। পুরো মুভিটি ছিল ক্লাসিক MKUltra ডায়ালগ, নির্যাতন, অনুসরণ, পেটানো, বিরক্ত করা, হয়রানির একটি ছোট চিত্রায়ন। একে *Catcher in the Rye* এর উত্তরাধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। ট্রিগারের আলোচনাও হয়েছে এখানে। ট্রিগার মানে হলো গুপ্তঘাতক, এজেন্টদেরকে কাজে লাগানোর একটি প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি হাততালিও একজনকে হিপনোটিক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে।

আপনি যদি কোনো একজনকে কোনো এক প্রক্রিয়ায় হিপনোটাইজ করেন, পরবর্তীতে তেমন কিছু তার সামনে পড়লে সে হিপনোটিক অবস্থায় চলে যাবে।

গল্পে গল্পে বিবেক নিয়ন্ত্রণ

থ্রিলিং পপ কালচারের প্রভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে সাম্প্রতিক সময়ের War on Terror এও দেখা যায়। American Sniper, Captain America, 13 Hours কিংবা The Looming Tower-আমেরিকার মানবতার জয়জয়কার। সায়েন্স ফিকশন আকারেও মাইন্ড ওয়ারসকে মঞ্চায়ন করা হয়। মূল বার্তা হলো, 'তারা' আমাদেরকে বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করছে, আমরাই বলির পাঁঠা। আমাদের কিচ্ছু করার নেই। কিছু মুভি আমাদেরকে এক ভূতুড়ে ও নাটকীয় হিপনোটিক অবস্থায় নিয়ে যায়। এমন একটি মুভি হলো *Shutter Island*। এটি ২০১০ সালে মুক্তি পাওয়া একটি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। বিখ্যাত মার্টিন স্কোরসিস এর পরিচালক ছিলেন। মুভির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন লিওনার্ডো ডি ক্যাপ্রিও। তিনি তার চিন্তা, পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্ত ছিলেন। তার নিজের মনে গড়ে তোলা এক কাল্পনিক বাস্তবতায় তিনি একটি কেস সমাধান করছিলেন। তিনি একটি এসাইলামে যান। সেখানে মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করার প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হতো। ডি ক্যাপ্রিওর আরেকটি মুভি হলো *Inception*। সেখানে দেখানো হয়েছে যে আমরা খুবই পারদর্শীতার সাথে মানুষের স্বপ্নে প্রবেশ করতে পারি ও তার আইডিয়া চুরি করতে পারি।

বিনোদনের জগতে বিবেক নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া বোঝার জন্য আমরা কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

- *Trilby* by George du Maurier
- *The Puppet Masters* by Robert A. Heinlein
- *Brave New World* by Aldous Huxley
- *1984* by George Orwell
- *Firestarter* by Stephen King
- *The Bourne Identity* book series by Robert Ludlum (also motion pictures)
- *A Clockwork Orange* by Anthony Burgess, later adapted into the classic Stanley Kubrick mindbender

- *The Terminal Man* by Michael Crichton
- *The Girl With the Dragon Tattoo* by Stieg Larsson
- *Telefon*, starring Charles Bronson
- *Gaslight*
- *The Matrix*
- *Scanners*
- *Dreamscape*
- *The Guyana Tragedy*
- *Jacob's Ladder*
- *Salt*, starring Angelina Jolie
- *The Long Kiss Goodnight*
- *The Sleep Room*
- *Hannah*
- *Femme Fatale*
- *Kill Bill*
- *Closet Land*
- *The Men Who Stare at Goats*, starring George Clooney
- *Total Recall*, starring Arnold Schwarzenegger
- *The X-Men* comic book series
- *The Prisoner* TV series
- *Falling Skies* TV series
- *Dark Skies* TV series
- *The X-Files* TV series
- *La Femme Nikita* TV series
- *The Pretender* TV series
- *Nowhere Man* TV series
- *Fringe* TV series
- *Homeland* TV series
- *Dollhouse* TV series

- *Legends* T
- *Blacklist* T

Star Wars-এ দেখাে
Droid-দের উপরও ব
এভাবে এক ধরনের
Trek দেখিয়েছে Bo
চালাচ্ছে। এ মুভিগুলে
বেশি মুভি বা সিরিজ
বাস্তবতা নেই। হয়
Fringe সিরিজে বি
কম্পিউটার, জৈবিক ব
আমরা উপরে
অনেকসময় এরা নিজে
নির্দিষ্ট কারো সাথে
এক মানুষে পরিণত
রক্তপাত সহনশীল ক
পারে। অথচ পৃথিবী
আজকে আমাদেরকে
স্বাধীনতার জন্যও
ThoughtCriminal.
বিষয়টি আমাদে
বাস্তবতা। আমাদের স
আমরা সচেতন
না। আমাদের সরকা
ফাঁস হয়ে যাবে।
অবশ্য আমাদের
পদ্ধতি শিখিয়ে দেন।
শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে
কঠিন। আপনারা নিশ

arsson

- *Legends* TV series
- *Blacklist* TV series

Star Wars-এ দেখানো হয়েছে, আপনি Jedi ট্রিকের মাধ্যমে কেবল মানুষ না, Droid-দের উপরও কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারবেন। একজন সৎ বৃদ্ধ ডাক্তারও এভাবে এক ধরনের হিপনোটাইজ পদ্ধতির এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। *Star Trek* দেখিয়েছে Borgs নামের এলিয়েনরা গোপন মন নিয়ন্ত্রণের প্রজেক্ট চালাচ্ছে। এ মুভিগুলো অনেক সময় সত্য খবরই দেয়। কিন্তু এর উপর এতো বেশি মুভি বা সিরিজ তৈরি হয়েছে, সাধারণ মানুষ ভাবে এসবের আসলে কোনো বাস্তবতা নেই। হয় এগুলো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, নাহয় এসব গল্পলেখকদের কল্পনা। *Fringe* সিরিজে বিজ্ঞানী ওয়াল্টার বিশপ বলেন, "আমাদের মস্তিষ্ক একটি কম্পিউটার, জৈবিক কম্পিউটার। একেও হ্যাক করা সম্ভব"।

আমরা উপরে যে তালিকা দিয়েছি, সেগুলো কিন্তু খুব কমই সত্য। অনেকসময় এরা নিজেরাই MKUltra এর মতো কাজ করে। এগুলো আপনাকে নির্দিষ্ট কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী করে তোলে, আপনাকে এমন এক মানুষে পরিণত করে যা আপনি কখনোই আশা করেননি, এমনকি খুন, রক্তপাত সহনশীল করার মাধ্যমে আপনাকে একজন খুনিতেও রূপান্তর করতে পারে। অথচ পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র যুদ্ধ আছে, সংগ্রাম আছে। আজকে আমাদেরকে কেবল আমাদের বাকস্বাধীনতার জন্যই নয়, বরং চিন্তার স্বাধীনতার জন্যও লড়তে হয়। যেমনটা বলেছিলেন জর্জ ওরওয়েল- ThoughtCriminal.

বিষয়টি আমাদেরকে আতঙ্কিত করে, যদিও এটাই আমাদের জীবনের বাস্তবতা। আমাদের ক্ষমতা। আর জ্ঞানই তো আসল শক্তি।

আমরা সচেতন না, কারণ আমরা কমফোর্ট জোন থেকে বেরোতে আগ্রহী না। আমাদের সরকারও আমাদেরকে সচেতন করে না, কারণ তাদের গোমড় ফাঁস হয়ে যাবে।

অবশ্য আমাদের নেতারা যুদ্ধাবস্থায় আমাদেরকে মানসিকতা নিয়ন্ত্রণের কিছু পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। কেননা তারা যেকোনো মূল্যেই যুদ্ধে জিততে চান। অবশ্য শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে কেন তারা বিবেক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তা বোঝাটা একটু কঠিন। আপনারা নিশ্চয় 'এক ধর্ম, এক জাতি' কিংবা New World Order তত্ত্ব

e Clooney

অনেক শুনেছেন। আমাদের সরকাররা আমাদের ভোট নিয়ন্ত্রণ করে এমনও শোনা যায়। আসলেই যেই করুক, সত্য হলো, পুরো প্রজেক্টের মূল কারণ ঐতিহাসিকভাবে একটিই—“নিজের স্বার্থে অন্যকে ব্যবহার করা”।

বিবেক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

২০০৩ সালে Mind Control Expert, শিক্ষা ও Powerhouse বিশেষজ্ঞ ও লেখক ড. আলেন বার্কার MKZine ম্যাগাজিনে বিবেক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেন। উনার পরামর্শগুলো একেবারেই সময়োপযোগী। সময়ের ব্যবধানে প্রযুক্তির উন্নয়ন হলেও এর উপযোগীতা হারিয়ে যায়নি। তার কথার কিছু পয়েন্ট নিম্নরূপ—

- **দেশীয় নাগরিকদের জন্য অল্প মাত্রার অস্ত্র:** কোনো নেতার পক্ষ থেকে নাগরিকদের যে কাউকে নজরদারি ও হয়রানির শিকার করা। জাগ্রত বিবেকের মানুষ ও প্রতিবাদীদের জন্য মূলত এটি ব্যবহৃত হয়।
- **মানুষের চিন্তা ছিনিয়ে নেওয়া ও তাকে প্রতিস্থাপন করা:** দেশের মেধাবী শক্তিদের উপর গোয়েন্দাগিরি ও তাদের বিবেকে প্রবেশ করা। এর জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় নজরদারি।
- **গোপন তথ্য আদায়ে জিজ্ঞাসাবাদ:** যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায়ই মূলত এটি ব্যবহৃত হয়। অনেকসময় নিজের দেশের বিরোধীমতের দমনেও এ কাজ করা হয়।
- **PSYOPS:** সরকার ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সামষ্টিক বিবেকের উপর চালানো অপারেশন।
- **প্রযুক্তির অপব্যবহার:** বিরোধী মত দমনের লক্ষে হয়রানি, নজরদারিসহ যেকোনো ধরনের অন্যায় আচরণ।
- **বড়লোকদের পরিচালিত গুণ্ডাবাহিনী:** পুঁজিবাদী এ বিশ্বে ধনীরা প্রতিযোগী দমনের জন্য অপর পক্ষের বিরুদ্ধে বিবেক নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি ও হয়রানিসহ অনেক জঘন্য কাজ করে। তারা কিন্তু প্রতিযোগীকে হত্যা করে না!
- **বিশ্বনেতা বা প্রশিক্ষিৎ গুপ্তঘাতক কিংবা যে কাউকে নিয়ন্ত্রণ:** নিজের শক্তিবৃদ্ধি কিংবা সমর্থন বৃদ্ধিসহ অনেক কাজেই এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত

হয়। প্রশিক্ষিত যোদ্ধা বা গুপ্তঘাতকদেরকে প্রভাবশালি যে কাউকে হত্যার কাজেও ব্যবহার করা হয়।

- **কোনো দলকে নিয়ন্ত্রণ:** কোনো দেশ বা গ্রুপ ধ্বংস বা তথ্য যোগাড়ের লক্ষ্যে কোনো পুতুল কর্তৃপক্ষকে নিয়োগ দেওয়া।
- মানুষের উপর চালানো মেডিকেল ও মানসিক গবেষণা।
- উদ্দেশ্য ও কাজ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। *Minority Report* মুভিতে দেখানো হয়েছে যে কিছু মানুষ কেবল মানুষের আচরণ বুঝতেই চায় না, বরং মানুষের আচরণের প্যাটার্ন বুঝতেও চায়। তারা এ প্রযুক্তিতে অনেক দক্ষ হয়ে ওঠে।

এখানে কেবল কিছু উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হলো। এগুলো সরকার, সন্ত্রাসী গ্রুপ ও চার্চগুলোর উদ্দেশ্য। MKUltra ও সরকারের কাজকর্ম প্রমাণ করে যে বিষয়টি আসলে সত্য। আমরা হয়তো আমাদের জীবনের সর্বাংশে ঢুকে পড়া এ প্রযুক্তির কেবল অল্পই জানি; হয়তো তা কেবলই আইসবার্গ বা বিরাট অক্টোপাসের একটা আঙ্গুলমাত্র।

বাড়ির নিকটে

আমরা আমাদের চারপাশের মানুষের উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করি তা না বুঝলে বড় পরিসরে বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বোঝা সম্ভব না। মজার ব্যাপার হলো, বিষয়টি সম্পর্কে শুনলেই মানুষের মনে ভেসে ওঠে খারাপ, অত্যাচারি সরকারের নির্যাতন, বিবেক নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা কিংবা চার্চের সুইসাইডে উৎসাহিত করা মানুষদের কথা। কিন্তু তারা তাদের আশেপাশের নির্যাতন, নজরদারি নিয়ে এভাবে ভাবে না। আমাদের দৈনিক জীবনের অংশই হয়ে উঠেছে এগুলো। এগুলো আমাদের আশানুরূপ ফলই দেয়—আমরা স্বীকার করি বা না করি।

নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন, আপনি কি কাউকে ঘরোয়া নির্যাতন বা শিশু নির্যাতন করতে দেখেননি? আত্মপ্রশংসা মগ্ন কোনো মানুষ পাননি? তার কথার দ্বারা নির্যাতিত কাউকে পাননি? আপনি কোনো সোশিওপ্যাথ, সাইকোপ্যাথ দেখেননি? তাদের কারো সাথে আলোচনায় যাননি? অসংখ্য মানুষের মানসিক অসুস্থতা আছে। আমরা একে অনেক নামই দিতে পারি। সন্দেহ নেই যে এ অসুস্থতাগুলো মানুষের নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার প্রচেষ্টার ভালো উদাহরণ।

তারা অনেক সময়ই বাজে ব্যবহার, নির্যাতন, হতাশা প্রয়োগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক—সবাই তাদের টার্গেট।

আজকালকার Humanism এর যুগে NPD (Narcissistic Personality Disorder) তো খুবই সাধারণ সমস্যা। এ সমস্যা কেবল অভিনেতা, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদদেরই হয় না, বরং আমাদের মা বাবা, ভাই বোন, প্রেমিকা কিংবা সহকর্মীদেরও হয়। NPD এর বৈশিষ্ট্য খুব সাধারণ। খারাপ, কিন্তু সাধারণ। তারা নিজেদের পরিবেশে আত্মপ্রশংসা জিইয়ে রাখতে চায়। বিশ্বটা মানুষের কাছে 'আমি এবং শুধুই আমি' কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে।

American Psychiatric Association এর "The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" অনুসারে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়, তার মধ্যে অন্তত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য NPD রোগীদের থাকবে।

নিজের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব নিয়ে মারাত্মক উদ্বিগ্ন। (যেমন নিজের মেধা ও অর্জন নিয়ে অতিরঞ্জন, অল্প কিছু অর্জন দিয়েই নিজেকে সেরা ভাবার প্রবণতা)

নিজের অনাগত সীমাহীন সাফল্য, ক্ষমতা, মেধা, রূপ ও প্রচন্ড রোমান্টিক প্রেম নিয়ে অত্যাধিক কল্পনায় ভেসে বেড়ানো।

- নিজেকে স্বতন্ত্র ও অসাধারণ ভাবা। নিজের ব্যাপারে মনে হয়, "কেবল সেরা মানুষরাই আমাকে বুঝবে, আমাকে সঙ্গ দেবে!"
- সীমাতিরিক্ত শ্রদ্ধার জন্য লালায়িত।
- নিজের উপাধী নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত। কোনো প্রয়োজন ছাড়াই যেকোনো কিছুর ক্রেডিট পাওয়ার পেতে আগ্রহী।
- প্রবল সুবিধাবাদী। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে যেকোনো কিছু করতে আগ্রহী। যে কাউকে ব্যবহার করতেও রাজি।
- অন্যের অনুভূতি বা প্রয়োজনে এগিয়ে না আসার মানসিকতা।
- অন্যের ব্যাপারে হিংসায় জ্বলে মরে। ভাবে, অন্যরাও তাকে হিংসে করে।
- সবসময় অহংকারি আচরণ করে। প্রচণ্ড মেজাজ দেখায়।

আমরা আমাদের আশেপাশের ৮০% মানুষকেই হয়তো এমন দেখি। তবে Narcissism বা আত্মপ্রশংসা কিন্তু বিবেক নিয়ন্ত্রণের শক্ত হাতিয়ার। এ ধরনের

মানুষ, সাইকোপ্যাথ, সোশিওপ্যাথদের উপর খুব সহজেই হতাশা কিংবা প্রভাবান্বিত আচার আচরণ চাপিয়ে দেওয়া যায়। তারা তাদের ভিক্টিমদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। তাদের আচরণগত কিছু বৈশিষ্ট্য হলো:

- ভিক্টিমকে মানসিকভাবে ভেঙ্গে দেওয়ার লক্ষ্যে ভালোবাসায় জড়িয়ে নেওয়া।
- ইচ্ছেমতো মিথ্যা, জোচ্চুরি কাজে লাগানো। কারণ তারা তাদের একচ্ছত্র অধিকারে বিশ্বাসী।
- নিজের দোষ, খারাপ চরিত্রকে ভিক্টিমের উপর চাপিয়ে দেওয়া।
- মিথ্যা, অস্বীকার, কাহিনী বদলে ফেলা, নীরব অত্যাচারের মাধ্যমে ভিক্টিমকে শাস্তিদান।
- কোনো মিথ্যা বা জোচ্চুরির মধ্যে ধরা পড়লে ভয়াবহ রেগে যাওয়া, সহিংস হয়ে ওঠা।
- ভিক্টিমকে জনবিচ্ছিন্ন করে রাখা।
- পরিবেশকে ভীতিকর করে রাখার জন্য বিরক্ত করা, হয়রানি ও হুমকি দেওয়া।
- শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন। এমনকি হত্যাও।

হয়তো সব Narcissist-দেরই এ অবস্থা হয় না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষও এ ফাঁদে পড়ে যান। স্বভাবগত Narcissist-রা তাদের চেয়েও অনেক ভঙ্গুর মানসিকতার হতে পারে। কিন্তু তারা যেভাবে এসব বলির পাঠাকে মানসিকভাবে দূর্বল ও নির্ভরশীল করে রাখে—এটা কোনোভাবেই যুদ্ধবন্দি নির্যাতন, আতংকিত করা কিংবা চার্চের হিপনোটিজমে যেভাবে ব্রেইনওয়াশ, বিবেক নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার চেয়ে কম না। সোশিওপ্যাথ ও সাইকোপ্যাথরা সাধারণ Narcissist-দের চেয়ে অনেক বেশি এমন আচরণগত সমস্যায় ভোগে। আমরা তো এ আত্ম অহংকারকে রীতিমতো সভ্যতার রূপ দিয়েছি। কেবল ব্যক্তিস্বাধীনতার যুক্তি ছাড়া আর কোনোভাবেই তাদের আচরণকে যৌক্তিক বলা যায় না।

দুর্ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ

বিবেক নিয়ন্ত্রণ ও Narcissism এর গভীর সম্পর্ক আছে। একজন ব্যক্তির মানসিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য যে সকল প্রক্রিয়ার কথা মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন তার অনেকগুলোই NPO বা Narcissistic Personality Disorder-

এ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে স্বভাবগতভাবেই থাকে। এ ধরনের রোগীরা মানুষের উপর প্রভাব বজায় রাখে- তা যেভাবেই হোক। তাদের সবসময় একটি পরিষ্কার চেহারার (Clean Image) দরকার হয়। তারা নিজেদেরকে সেরা হিসেবে জাহির করতে চায়। তারা নিজের মাথা উঁচু রাখতে অন্যকেও অপমান করে। তারা খুবই দূর্বল মানসিকতার মানুষ। তারা মনে করে তাদের মেধা ও যোগ্যতার অসাধারণ ক্রেডিট তাদের প্রাপ্য। দূর্ভাগ্যবশত, তারা মনে করে, স্রষ্টাই তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য মানুষকে অপমান করার, ব্যবহার করার অধিকার দিয়ে রেখেছেন। যেহেতু তাদের ভিক্টিমরা মনে করে যে এই Narcissist-রা তাদেরকে ভালোবাসে, তাই এসব আবেগজনিত সমস্যা থেকে বের করে আনাটাও কঠিন। একটি Narcissism Forum থেকে সবচেয়ে ভালো সারমর্ম দিয়েছে যে, "আপনি যখন মনে করেন যে সে আপনাকে ভালোবাসে, আপনি তাকে ভালোবাসেন, আপনি তাকে বিশ্বাস করেন এবং অন্তরের সবচেয়ে গভীর স্থান আপনি তার জন্য বরাদ্দ রেখেছেন—তেমন সমস্যা ও আবেগ হলো সবচেয়ে ভয়াবহ।"

তাদের আচরণ স্বৈরাচারী শাসকদের মতো। তারা নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য মানুষকে নির্যাতন, অপমান ও হত্যা করে। মানুষের অন্তর ও বিবেকের উপর তাদের প্রভাব হলো অত্যাচারী স্বামী ও দীর্ঘদিন অত্যাচারে অতিষ্ঠ স্ত্রীর মতো। রাজনৈতিক নেতা ও চার্চের ফাদাররাও অনেক ক্ষেত্রেই এমন। তারা নিজেদের স্রষ্টার পছন্দনীয় মনে করে।

ঘরোয়া নির্যাতন ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের মনস্তাত্ত্বিক কারণ মূলত একই। বিশ্বের জঘন্যতম সাইকোপ্যাথরাও অনেক ক্ষেত্রেই একেবারেই সাধারণ আচার আচরণ প্রদর্শন করত। এদের মধ্যে অনেক নৃশংসতম যুদ্ধাপরাধীও আছে। নিউ ইয়র্কের রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ হান্নাহ এরেন্ডট একে "Banality of Evil" বলে অভিহিত করেছেন। এরেন্ডট নামের একজন সাংবাদিক এডলফ এইকম্যানের ১৯৬১ সালের অসংখ্য যুদ্ধাপরাধের দায়ে যে বিচার সংঘটিত হয় তা ধারণ করেছেন। এডলফ এইকম্যানকে অনেক মনোবিজ্ঞানীই পরীক্ষা করেছিলেন। তারা সন্দেহাতীতভাবে তাকে স্বাভাবিক বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরেন্ডট পরবর্তীতে তার বই Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil এ লিখেছেন, "এইকম্যানের মতোই অনেকে আছেন। তারা

কেউই যৌনবিকৃত মানুষ কিংবা নৈরাশ্যবাদী নন। তারা প্রত্যেকে ভয়াবহ ও আতংকজনকভাবে স্বাভাবিক। আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিচারের নৈতিকতার মাপকাঠির দিক থেকে বলা যায়, তার স্বাভাবিকতা যেকোনো স্বৈরাচারী শাসকদের চেয়ে ভয়ংকর।”

বিবেক নিয়ন্ত্রণের কাজ করা অনেককেই স্বাভাবিক ধরা হয়, এমনকি জঘন্যতম মানবতাবিরোধী শাসকদেরকেও। বিষয়টি খুবই বিরক্তিকর। কিন্তু তা সত্য। আমাদের বিনোদন জগতে যেভাবে দেখানো হয় যে, The Manchurian Candidate এ ফ্র্যাংক সিনাত্রা যেভাবে ব্রেইনওয়াশ হয়েছিলেন কিংবা সুন্দরী নারী গুপ্তঘাতকরা কোনো কংগ্রেসম্যানকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে—বিষয়টি এতোটা আনন্দের ও সহজ না। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আমরা Narcissism এর উদাহরণ নিয়ে আসি। মাঝে মাঝে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ খুব কম তীব্রতায় পরিচালনা করা হয়, ধীরে ধীরে কাজ করা হয়।

অনেকসময় আমাদের ঘরেও এমনটা হয়!

আচার ও কৃত্যানুষ্ঠান: বিবেক নিয়ন্ত্রণে আমাদের অতীত

নৃতাত্ত্বিকরা বলেন, আচারানুষ্ঠান হলো পরিবর্তন। আমাদের বিয়ে, ব্যাপ্টিজম, প্রেসিডেন্টের অভ্যর্থনা ইত্যাদি আচারানুষ্ঠান অনেক বেশি সম্প্রসারিত। এগুলো আমাদের জীবনের খুব বড় অংশ ঘিরে থাকে। এগুলো আমাদের চিন্তা ও জীবনাচারকে প্রভাবিত করে। এবং অবশ্যই, আমাদেরকে পরিবর্তন করে।

- আবরাহাম ভারগেস।

আচারানুষ্ঠান, ত্যাগ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে- সত্য। এখানে এমন কিছু সুবিধাও আছে যা সাধারণ মানুষ পায় না। কিন্তু এটা পরিষ্কার না যে সবসময় এখানে কুধর্মই কেন আসতে হবে? কেন দেব-দেবী, পরকাল, মিরাকল, ঐশী বিষয়াশয় প্রণিধান করতে হবে?

- পল ব্লুম।

প্রাচীন সভ্যতায় কিছু সহজাত রীতিনীতি দিয়ে মানুষের বিবেক নিয়ন্ত্রণ করা হতো। অনেকসময় ধর্মগুরুরা নিজে নিজে নিয়ম বানাতো, অথচ মানুষকে বলতো, "এসব তো দেবতার ইচ্ছা।" কেবল ধর্মগুরু না, কত রক্ত মাংসের মানুষও যে এমন আনুগত্য চেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের পূর্বপুরুষরা কেবল উপাসনার জন্যই এ কাজ করতেন না, মানুষের উপর রীতিনীতি আরোপ করতেও তারা এ কাজ করতেন।

এ রীতিনীতিগুলো তারা ধর্মীয় পোষাকে প্রণয়ন করতো। এটা বর্তমান চার্চের ব্রেইনওয়াশ করার মতো ব্যাপার। মানুষ সামাজিক রীতিনীতি দিয়েই তাদের মানসিকতা গঠন করে, জ্ঞান ও মূল্যবোধ অর্জন করে। এ রীতিনীতিগুলো আমাদের সামষ্টিক পরিচয় তৈরি করে, সেটা বেশিরভাগ সময়ই ব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলে না। হয়তো এ কারণেই গোপন সংগঠনগুলো খুব সতর্কতার সাথে সদস্য বাছাই করে।

আচারানুষ্ঠান

ইংরেজী Ritual শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Ritualis থেকে যার অর্থ "ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে যুক্ত হওয়া", সামাজিক কোনো প্রক্রিয়া বা সংস্কৃতি। Ritual সমাজের সামগ্রিক কৃষ্টি সংস্কৃতি, সময়, বিয়ে, মৃত্যু, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া,

ধর্মগ্রন্থের নামে শপথ, জনসমাগম—সব নিয়েই গঠিত। আমরা সবসময় এসব রীতি মানি। এসব কৃষ্টিগুলো সামাজিক বিষয়াশয়। আমেরিকার ধর্মীয় ও Ritual Studies পণ্ডিত ও Ritual Theory, Ritual Practice and Ritual: Perspectives and Dimensions-এর লেখক ক্যাথারিন বেল বলেন, এগুলো ৬টি মূল বিষয় নিয়ে গঠিত।

১. সামাজিক দর্শন
২. ঐতিহ্য
৩. পবিত্র বিষয়াবলী
৪. দৈনন্দিন প্রথা
৫. রাষ্ট্রীয় আইন
৬. পরিবর্তনশীলতা

বেল লিখেছেন, আমাদের কৃষ্টিগুলো খুব সীমিত আকারে আমাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকসময়ই এর বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সামাজিক দর্শন এসব কৃষ্টি নির্বাচন করে ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে। ঐতিহ্যের আবেদন হলো ঐতিহাসিক। আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া, নববর্ষ উদযাপন—এসব সামাজিক নাও হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে ঐতিহ্যই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবর্তনশীলতা আমাদের নিয়ম, কৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের আইনগুলো একটি নির্দিষ্ট জনশক্তিকে তার কৃষ্টি ও মূল্যবোধ অনুসারে চলতে সাহায্য করে। যুদ্ধের সময় এর বেশি প্রয়োজন হয়। যেমন আমেরিকার পতাকা বা Medal of Honor। দৈনন্দিন প্রথাগুলো আমাদের কৃষ্টির সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে। যেমন নাচ-গান। এগুলো কৃষ্টি নিয়ে আমাদের চমৎকার অভিজ্ঞতা তৈরি করে। আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসব আলোচনা করি।

আমরা নিম্নোক্ত আচারানুষ্ঠান পালন করি:

- বিয়ে, অনুষ্ঠান, তরুণীদের বল প্রোগ্রাম, ভ্রাতৃসংঘ ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের সমিতির অনুষ্ঠান।
- ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে কিছু কৃত্যানুষ্ঠান। যেমন নববর্ষে কালো চোখা পিঠে খাওয়া কিংবা বিভিন্ন টেবিলে ঘুরে ঘুরে কৃতজ্ঞতা জানানো।
- ধর্মীয় পন্থায় যোগাযোগ ও বিনিময়। ক্যাথলিক চার্চে যোগাযোগ বা ধর্মগুরুদেরকে খাদ্য পরিবেশন করা।

- সামাজিকভাবে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কৃত্যানুষ্ঠান। এমন ধরনের অনুষ্ঠান যা মানুষকে কাছে নিয়ে আসে।
- রাগ নিয়ন্ত্রণ, দেবতা বা সংগঠনের সদস্যদের উপশম কিংবা কাল্পনিক দানব থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে যেসকল কৃত্যানুষ্ঠান।

নেতারা প্রথমে মানুষের সামাজিক আচরণ আয়ত্ত্ব করেন, তারপর এসব আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে সামষ্টিক বিবেক নিয়ন্ত্রণ করেন। আচারানুষ্ঠান বিশৃঙ্খলা থেকে নিয়মনীতির উদ্ভব ঘটায় ও পরিস্থিতি স্বাভাবিকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভূমিকা ধরিয়ে দেয়। মানুষের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে একটি ভূমিকা তাকে দেওয়া হয় আর এসবের বিরোধীতাকারীদের শত্রু হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রত্যেককে 'গ্যাং মেম্বার' হিসেবেই নিজের অবস্থান ধরে রাখতে হয়।

শাস্তি ও শৃঙ্খলার লক্ষ্যেও আচারানুষ্ঠান কাজ করে। পুরোনো আমলের কঠোর কঠোর সব নিয়ম নীতি মানার জন্য এ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। তারা কেউ যদি কোনো নিয়ম ভাঙে তবে তারা না খেয়ে, নিজেকে আঘাত করে সেটার প্রায়শ্চিত করে। বিষয়টি ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না ধর্মগুরুরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেন। অবশ্য ব্যক্তিও নিজের আত্মা ও চাহিদার উপর এভাবে নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে শিখে যায়।

যদিও বিষয়টি সামগ্রিক পরিচয়-উদ্দেশ্য তৈরি করে তবুও এটা কি আসলেই নৈতিক?

স্রষ্টার আনুগত্য

প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের কথাই ধরুন, তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি দেখলে মনে হয় যেন ধর্মগুরুরা স্রষ্টা ও দায়িত্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কিছু নিয়ম তৈরি করেছেন। হয়তো এটা আমাদের কাছে সরকারের নির্যাতন বা বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মতো মনে হয় না, কিন্তু ধর্মীয় পোষাকে এটিও এক প্রকার মানসিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ।

তাদের টার্গেট নিম্নবিত্ত মানুষ। তাদেরকে প্রভাবিত করা সহজ। দোয়া, কৃষ্টি ও আনুগত্যের মাধ্যমে তারা মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখায়। অবশ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বাড়ার সাথে সাথে এসব সহজ হয়ে ওঠে।

রোমান, গ্রিস কিংবা মেসোম্যারিকান—সব বিখ্যাত সংস্কৃতিতে এসব ছিল। পাদ্রী বা মহিলা পাদ্রীদের একেকটা র‍্যাংক থাকতো। অবশ্য তা কেবল নিচুস্তরের

মানুষের কাছে 'খোদার কথা' পৌছে দেওয়ার জন্য। তারা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সম্মানের ক্ষেত্রে কতোটা উপরে তার জন্যও বিভিন্ন গ্রেড করা হতো। শুধু তাই না, এই শ্রেণিবিভাগটা করা হতো দেব-দেবীদের কাছে তাদের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। যে যত নিচে সে তত কম প্রিয় এবং যে যত উপরে সে তত বেশি প্রিয়। তারা সমাজের কাছে এই শ্রেণিবিভাগের ভিত্তিতেই সম্মান পেত।

আজকালকার যুগের কাল্টগুলোতেও আমরা দেখতে পাই যে তারা বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবিভাগ করে। বিভিন্ন সামরিক, সরকারী কর্মকর্তা এবং আইনজীবীও এতে জড়িত হয়ে যায় কিংবা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা এগুলোর নিরাপত্তা দেয়।

পূর্ববর্তী কাল্টগুলোকে অনেক সময় 'রহস্যময় কাল্ট' বলা হতো। তাদের মানুষ এবং প্রাণীর জীবন উৎসর্গ করা, বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, যৌনতা নিয়ে বিভিন্ন আচারানুষ্ঠান ইত্যাদি ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। বিভিন্ন ছবি বা নির্যাতনের কৃষ্টিগুলোতে এসকল ধর্মগুলো আর মানুষের সবচেয়ে জঘন্য চরিত্র প্রকাশ পেয়ে যেত। এ ছবিগুলোর বিষয় ছিল মানুষের জীবন, জন্ম, মৃত্যু, পূণর্জন্ম। প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা চিন্তার গুরুত্ব ছিল না বরং গ্রুপ থিংক এর গুরুত্ব ছিল। রোমান ও প্যাগানদের মধ্যে খৃস্টধর্ম আসার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের আচারানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। তারা প্রকৃতির পূজা করত, প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করত। সেজন্য তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত, প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষমতা দেব-দেবীর উপর আরোপ করত এবং আদিম বিভিন্ন চর্চা যেমন উন্মুক্ত যৌনতা, মানুষকে উৎসর্গ করা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা প্রকৃতির সাথে মিলিত হতে চাইত।

ডাইনোসিসের কাল্ট গ্রিসে অবস্থিত। এই কাল্টটি তাদের বিভিন্ন জঘন্যতম চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। তারা প্রচুর মদপান করত। তাদের রূপচর্চার মধ্যে যৌনতা এক আবশ্যিক অংশ ছিল। এটাকে তারা উর্বরতা, জন্মলাভ এবং সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু এক সেঙ্গে এনথেস্টেরিয়া ফেস্টিভ্যালটি ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে মেয়েদের এলেটাইডস বা এলেটিস নামে ডাকা হতো। তাদের সম্মান দেয়া হতো। তাদেরকে সিলিংএ ঝুলিয়ে দেয়া হতো। তারা কষ্টে আর্তনাদ করলেও মনে মনে খুশিই হতো। তারা

মরতেও ভয় পেত না। সেখানে একাজ করে দেখানো হতো যে মেয়েরা আসলে মরে না! দেখুন, তারা তাদের কাল্টগুলোর প্রতি কতটা একাগ্র ছিল। আজকেও কাল্ট সদস্যরা অন্যের কথায় আত্মহত্যা করে।

প্যাগান দেবী কিবিলি একই সাথে উর্বরতা ও প্রকৃতির দেবী। যেগুলো আগে বলেছি সেগুলো দেবী কিবিলির অনুষ্ঠানে অনেক বেশি মাত্রায় হতো। এক পর্যায়ে তারা নিজেদেরকে মোটা মোটা দড়ি দিয়ে পেটাতে শুরু করত। এখান থেকেই বুঝা যায় যে মানুষ নিজেদের অন্তরের উপর খুব দ্রুতই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

পূর্বের কথা কী নেই? আগরির দিকে দেখুন। এরা প্রাচীন হিন্দু কাল্ট। পরবর্তীতে চৌদ্দ শতক পর্যন্ত এটা নতুন কাপাইকা নামক একটি রূপ ধারণ করে। এরা হিন্দু স্মার্টা ঐতিহ্যে শিবার পূজা করত। সে ছিল ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবতা। আগরির লোকরা ব্রাহ্মণদের সম্মান জানানোর জন্য অনেকগুলো কাজ করত। এর মধ্যে জ্বলন্ত প্রাণীর মাংস খাওয়া, গরুর গোবর খাওয়া ইত্যাদি উল্লেখ্য। মৃত কিন্তু কাঁচা প্রাণীর মাংস খেয়ে এবং মানুষকে উৎসর্গ করে তারা অনুষ্ঠান শেষ করত। এ থেকে বুঝা যায় যে ক্যানাবলিজম মানুষকে ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে চরম উগ্র বানিয়ে দেয়। তাদের ধর্মগুরুরা তাদেরকে দিয়ে যা খুশি তা করাতে পারে।

বর্তমানেও এমন কাল্ট আছে যেগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আজকেও তারা তাদের ধর্মগুরুদের ভালোবাসে, ভয় করে। কিন্তু সমস্যা হলো প্রাচীন কালের কাল্টগুলোর চেয়ে বর্তমান সময়ের মিডিয়া, রাজনৈতিক দলগুলো খুব একটা ভিন্ন না। তারাও তাদের ক্ষমতা এবং মানুষের সম্মান, ভীতিকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গোপন সংগঠনগুলো

টেম্পলার, কে কে কে, ফ্রিম্যাসনের মতো অসংখ্য সংগঠন বিবেক নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। তারা তাদের সদস্যদের সুশৃঙ্খল এবং আনুগত্যশীল রাখার জন্য এই কাজগুলো করত। এরাও প্রাচীন কালের ওসব কাল্টদের মতো সব ধরনের আদিম বিষয় চর্চা করে। যার মধ্যে সহিংসতা, মানুষকে উৎসর্গ, উন্মুক্ত যৌনতা সবগুলোই আছে। টিকে থাকার জন্য মানুষকে এসব করতে হয়, যদিও বা সেটা তার ব্যক্তিগত নৈতিকতার বিরুদ্ধে যায়। তারা সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে গিয়ে

একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। এর মাধ্যমে তারা বর্ণবাদ, বিকৃত যৌনতা, সহিংসতার প্রসার ঘটায়।

এখানে প্রত্যেক সদস্যকে তাদের বিশৃঙ্খলা, হতাশা, শারীরিক ও আবেগীয় দূর্বলতা ইত্যাদি বিষয় থেকে প্রতীকীভাবে বিশুদ্ধ করে ফেলা হয়। অর্থাৎ মানবীয় সব অনুভূতি থেকে তারা মুক্ত হয়ে যায়। সেজন্য তারা মানুষকে মাদকাসক্ত করা, অবচেতন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সহ অনেক কিছুই করে। এসব হয় বিভিন্ন আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে। যেমন খ্রিষ্টানরা একজন বাচ্চাকে পানির মধ্যে চুবিয়ে তাকে ব্যাপ্টিজম করে। প্রাচীন রোম, প্যাগান ইত্যাদির সংস্কৃতির বিষয়গুলো হারিয়ে যায়নি বরং এগুলোকে আরো উচ্চ মর্যাদায় নতুন নতুন রূপ দেয়া হয়েছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব গোপন সংগঠনগুলো স্যাটানিজম তথা শয়তানের পূজার সাথে জড়িত থাকে। এজন্য তারা এসব কাজগুলো আরো ভয়াবহ মাত্রায় এবং প্রকাশ্যে করে থাকে। বিবেক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ফ্রিম্যাসনের মতো সংগঠনগুলো এই ধরনের কাজগুলো করে। যদিও ইলুমিনাতির বিষয়টি অনেক হাস্যকর, কিন্তু এটা সত্য যে ফ্রিম্যাসনের মত সংগঠনগুলো একটি নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার তৈরীতে কাজ করে যাচ্ছে।

গোপন সংগঠনগুলো কাল্টের চেয়ে অনেক গোপনে কাজ করে। তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কাজগুলো মানুষের সামনে একেবারে আনে না বললেই চলে।

প্রাচীন কালে আচারানুষ্ঠানগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল; এখন আচারানুষ্ঠান-গুলো আনুষ্ঠানিকতার সাথে হচ্ছে না। অনেক মানুষের মানসিক সমস্যা, সিজোফ্রেনিয়া, ব্যক্তিত্বের সমস্যা আছে। এমন জায়গায় তারা মানসিকতা নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াগুলোকে সমাধান হিসেবে আনে। প্রাচীন কালে তো মানুষের খুলিতে ছোট ছিদ্র করে দেয়া হতো যাতে শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পায়। ব্যক্তির স্থায়ীভাবে মানসিক সমস্যা তৈরি হয়। তবে এখন আমাদের আচরণগুলোই তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।

নির্যাতনের পন্থা

Exorcism হলো এক প্রকার ধর্মীয় কৃষ্টি। মধ্যযুগে এক নারী মানুষকে প্রভাবিত করতে এ রীতির প্রচলন ঘটায়। অবশ্য তিনি সে যুগের প্রচলিত রীতিনীতি মানতেন না। একদল লোক তার এসকল কাজকর্মের সাহায্য করত। তারা

Malleus Maleficarum নামে পরিচিত একটি ডাইনিদের বাইবেল ব্যবহার করত। বইটি ১৪৮৪ সালে লেখা হয়। বইটিতে স্বীকারোক্তির জন্য জঘন্যরকম নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতির বর্ণনা থাকত। এগুলোই মধ্যযুগের মূল অস্ত্র ছিল। পুরো মধ্যযুগেই এসব ব্যবহার করে অসংখ্য নিরীহ নারী, শিশু ও পুরুষদের হত্যা করা হয়েছে। তারা এমন কিছু দোষ স্বীকার করত যা তারা কখনোই করেনি।

আগে নির্যাতনের বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহৃত হতো। যেমন ইলেক্ট্রিক শক, একঘরে করা, কাঠের শূল, আটোসাটো চেয়ার বা খাট ইত্যাদি। এভাবে অনেক গরীব মানুষ পাগলও হয়ে গিয়েছে। শকের মধ্যে আছে—ইলেক্ট্রিক চেয়ার, চোখ ঢেকে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া, শারীরিক বিভিন্ন যন্ত্রণাদায়ক কসরত, প্রবল আওয়াজ ও অজ্ঞান করে ফেলা। নারীদের দমনে ও নির্যাতনে এগুলোকে একেবারেই সাধারণ মনে করা হতো। কেবল প্রাকৃতিক ঔষধ বানালেও সেটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। নির্যাতন সবসময় জরুরি ছিল না। তারা তো যেভাবে চাচ্ছে স্বীকারোক্তি পাচ্ছেই। নাৎসিরা এসব নির্যাতন নিয়ে খুবই গর্ববোধ করে। রাজনৈতিক অনেক একনায়কও এসব সহ্য করেছে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক—সবক্ষেত্রেই এসব নির্মমতা জ্যামিতিক হারে বর্ধমান ছিল।

মধ্যযুগের এসব নির্যাতন খুবই হিংস্র ও মানবতাবিরোধী। বেশিরভাগ সময়েই ভিক্টিম মারা যেত। যারা নির্যাতন করতো তারা মানুষের পর্যায়ে থাকত না। অনেকে তো হয়তো মরতে পেরেই শান্তি পেত। কয়েক ধরনের নির্যাতন হলো—

- **কফিন:** খাবার পানি ছাড়া দিনের পর দিন কফিনে আটকে রাখা।
- **The rack:** ভিক্টিমকে টেবিলে আটকে রাখা ও প্রচন্ড জোরে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টানা।
- **Spanish tickler:** স্প্যানিশ যন্ত্র দিয়ে মাংস তুলে ফেলা।
- **পানি:** Waterboarding বা মুখে ক্রমাগত পানি ঢালা। ফলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও পানিতে বারবার চুবিয়ে রাখা।
- **The garrotte:** স্পেনে ব্যবহৃত হত্যার মঞ্চ। দড়ি ছেড়ে দিলে একটি ছুরি এসে মাথা কেটে ফেলত।

- **The heretic fork:** মধ্যযুগে ও স্পেনে হত্যার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শারীরিক চাপ প্রয়োগের যন্ত্র।
- **চাকা:** চাকায় বেঁধে ঘন্টার পর ঘণ্টা ঘোরানো। অনেকসময় ভিক্টিম এতে মারাও যেত।
- **আগুন:** মূলত ডাইনি বলে আটককৃতদের এভাবে বিচার হতো। এভাবে অসংখ্য নারী ও শিশুর জীবন ধ্বংস হতো। তাদেরকে কাঠের তক্তায় আটকানো হতো এবং ধীরে ধীরে পোড়ানো হতো।
- **The Judas Cradle:** নির্যাতিতদের ত্রিভুজাকৃতির একটি আসনে বসানো হতো। সেখানে ধীরে ধীরে তারা মৃত্যুবরণ করত।

এগুলো হলো খুব ছোট কিছু উদাহরণ। এভাবে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতারা মানুষের জীবন, মন ও আত্মাকে ধ্বংস করত। তারা এভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করত, রাজনৈতিক বিরোধী দমন করত এবং মানুষের মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করত। আমরা আজকাল কারাগারে বা মানসিক হাসপাতালে এসবেরই কিছুটা পরিবর্তিত রূপ ব্যবহার করি। তারা যুক্তি দেখায় যে, তারা সাইকোপ্যাথদের নিয়ন্ত্রণ করতে এ কাজ করে। প্রশ্ন হলো: কে সত্যিকার সাইকোপ্যাথ—যে নির্যাতন করছে? নাকি যে নির্যাতিত?

যদিও এসব প্রক্রিয়া খুবই বর্বর, হিংস্র এবং খারাপ, কিন্তু মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ বা আচরণ পরিবর্তনে এসব প্রক্রিয়া আসলেই কাজ করে। অনেকসময় নির্যাতিত লোকটি মারা যেত। কিন্তু সে আতংক যারা নির্যাতন করত ও বাকিদের মধ্যেও সংক্রমিত হতো। নির্যাতনের মাধ্যমে 'ব্যতিক্রম' যেকোনো কিছুই বন্ধ করে দেওয়া হতো। কেউ কোনো প্রশ্ন তুলত না, তোলার সাহস করত না।

পরের অধ্যায়ে আমরা দেখব ভীতি কীভাবে ব্যক্তিগত জীবন থেকে যুদ্ধের ময়দানেও কার্যকরী। তারা সেখানে কেবল নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষদেরই সেখানে হত্যা করে না, বরং মানুষকে গুপ্তঘাতক, গোয়েন্দা ও যোদ্ধায় পরিবর্তিত করে।

Monarch, BlueBird, And Artichokes: MKUltra এবং আধুনিক যুগের বিবেক নিয়ন্ত্রণ

হয়তো সেরা গোয়েন্দা সেই যে নিজেই জানে না যে সে গোয়েন্দা।

- ড. এলেন বার্কার, "Motives Of Mind Control".

কেবল ছোট ছোট গোপনীয়তাই রক্ষার প্রয়োজন হয়। মানুষের অমনোযোগের কারণে বড়গুলো এমনিতেই ঢাকা পড়ে থাকে।

- মার্শাল ম্যাকলুহান।

আমাদের অবস্থা হলো টেডি বিয়ারের মতো। আমাদের খালি পাত্র হিসেবে নেওয়া হয় ও ইচ্ছামতো বিভিন্ন বিষয় আরোপ করা হয়। একে বলা হয় 'Build a Bear'। আমাদের টাকায় কেনা ডিভাইস দিয়েই তারা এ কাজ করে।

তারা সরকার, সামরিক বাহিনী ও কর্পোরেশনের অংশ। তারা সবাই যোদ্ধা, খুনি ও দাস বানানোর কাজ করছে। মানব অস্ত্র গড়ে তুলছে।

MKUltra যুগ

বিবেক নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া অনেক সময়ই আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ১৯৫০ থেকে ৭০ এর দশক পর্যন্ত সিআইএ বিবেক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রজেক্ট চালায়। নাম MKUltra. FOIA বা Freedom of Information Act-এর মাধ্যমে অনেক তথ্য বের হয়েছে। সিআইএর বিশেষায়িত বিভাগ, আর্মির কেমিক্যাল কর্পস Scientific Intelligence Division ডজনের বেশি কলেজ, কারাগার, হাসপাতালে এই এক্সপেরিমেন্ট চালায়। এগুলোর মধ্যে আচরণ নিয়ন্ত্রণ, যৌন নির্যাতন, বিবেক নিয়ন্ত্রণ, কেমিক্যাল এক্সপোজারসহ অনেক অবৈধ কাজ ছিল। এগুলোতে বেশিরভাগেরই সম্মতি ছিল না। বেশিরভাগ ভিক্টিম ছিল শিশু।

MKUltra হলো পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রজেক্ট যেটা কিনা সরাসরি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দাবাহিনী দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। সিআইএ এগুলো পূর্ববর্তী নাজি

অফিসারদের থেকে শিখেছিল। এ নাজি অফিসারদেরকে Operation Paperclip এর পরে নিয়োগ দেওয়া হয়। শুধু MKUltra-ই না, বরং তারা Bluebird, Artichoke, Delta, Span, Chatter, এমনকি Monarch নামে এমন এমন সব বিবেক নিয়ন্ত্রণ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া নিয়ে আসে যা আগে কখনো হয়নি।

আমেরিকা ও কানাডা সমন্বিতভাবে এ প্রজেক্ট চালিয়েছে। অনেক তথ্যই জনগণের সামনে এসেছে। তথ্যগুলো দেখে আপনার কোনোভাবেই মনে হবে না যে আমরা একবিংশ শতাব্দিতে আছি। আমাদের সরকার বেসামরিক, নিরীহ জনগণের উপর বায়োলজিক্যাল, কেমিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল অস্ত্র প্রয়োগ করছে, তাদের স্বাধীনতা হরণ করছে। আরো মজার ব্যাপার হলো, তারা সফল। তারা গোয়েন্দা, যোদ্ধা ও খুনি জন্ম দিতে পেরেছে। Manchurian প্রজেক্টে যোদ্ধা বানানো হতো। তারা ব্যক্তির চিন্তা, ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করে দিত এবং মনমতো ব্যক্তিত্ব তৈরি করে দিত। ঘুমন্ত এজেন্টরা সক্রিয় হওয়ার পর দাসের মতো সব কাজ করে। তারা ভয়াবহ সব মিশনে কাজ করে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই। পরে তাদের এসব মনে থাকে না। একসময় এ পদ্ধতি কেবল বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদেই ব্যবহৃত হতো। এখন সেটা রীতিমতো মানুষের মন নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। আপনি তথ্য বের করে আনার জন্য এ প্রক্রিয়া ব্যবহার করলে এভাবে আপনি তথ্য ঢোকাতেও পারবেন। কাজ শেষ হওয়ার পর স্মৃতি থেকে সব হাওয়া!

MKUltra-তে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছিল যে মানুষের মন, স্মৃতি কতোটা ধ্বংস করা সম্ভব। তারপর তাকে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়। ফলে প্রবল শত্রুও হয়ে যায় সম্মুখ সারির যোদ্ধা। নাজিরা যা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করত আমরা সেটা ঘরে বাইরে ব্যবহার করছি।

MKUltra নামটিই তার ইতিহাস বলে দেয়। CIA's Technical Services Staff-রা যে প্রজেক্ট চালায় তাকে MK বলা হয়। Ultra হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টপ সিক্রেট কোনো তথ্য। ১৯৫৩ সালের সিআইএ ডিরেক্টর এলেন ওয়েলস ডুলস সোভিয়েতসহ অন্যান্য শত্রুদের বশ করা, বন্দিদের কথা বের করতে MKUltra প্রস্তাব করেন। কোরিয়ান যুদ্ধে এমন হয়েছিল। সিডনি

গটলিয়েভকে এ প্রজেক্টের প্রধান করা হয়। কমিউনিস্টদের উপর প্রতিটি পরীক্ষা সফল হয়েছে বলে গবেষকরা দাবি করেন।

১৯৭৩ সালে সিআইএ ডিরেক্টর রিচার্ড হেলমের নির্দেশে প্রজেক্টটির সব প্রমাণ ধ্বংস করা হয়। Church Committee এর করা অনুসন্ধানে FOIA ১৮৭৩ সালে ২০,০০০ তথ্য ফাঁস করে। পরিচালক ছিলেন সিনেটর ফ্র্যাংক চার্চ। ১৯৭৭ সালেই প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফর্ড ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া এমন যেকোনো কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সিনেট কমিটি পররবর্তীতে তথ্য ঘেঁটে অনেক নিষিদ্ধ ও ভয়াবহ অপরাধ খুঁজে বের করেন। আর্মি বায়োকেমিস্ট ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের গবেষক ফ্র্যাংক অলসনের উপর সম্মতি ছাড়াই LSD প্রয়োগ করা হয়েছে বলে তার পরিবার দাবি করেন। সিডনি গটলিয়েভের সরাসরি নির্দেশনায় এ কাজ করা হয়। তিনি এক সপ্তাহ পর মারা যান। তার পরিবারের বিশ্বাস যে তিনি এসব জঘন্য এক্সপেরিমেন্টের তথ্য ফাঁস করতে চেয়েছেন। যাকেই হুমকি মনে করে সিআইএ তাকেই হত্যা করে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে নৈতিক কারণে তিনি Special Operation Division এর প্রধানের দায়িত্ব থেকে অবসর নেন। তিনি বায়োলজিক্যাল অস্ত্রকে নৈতিকতার বিরোধী মনে করতেন। সে প্রজেক্টে নাজি বিজ্ঞানীরাও জড়িত ছিল। ১৯৯৪ সালে ১৩ তলা বিল্ডিং থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার নিহত হওয়াকে অনেকেই আত্মহত্যা মনে করেছে। কিন্তু রিপোর্টে এসেছিল ভিন্ন কথা। ভিক্টিমদেরকে হিপনোসিস ও LSD দেওয়া হয়। তারা হত্যা করে ও একসময় নিজেরাও মারা যায়।

সিআইএ তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তাদের নিজেদের যে কাউকে খুন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

কানাডার The Fifth Estate মানুষের কাছে এক্সপেরিমেন্টে কানাডা সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যাপারটি প্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে কানাডা সরকার দায় স্বীকার করে ও ১২৭ জন ভিক্টিমকে ১ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। The Sunday Times-এ কেরিন গুডউইন এসব তথ্য দেন।

অনেক ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন এক্সপেরিমেন্টগুলো এখনও চলছে। কিন্তু প্রবল প্রতিবাদের মুখে ১৯৭০-এর দশকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ প্রজেক্ট বন্ধ

হয়ে যায়। কানাডা ও আমেরিকা অনেকভাবেই এর দায় থেকে বের হয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু সত্য সামনে চলে এসেছে।

বিষয়টির উপর ডজনখানেক বই লেখা হয়েছে। আমরা এসব নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু জরুরি বিষয় হলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবল আগ্রহ থেকে যে সরকারও নিরাপদ না তা নিশ্চিত করা। আজকালকার সন্ত্রাসী গোষ্ঠীরাও এসব ব্যবহার করে। আমাদের সরকার এসব নথি ফাঁস করে দেখায় যে তারা মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে অনেক চিন্তিত। হাস্যকর! অথচ সরকার কর্তৃক, সরকারের অর্থায়নে, গোপনে কাজটা হয়, হয়েছিল। তারা তো প্রমাণও ধ্বংস করে দেয়। তারা নারী-পুরুষ-শিশু কাউকে রেহাই দেয়নি। তারা মানবতার ধ্বংস চায় ও তাদের দাস একদল জোম্বির বিশ্ব চায়।

শিক্ষার সুযোগ

১৯৫৫ সালে সিনেটের বিচারে MKUltra থেকে বেরিয়ে আসা তথ্যে কিছু প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

অযৌক্তিক এবং অসহিষ্ণু চিন্তার জন্ম দিবে এমন বিষয় লিখে যাওয়া। যাতে যেন ভিক্টিম সামাজিকভাবে ধিকৃত হয়।

- কল্পনা এবং অতি ধারণার সুযোগ বাড়িয়ে দিবে।
- এমন কোন প্রযুক্তি যা ভিক্টিমের প্রজ্ঞা কমিয়ে দিবে কিংবা বাড়িয়ে দিবে।
- এমন প্রযুক্তি যা ভিক্টিমের মধ্যে অ্যালকোহলের প্রভাবকে আরো বাড়িয়ে দিবে।
- কারো মধ্যে কোন রোগের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা যা তার মানসিকতা নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগানো যায়।
- এমন প্রযুক্তি যা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে ব্যক্তির মস্তিষ্কের ক্ষতি এবং স্মৃতি মুছে ফেলতে সাহায্য করবে।
- সেই ব্যক্তি নির্যাতন, জিজ্ঞাসাবাদ সহ্য করতে পারে। সেটাকে ব্রেইনওয়াশিং বলা হয়।
- শারীরিক বা মানসিক বিভিন্ন ব্যায়াম যা কিনা ব্যক্তিকে অ্যামনেশিয়া দ্বারা অধিক প্রভাবিত করবে।

- এমন ধরনের শখ ও বিভ্রান্তি তৈরী করা যেন ব্যক্তি সমাজের সাথে চলতে না পারে।
- অনিদ্রা বা পা প্যারালাইজ করে দেওয়া।
- এমন কেমিক্যাল যা ব্যক্তির শারীরিক সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলবে। ব্যক্তিকে নির্যাতনকারীর উপর আরো বেশি নির্ভরশীল করে দেওয়া।
- মানসিক বিভ্রান্তি এত বেশি বাড়িয়ে দেওয়া যাতে ব্যক্তি জিজ্ঞাসাবাদের সময় কোন নির্দিষ্ট নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে।
- এমন কিছু যা ব্যক্তির শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দিবে; তবে সেটা স্থায়ী হবে না।
- খাবার, সিগারেট বা পানীয়-এর মাধ্যমে একটি অজ্ঞান করার পিল দেওয়া।
- ব্যক্তি যাতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কোন প্রকারের শারীরিক কার্যক্রম করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

Source: "Senate MKUltra Hearing: Appendix C—Documents Referring to Subprojects," page 167 (in PDF document page numbering). Senate Select Committee on Intelligence a Committee on Human Resources. August 3, 1977.

Paperclips & Programming: বিবেক নিয়ন্ত্রণে নাজি বাহিনী

JIOA বা Joint Intelligence Objectives Agency ও আমাদের সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজিদের সাথে জেতার পর সেই একই বিজ্ঞানীদের আমেরিকায় নিয়ে এসেছে। তারপর Project Paperclip বা Operation Overcast-এ কাজে লাগিয়েছে। তারা আমাদের দেশেই থাকে। তারা তাদের চিন্তা-দক্ষতা, অন্যদের অস্ত্র, রকেট, এরোডায়ানামিক্স কাজে লাগিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালি করতে চায়। ১৮০০ নাজি বিজ্ঞানী ও তাদের পরিবার হোয়াইট স্যান্ড প্রুভিং গ্রাউন্ড, ফোর্ট স্ট্রং, ফোর্ট ব্লিসে থাকে। সবগুলোই সরকারের নজরের আওতায়। তারা ছিলেন জিওফিজিসিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট, বিজ্ঞানী, ইলেক্ট্রনিক এক্সপার্ট, গোয়েন্দা, ডাক্তার, গবেষক, এরোডায়ানামিক ইঞ্জিনিয়ারসহ অনেক শ্রেণি-পেশার মানুষ। তাদের মধ্যে ওয়ার্নার ভন ব্রন, উইলহেম জুংগার্ট, ফ্রিতজ মুলার, রেইনহার্ড গেহলেন ও থিওডর পাপুলের মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও ছিলেন।

আমেরিকা Bureau of Mine মিসওরিতে কেমিক্যাল প্লান্টে কাজ করার জন্য অনেক জার্মানকে পাঠিয়েছে।

মূল লক্ষ্য ছিল এসব মেধাবী নাজিদের ব্যবহার করে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা, সোভিয়েত থেকে অধিক তথ্য বের করে আনা। এরাই তারা, যারা হিটলারকে প্লেগ সৃষ্টিতে ও স্যারিন গ্যাস আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল। এদের অনেকেই যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি হয়েছিল। তাদেরকে আমেরিকা নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিচারের আওতা থেকে বের করে এনেছে। প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান এসব সম্পর্কে একেবারেই জানতেন না। JIOA এসব বিজ্ঞানীদের নতুন নাম, নতুন পরিচয়, নতুন অতীত দিয়ে তাদের থেকে তাদের পুরো নাজি ক্যারিয়ারকে আলাদা করে ফেলেছিল। এখন তারা পুরো আমেরিকান।

১৯৪৫ সালের ১৯ জুলাই জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ জার্মান আর্মি রকেট সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে তাতে ওয়ার্নার ভন ব্রুনকে টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেটা ক্যাম্প ওভারকাস্টে অবস্থিত। সেখানে তাদেরকে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ ব্যবহার করে ফেলা পর্যন্ত রাখার নির্দেশনা ছিল। তখন তারা

মুক্তি পেলেও পেতে পারে। একে Operation Overcast বলা হয়। পরবর্তীতে সামনে চলে আসার পর Project Paperclip নামে কাজ শুরু করা হয়।

সাংবাদিক এনি জ্যাকবসন তার বই Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program That Brought Nazi Scientists to America-এ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, "তাদের কি আগের পাপ মোচন হয়ে গিয়েছে?" বইয়ে তিনি নাজি বিজ্ঞানীদের জঘন্য কাজগুলো তুলে এনেছেন। যার মধ্যে তাদের বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া, এলএসডি ব্যবহার ইত্যাদিসহ অনেক নির্যাতন উঠে এসেছে। আর দেখুন, এ মানুষগুলোকেই তাদের যোগ্যতার বিবেচনায় এদেশের নাগরিকত্ব ও মোটা অংকের বেতন দেওয়া হয়, হচ্ছে। জ্যাকবসন লিখেন, "তাদের অনেকের মতে, তাদের কাজটা মন্দের ভালো। আমেরিকা তাদেরকে না নিলে সোভিয়েত নিয়ে নিতোই। জেনারেল ও কর্নেলরা এদেরকে শ্রদ্ধা করে। তারাও একই কথা মনে করেন"।

শয্যাসঙ্গী নিয়ে কথা বলুন!

মূল ব্যক্তিত্ব

সিডনি গটলিয়েভ, যিনি ডোনাল্ড ইউইন ক্যামেরন নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি ছিলেন MKUltra-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি একজন স্কটিস সাইকিয়াট্রিস্ট। McGill University in Montreal-এর নিমন্ত্রণে তিনি ১৯৪৩ সালে কানাডায় এ প্রজেক্টে যোগ দেন। এখানেই রকফেলার ফাউন্ডেশন Allen Memorial Institute of Psychiatry প্রতিষ্ঠা করে। ক্যামেরন মানুষের নিউরোসায়েন্স নিয়ে কাজের জন্য অনেক জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মানুষের বিবেক নিয়ন্ত্রণের পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপক ছিলেন এবং Psychic Driving নামের একটি প্রজেক্ট চালাতেন। সেখানে ইনসুলিন ও মাদকের মাধ্যমে ভিক্টিমদের সাময়িক কমায় নিয়ে যাওয়া হতো এবং তাদেরকে কিছু টেপ শুনতে বাধ্য করা হতো। টেপটিতে কিছু ভালো ভালো কথা ও মিউজিক ছিল যেগুলো ব্যক্তির বর্তমান চিন্তাধারাকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে ফেলত।

তার টেকনিকের মধ্যে ইলেক্ট্রিক শক ও LSDও ছিল। তার উদ্দেশ্য ভালো হলেও পদ্ধতি খুবই খারাপ ছিল। মানুষের সম্মতি ছাড়াই রোগীদের রীতিমতো নির্যাতন করা হতো। এসব এক্সপেরিমেন্ট আমেরিকান সেনাবাহিনীর কর্নেলের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খুব দ্রুত ড. ক্যামেরনের কাছে চিঠি যায়। MKUltra-র অংশ হিসেবেই সিআইএ ক্যামেরনের প্রজেক্টে টাকা ঢালতে থাকে। নিউ ইয়র্ক কর্নেল ইন্সটিটিউট থেকে গোপনে অর্থায়ন হতো। কেননা সাংবিধানিকভাবে এসব এক্সপেরিমেন্ট আমেরিকার মাটিতে বৈধ না। অবশ্য পরে সবই বের হয়ে আসে। অনেক বইয়েই তার অন্ধকার জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। তার মধ্যে একটি হলো ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হওয়া আনা কোলিনসের লেখা In the Sleep Room: The Story of CIA Brainwashing Experiments in Canada বইটি। সেখানে দেখানো হয় ক্যামেরন কীভাবে মানুষের মধ্যে ভীতি প্রবেশ করাতেন। এ ট্রমা থেকে অনেকে পুরো জীবনেও বেরিয়ে আসতে পারত না। যখন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসত তখন তাদের আর কোনো স্মৃতিই মনে থাকত না। তারা সাথে আরো অনেক কিছুই ভুলে যেত। অনেকে হাঁটাও। অনেকে তার বাচ্চার কথাও ভুলে যায়। সবগুলোর কারণ একটাই—মস্তিষ্ককে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়াটি।

The Scotsman এর ২০০৭ সালের সংস্করণে ক্যামেরনের জীবনকে "Stunning Tale of Brainwashing, the CIA and an Unsuspecting Scots Researcher." বা ব্রেইনওয়াশিং এর অভূতপূর্ব কাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সেখানে কিছু তথ্য উঠে এসেছে। যেমন ক্যামেরন জানতেন না যে সিআইএ তার কাজের অর্থায়ন করছে। অবশ্য সেটা তার বর্বরতার পক্ষে কোনো দলিল না। তার ইলেক্ট্রিক শক কিন্তু মাদকাসক্তদের ফিরিয়ে আনতে ভালোই কাজ করতো। ক্যামেরনের ল্যাবে নির্যাতিত হওয়া কিছু ভিক্টিমের সাক্ষাৎকার নেয় তারা। আমেরিকার যোদ্ধারা কোরিয়ান যুদ্ধে Sleep Room এ নির্যাতিত হয়েছিল। তা থেকেই তিনি তার ল্যাবের নাম দেন, Sleep Room।

ল্যাসলি অরলিকোর মা ভেইল নির্মমভাবে সেখানে নির্যাতিত হয়েছেন। তাকে প্রায় ১৬টির মতো LSD দেওয়া হয় ও প্রচুর ইলেক্ট্রিক থেরাপি প্রয়োগ করা হয়। তিনি এলেনকে ছেড়ে অন্য ভালো থেরাপিস্ট নিয়োগ দেওয়ার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেন, এসব কিছু ১৯৭৭ সালে আমেরিকান কংগ্রেস এ লোকটা সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করার পরই তারা জানতে পারেন। The Scotsman এর প্রবন্ধ অনুসারে, তার মা ভেইল ভেবেছিলেন যে ক্যামেরন হলেন ঈশ্বর। তিনি ভুল করতে পারেন না। তারপর সিআইএর দেওয়া বিভিন্ন

প্রযুক্তি তার উপর প্রয়োগ করা হয়। তিনি তখন পাগল হয়ে যান ও অনেকদিন এমন অবস্থায়ই থাকেন।

সিআইএ ১৯৮৮ সালে তাদেরকে সাড়ে ৭ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়, কিন্তু তিনি একে কালো টাকা হিসেবে দেখতেন। তার মতে, সিআইএ তার এ অবস্থার কোনো দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেনি। এসব এক্সপেরিমেন্ট, নির্যাতন, মানুষকে দানবে পরিণত করার দায় ক্যামেরন কখনোই গ্রহণ করেননি। একটি গর্তের চেয়ে একজন মানুষকে কি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবা উচিত না? সরকারের ক্ষমতার প্রতি এ প্রবল যৌনায়িত মুগ্ধতার বলি যে কতো বাবা, মা ও পরিবার হয়েছে তা তো বলাই বাহুল্য।

আমাদের বহিশত্রু থেকে এখন আমাদের সরকারকে অধিক ভয় পেতে হয়।

নোট: ১৯৫৩ সালে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশনে ড. ক্যামেরনকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশনে তাকে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

ক্যামেরনের ভুক্তভোগীদের একজন, ক্যারল রুটজ (Carol Rutz), MKUltra থেকে বেঁচে ফেরা একজন হিসাবে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ বই লিখেছিলেন: A Nation Betrayed: Secret Cold War Experiments Performed on Our Children and Other Innocent People। রুটজ শৈশবকাল থেকেই ভুক্তভোগী হিসাবে তার নিজের জীবনের বর্ণনা দেন, এর পাশাপাশি উল্লেখ করেন FOIA-এর নথি এবং গবেষণাগুলোর পিছনের লোকদের সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণার মাধ্যমে তার সত্য সন্ধানের অভিযানের কথাও। তিনি বর্ণনা করেছিলেন, ১৯৫২ সালে তাঁর নিজের দাদা তার ৪ বছর বয়সে আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে সিআইএর হাতে তুলে দিয়েছেন। তারপরে কয়েক বছর ধরে তারা তাঁকে অনুগত করতে এবং ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করতে পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ, হিপনোসিস, তড়িৎ শক, ড্রাগস, সেন্সরি ডিপ্রাইভেশান এবং ট্রমা ব্যবহার করতো। নির্দিষ্ট কাজের জন্য একাধিক ব্যক্তিত্ব তৈরি করা হতো। একটি পোস্ট-হিপনোটিক ট্রিগারের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব থেকে ব্যক্তিত্বে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন করা

হতো। তারপর তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তা করানো হতো এবং পরে এটি মনে থাকতো না।

এইসব কাজগুলোর মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের যৌন চাহিদা পূরণ, গুপ্তচরবৃত্তি, হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য ভুক্তভোগীদের অত্যাচারে সহায়তা করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুটজ সিআইএর অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো, যেমন ব্লুবার্ড এবং আর্টিচোক (Artichoke)-এরও শিকার হয়েছিলেন। ৪৮ বছর পরে ১৮,০০০ এরও বেশি পৃষ্ঠার উন্মুক্ত (declassified) দলিল প্রমাণ করল যে সে ঠিকই বলেছে। তার কথাগুলো MKUltra বাকি ভিক্টিমদের মতোই। নেটে এসব ছড়িয়ে আছে। তবে তার কথার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের পয়েন্টটা। এত ধরনের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় যে মূল বা "front" ব্যক্তিত্বকে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

কীভাবে একটি ব্যক্তিত্ব তৈরী করা হয়েছিল সে বর্ণনা দিতে গিয়ে রুটজ লেখেন, "পরদিন আমাকে আমার ছোট স্যুটকেস সহ একটি সাদা প্যানেল ভ্যানে রাখা হলো। (ডেট্রয়েটের কোনো এক স্থানে পৌঁছানোর পর) আমাকে তীব্র ইলেক্ট্রোশক দেয়া হলো যাতে করে আমার মস্তিষ্ককে পৃথক করা যায় এবং স্যাম্যান্থাকে (আরেকটি ব্যক্তিত্ব) বের করে আনা যায়। সে কখনো ব্যথা অনুভব করে না। স্যাম্যান্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমার দেহের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিত। সে আমার বাকী সিস্টেম থেকে ব্যথা এবং স্মৃতিগুলোকে লুকিয়ে রাখতো।"

যেসব শিশুরা চরম ট্রমা অনুভব করে এবং তা থেকে বেরোতে পারে না, তাদের ব্যক্তিত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে। MKUltra পরীক্ষকরা এবং হ্যান্ডলাররা মনে করতেন যে কোনো শিশুর নমনীয় এবং নির্দোষ মনই কাজ করার সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র। রুটজ ১২ বছর বয়সে তাঁকে নিয়ে ডা. ক্যামেরনের পরীক্ষার কথা লিখেছেন। তাঁকে ক্যুরেয়ার (curare)-এর একটি শট দেওয়া হয়। একটি ল্যাব স্থাপন করে হাসপাতালের পিছনের আস্তাবলে একটি বাক্সে তাকে রেখে দেয়া হয়। তার গায়ের উপর সাপ রেখে বাক্সের ঢাকনাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ক্যুরেয়ারের কারণে তিনি নড়াচড়া করতে পারেননি। তারপরে তিনি টেপড প্রোগ্রামিংয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন ড. ক্যামেরনের বিখ্যাত "সাইকিক ড্রাইভিং" এর। এতে ট্রিগার কোড টেপড করা ছিল। এটা ছিল রীতিমতো সেলফ-ডিস্ট্রাকশান। তিনি লেখেন, "যদি আমার কখনও সব মনে পড়তে শুরু হয় তবে

এমন পরিস্থিতিতে ঐ পরীক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে বলতে বাধা দেয়ার জন্যই এটা করা হয়েছে।"

যখন অল্টার প্রোগ্রামিং-এর কথা আসে, বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা একাধিক স্তরের প্রোগ্রামিংয়ের সংস্পর্শে আসার কথা বলেন:

- **আলফা:** নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে সাধারণ প্রোগ্রামিং।
- **বেটা:** শিশু পর্নোগ্রাফি, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি সহ যৌন প্রোগ্রামিং, সমস্ত নৈতিক দৃঢ়তা দূর করে যাতে করে বাধা ছাড়াই যৌন কার্য সম্পাদন করা যায়।
- **ডেলটা:** এক স্লিপার অ্যাসাসিন বা প্রশিক্ষিত ঘাতক। এই স্তরটি সমস্ত ভয় অপসারণ করে এবং অস্ত্র এবং হত্যা ও লাশ নিষ্পত্তি করার পদ্ধতিগুলির সাথে প্রশিক্ষণ জড়িত।
- **থেটা:** মানসিক হত্যার একটি ধরণ যা কেবলমাত্র উচ্চ স্তরের ESP এবং মানসিক ক্ষমতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- **ওমেগা:** সেলফ-ডিস্ট্রাক্ট প্রোগ্রাম ইনস্টল করা হয়। যেন বেঁচে ফেরা কারও সব মনে পড়ে গেলে সে তা প্রকাশ করতে না পারে।

রুটজ লিখেছেন যে, "এটা শিশুদের পরিণত করেছিল যোদ্ধাতে। তারা হতে পারে পাপেট, গুপ্তচর এবং খুনি। তারা সমাজে সহজে এবং বেনামে মিশে যেতে পারে, যতক্ষণ না কোনও কোড তাদের জাগ্রত করার জন্য এবং কার্যসম্পাদন করার জন্য ব্যবহার করা হয়।"

MKUltra থেকে বেঁচে ফেরা অন্যরাও আচারানুষ্ঠানে নির্যাতন, যৌন নির্যাতন এমনকি শিশুকামের মতো অনুরূপ ঘটনাও বর্ণনা করে থাকে। এসব নির্যাতনে তাদের পরিবারের সদস্যরাও জড়িত থাকে। তাদের অনেকেই এসব কুকর্মে সহায়তা করে। তাদের নিয়ন্ত্রকের যে কূটবুদ্ধিই থাকুক না কেন তারা তাদের বাচ্চাকে জলের দামে বিক্রি করতে রাজি। বেঁচে ফেরা ব্যক্তিদের কেউ কেউ কালো জাদু, স্যাটানিজম এবং কাল্ট প্র্যাক্টিসের সংযোগের কথাও বলে। অন্যরা ফ্রিম্যাসনের মতো গোপন সংসঠনগুলোর যুক্ত থাকার কথা বলে, তারা দাবি করে যে শিশুদের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত লোকেরা প্রায়ই ম্যাসন হতো। অন্যরা উঁচু মানের রাজনীতিবিদ এবং বিশ্ব নেতাদের প্রতারণা, অপব্যবহার এবং

নির্যাতনের জালে জড়িত থাকার কথা বলত যাদের মধ্যে আমেরিকার প্রাক্তন কিছু প্রেসিডেন্টও রয়েছে।

যদিও আমাদের কাছে এই দাবির অনেকগুলোরই কোনও বস্তুগত প্রমাণ নেই, তবে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিদের অনেকের কাছে একই রকম ঘটনার অভিজ্ঞতা এবং নথিভুক্ত দলিলগুলোর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে আসলেই MKUltra, ব্লুবার্ড, আর্টিচোক, মোনার্ক ইত্যাদির অস্তিত্ব ছিল। আমরা এই ভয়াবহতাকে এড়িয়ে পারি না। আমরা জানি যে আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশে বন্দিরা নির্যাতিত হয়েছিল এবং হচ্ছে, বিশেষত যারা সন্ত্রাসী সন্দেহে আটক হয়েছে। আমাদের নিজস্ব (আমেরিকার) কারাগার, এতিমখানা এবং অ্যাসাইলামগুলোতে দূর্বল এবং ক্ষমতাহীনদের উপর সবচেয়ে ভয়াবহ এবং আপত্তিকর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর অনুমতি দেওয়ার এমনই এক অন্ধকার ইতিহাস রয়েছে।

বিংশ শতাব্দির অনৈতিক মানবীয় গবেষণা

ড. সারাহ এন আর্কিবাল্ড, পিএইচডি

বিংশ শতাব্দিতে আমরা অনেক নতুন আবিষ্কার দেখেছে। বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নতি লাভ করেছে। ছোটদের বিভিন্ন প্রাণঘাতি রোগের ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হয়েছে। সেই সাথে মানবদেহকে আরও ভালোভাবে বোঝার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে, পাশাপাশি পেশাদার চিকিৎসকদের হস্তক্ষেপে মৃত্যু অনেকাংশেই কমে এসেছে।

এসকল আবিষ্কার সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্ভাগে আছে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক পরিচালিত প্রশ্নবিদ্ধ, অনৈতিক ও জঘন্য কিছু গবেষণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নুরেমবার্গ ট্রায়ালের সময় কিছু গবেষণার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে অবস্থানকারীদের উপর পরিচালিত বর্বর গবেষণাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য নাজিরা যুক্তি দেখায় যে এ ধরনের অনৈতিক কাজ সারা বিশ্ব জুড়ে হচ্ছে, বিশেষ করে গবেষণার গিনিপিগ হিসেবে বন্দিদের ব্যবহার করার ব্যাপারে আমেরিকার নাম উল্লেখ করে। বিচারকরা রায় দিয়েছিলেন যে এর কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। তাদের সবাইকে দীর্ঘ কারাদণ্ড বা মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

তবে বিচারকরা মানুষ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নৈতিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। ঝুঁকি হ্রাস এবং সম্মতিসহ বেশ কয়েকটি শর্ত এনে মানুষের গবেষণা নিয়ে তারা আইন প্রণয়ন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে নুরেমবার্গ কোড কেউ মানেনি এবং মানুষ নিয়ে করা এসব পরীক্ষা চলতেই থাকে। ১৯৬৪ সালে হেলসিঙ্কির ঘোষণাপত্রটি ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক খসড়া এবং গৃহীত হয়েছিল। গ্রুপটি নির্ধারণ করেছিল যে "গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি এবং ফলাফল থাকবে।"

নুরেমবার্গ কোড এবং হেলসিঙ্কির ঘোষণাপত্রটি মার্কিন আইনে সংশোধিত হয়নি। ফলে গবেষকদের জন্য মানুষ নিয়ে কাজ করায় কোনো বাঁধা থাকলো না। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা জনসাধারণের সামনে এসেছিল। জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে আওয়াজও তুলেছিল।

এই পরীক্ষ
(এনআইএই
সাল থেকে
আমেরিকান
জন্য চালা
অংশগ্রহণ
বিষয়ে কিছ
অথচ তা স

১৯৫
উইলোব্রুব
ছিল মানি
সমস্যা ছি
রোগের স
স্ট্রেইন (
করা বাচ্চ
তারা তখ
করা হতে
সম্মতি দ
থাকতে
Chronic
গবেষকর
করতে প
রোগীর
প্রতিক্রিয়া
করা হয়
হওয়া পর্য

নুরে
আগে ও
না করেই

এই পরীক্ষাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা (এনআইএইচ) দ্বারা পরিচালিত টুস্কেগি (tuskegee) সিফিলিস স্টাডি। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল অবধি এই গবেষণাটি অ্যালাবামার এক দরিদ্র আফ্রিকান-আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে চিকিৎসাবিহীন সিফিলিসের প্রভাব নির্ধারণ করার জন্য চালানো হয়েছিল। ১৯৪০-এর দশকে চিকিৎসা সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও অংশগ্রহণকারীদের তাদের সিফিলিস নির্ণয়ের বিষয়ে বা রোগের চিকিৎসার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। শত শত লোককে নিরাময় না করেই রাখা হয়েছিল। অথচ তা সহজেই নিরাময় করা যেত।

১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কের স্টেটেন দ্বীপের উইলোব্রুক স্টেট স্কুলে হেপাটাইটিস পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেটা ছিল মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুল। হেপাটাইটিস স্কুলের একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল, সংক্রমণ প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তবে এই রোগের সংক্রমণ সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিল এবং স্কুলে প্রভাবশালী দুটি স্ট্রেইন (এ এবং বি) ছিল বলে জানা গিয়েছিল। এই পরীক্ষাগুলোতে, সদ্য ভর্তি করা বাচ্চাদের সংক্রমণ রোধের নিরাময় হিসেবে অ্যান্টিবডি দেওয়া হয়েছিল। তারা তখন দুটি দলে বিভক্ত ছিল। একটি গ্রুপের সদস্যদের হেপাটাইটিস ইঞ্জেক্ট করা হতো এবং অন্যদের করা হতো না (কন্ট্রোল গ্রুপ)। পিতামাতাকে একটা সম্মতি দলিল দেওয়া হতো এবং বলা হতো তাদের সন্তানের উইলোব্রুকে থাকতে দেওয়ার জন্য এতে স্বাক্ষর করতে হবে। ১৯৬৩ সালে Jewish Chronic Disease Hospital Study পরিচালিত হয়েছিল। এতে জড়িত গবেষকরা জানতে চেয়েছিলেন যে মানবদেহ ক্যান্সার কোষকে কেন প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সম্মতি প্রদান ছাড়াই দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় ভোগা ২২ জন বৃদ্ধ রোগীর দেহে জীবিত ক্যান্সার কোষ ইঞ্জেক্ট করা হয় এবং সংক্রমণ ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়। ভাগ্যক্রমে, এই গবেষকদের প্রতারক সাব্যস্ত করা হয়। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাধারণ বিধি ৪৫ সিএফআর ৪৬ গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত এটা তেমন প্রয়োগ হতো না)।

নুরেমবার্গ কোড এবং হেলসিঙ্কির ঘোষণা সত্ত্বেও (এই নির্দেশিকা প্রণয়নের আগে ও পরে উভয় সময়েই) যুক্তরাষ্ট্রে ঝুঁকি এবং পরীক্ষাগুলোর ফল বিবেচনা না করেই নির্বিচারে কয়েদিদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই থাকে। দুটি হাই

প্রোফাইল কেইস হলো ওরেগন এবং ওয়াশিংটন স্টেটের কারাগারের রেডিয়েশন স্টাডি এবং ফিলাডেলফিয়ার হোমসবার্গ কারাগারে "নন-থেরাপিউটিক বায়োমেডিকেল রিসার্চ স্টাডি" (Dober ২০০৮)। পেনসিলভেনিয়ায় বন্দিদের উপর ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত পরীক্ষার সাবজেক্টকে রক্ষার জন্য যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা না করেই পরীক্ষা পরিচালনা করা হতো। একই ব্যক্তির উপর একই সময়ে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো। এই পরীক্ষাগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল স্কিন প্রোডাক্টস, ওষুধ এবং চিকিৎসার কৌশলের টেস্টিং। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করারও নজির আছে। এই ক্ষেত্রে, কয়েদিকে গবেষণার জন্য ভলেন্টিয়ার হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদন্ড বিলম্বিত করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এমন এক বন্দিকে কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে আনা হয়েছিল এবং রোগের সংক্রমণ এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য হাওয়াইয়ের কুষ্ঠ কলোনীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। ক্যান্সারে আক্রান্ত এক অল্প বয়সী মেয়ের সংস্পর্শে আসতে এক কয়েদী ভলেন্টিয়ার করেছিলেন, যাতে তার রক্ত মেয়েটির শরীরে প্রবেশ করিয়ে ক্যান্সার ফিল্টার করা যায়। এই চেষ্টার পরেও মেয়েটি মারা যায়। এইসব এবং আরও অনেক পরীক্ষার ফলে মার্কিন সরকার তাদের স্বায়ত্তশাসনের অভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে অসাধু উপায় অবলম্বন করে গবেষকরা জনগণকে সুবিধার্থে ব্যবহার করার কারণে কারাবন্দিদের রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭৯ সালে বেলমোন্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বদান্যতা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সবাইকে আহ্বান জানানো হয়। এই প্রতিবেদনটি ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিক হতে ১৯৮০ এর দশকের প্রথম দিকে বর্তমান বিধিমালাগুলোতে (৪৫ সিএফআর ৪৬, যা সাধারণ বিধিমালা হিসেবেও পরিচিত) তে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা পরীক্ষাগুলোর কারণে, অন্যদের মধ্যে মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানব সেবাদান বিভাগে গর্ভবতী মহিলা (৪৫ সিএফআর ৪৬ সাবপার্ট বি), কয়েদী (৪৫ সিএফআর ৪৬ সাবপার্ট সি) এবং শিশুদের (৪৫ সিএফআর ৪৬ সাবপার্ট ডি) সংবেদনশীল জনসংখ্যা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সারাহ এন. আর্কিবাল্ড, পিএইচডি, বর্তমানে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, বাল্টিমোর (UMB)-এর হিউম্যান রিসার্চ প্রটেকশন অফিসের গবেষণা সম্মতি

বিশেষজ্ঞ এবং মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, বাল্টিমোর কাউন্টি (UMBC)-র সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক। ডা. আর্কিবাল্ড গবেষণা নীতিশাস্ত্র এবং অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থার মধ্যে ফাঁসির শাস্তি এবং বৈষম্যের উপর জোর দিয়ে অপরাধমূলক বিভিন্ন ক্ষেত্র অধ্যয়ন করেন। ২০১৫ এর প্রথম দিকে Capital Punishment in U.S. States: Executing Social Inequality? শিরোনামে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

পিটার লুইস এবং তার বোন ক্যারলকে ১৯৫০-এর দশকে জার্মানি থেকে দত্তক নেয়া হয়েছিল। MKUltra থেকে বেঁচে ফেরা পিটার তাঁর মার্কিন সেনাবাহিনীর ফাঁদে পড়ার গল্প বলেছেন। তার সৎ মা তাকে এমন বড়ি খেতে দিতেন (সম্ভবত LSD) যাতে সে হ্যালুসিনেশন এবং দুঃস্বপ্ন দেখত। ছোটবেলায় তাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পানে বাধ্য করা হয় এবং হাড়ের বায়োপসি করা হয়। ১৯৫৮ সালে ওয়াল্টার রিডের অন্যান্য বয় স্কাউটদের দেহেও এসব পরীক্ষা চালানো হয়। সেখানে শিশুদেরকে নাম দিয়ে নয়, সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হতো। পিটারের বোন ২০ বছর আগে করা তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষাগুলোর ফলে মস্তিষ্কের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলাদের এক প্রকার পানীয় দেওয়া হয়। তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল যে এটা ভ্রূণের জন্য উপকারী। ভ্রুণের মারাত্মক কিছু ত্রুটি দেখা দেয়ার আগ পর্যন্ত তারা জানতেন না যে উপাদানটিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছিল।

ওয়াশিংটন ডিসির লরেল-এর চিলড্রেনস সেন্টারে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হিসাবে চিহ্নিত শিশুদের উপর ডায়েট পিল পরীক্ষা করা হয় এবং জনস হপকিন্সে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নাকের রেডিয়াম ইরেডিয়েশনের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য সরকারী স্কুলের থার্ড গ্রেডার শিশুদের ব্যবহার করা হয়।

The UFO Enigma

এমনকি UFO Enigma-এর সাথেও MKUltra জড়িত। Close Encounters of the Fatal Kind বইয়ে লেখক এবং গবেষক নিক রেডফার্ন MKUltra এজেন্ডা এবং ইউএফও এনকাউন্টারগুলোর মধ্যকার সংযোগগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন। রেডফার্ন তার বইয়ে বোসকো নেদেলকোভিকের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি ছিলেন এক যুগোস্লাভিয়ান যিনি ১৯৫০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (AID)-এ নিয়োগ পেয়েছিলেন। সেই সময় তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য অত্যন্ত গোপন কিছু প্রকল্পে কাজ করেছিলেন। রেডফার্ন লেখেন:

নিদেনকোভিকের মতে, ১৯৬০ এর দশকে আমলাতন্ত্র গোপনে ইউএফও সম্পর্কিত তথ্যগুলোকে জাল করার কাজে লিপ্ত ছিল। ১৯৫০ এর দশকে সিআইএ তেমনই কিছু পদ্ধতি দিয়ে MKUltra শুরু করে।...এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাইন্ড অল্টারিং ককটেইল সাথে হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগস ব্যবহার করার আগে সাধারণ জনতাকে বোঝানো হয় যে এটা আসলে এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ভ্যারাইটি। বাস্তবতা ছিল খুবই ভিন্ন।

রেডফার্ন আরো বলেন, পুরুষ এবং মহিলাদের মস্তিষ্কে ইউএফও ঘটনাগুলো তৈরি করার পিছনে অন্য এজেন্ডা ছিল। প্রথমটি ছিল, মস্তিষ্ককে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেছে বলে বিশ্বাস করানো যায় কিনা যা সে আদতে প্রত্যক্ষ করেনি এবং দ্বিতীয়টি ছিল নকল এবং ম্যানিপুলেটেড ঘটনাগুলো স্টেজড করে পর্যবেক্ষণ করা যে যদি কখনো এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল সত্তার আবির্ভাব ঘটে তবে জনগণ কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে। নেডেলকোভিক বলেছিলেন যে, ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫ এর মধ্যে ইউএফও ঘটনা বানোয়াট করার পরিকল্পনা ছিল এবং এমনকি কোথায় বানোয়াট ঘটনা ঘটবে তা-ও জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটবে নিউ হ্যাম্পশায়ারের এক্সেটারে। মজার বিষয় হল, ১৯৬৫ সালে নরম্যান মাসক্যারেলো নামক এক ব্যক্তি এক্সেটারে ঠিক এমন একটি ইউএফও ইভেন্ট প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এক বছর পরে Incident at Exeter নামে একটি বইয়ে সাংবাদিক জন জে. ফুলার এসব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, মানসিক নিয়ন্ত্রণ, MKUltra এবং ফ্র্যাঙ্ক ওলসনের মৃত্যুর সাথে এর সংযোগ ছিল —যাকে প্রথমে আত্মহত্যা এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত কারণে হত্যা বলে দাবি করা হয়। ১৯৫৭ সালে ডক্টর কার্লিস ওসিসের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর MKUltra প্রোগ্রামে ফুলারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং MKUltra প্রোগ্রামটির অভ্যন্তরীণ পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিছু ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন সম্ভবত বেটি এবং

বার্নি হিল অপহরণের পিছনেও ইউএফও থাকতে পারে যা ১৯৬১ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ারেই ঘটে।

বিশ্ব সত্যিই খুব ছোট।

বোমাবাজের আশ্রয় হার্ভার্ড?

MKUltra হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েক ডজন সুযোগ-সুবিধা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা নিযুক্ত করেছিল। ১৯৫৯ এর ফল থেকে ১৯৬২ সালের বসন্ত পর্যন্ত ২২ জন হার্ভার্ড আন্ডারগ্রাড শিক্ষার্থী চূড়ান্ত চাপ, আবেগী ও মৌখিক নির্যাতন এবং আচরণগত পরিবর্তন সম্বলিত একাধিক গবেষণার সাবজেক্ট ছিল। হেনরি ম্যুরে, সামাজিক সম্পর্ক বিভাগের একজন অধ্যাপক এবং হার্ভার্ড সাইকোলজিক্যাল ক্লিনিকের প্রাক্তন পরিচালক, ঘটনাক্রমে যিনি OSS বা স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসেস অফিসের অংশ ছিলেন এবং সেই সময়ে সামরিক ব্রেইনওয়াশিং পরীক্ষার তদারকি করতে সহায়তা করেছিলেন, পরবর্তীতে এমনসব পরীক্ষা চালিয়েছিলেন সমালোচকরা যাকে অনৈতিক এমনকি অবৈধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। পরীক্ষা চালানো হতো ক্যাম্পাসের মোলিকিউলার এন্ড সেলুলার বায়োলজি বিল্ডিংয়ের পেছনের এক বাড়িতে যা "The Annex" নামে পরিচিত। এই বাড়িতেই তরুণ শিক্ষার্থীদের উপর ভয়াবহ পরীক্ষাগুলো চালানো হতো, ১৬ বছর বয়েসী থিওডোর জন ক্যাজিনস্কি-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ম্যুরে তার পরীক্ষার সাবজেক্টকে প্রচন্ড জিজ্ঞাসাবাদ এবং মৌখিক নির্যাতন করতেন যাকে তিনি বলতেন "প্রচন্ড শক্তিশালী, সুদূরপ্রসারী, ব্যাক্তিগতভাবে অবমাননাকর" আক্রমণ, এর মাধ্যমে তিনি তার সাবজেক্টের অহংবোধ এবং অতি লালিত আদর্শ ও বিশ্বাসকে আক্রমণ করতেন এটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য যে মানুষ চাপের মধ্যে কীভাবে আচরণ করে।

পরবর্তীতে ক্যাজিনস্কি 'আনাবম্বার' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। সাবজেক্টের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে মুরের আপত্তিজনক পরীক্ষার কি কোনো ভূমিকা আছে? ২০০০ সালের জুনে The Atlantic পত্রিকায় "হার্ভার্ড এবং দ্যা আনাবম্বারের উৎপত্তি" শিরোনামে রিপোর্টার অ্যালটন চেস লিখেছেন, "এতো ধরনের দ্বিধাবিভক্ত তথ্য একজনকে জিজ্ঞাসু করে তুলতেই পারে, এই পরীক্ষার কি এমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল যা প্রকাশ করতে ম্যুরে অনিচ্ছুক ছিলেন? মাল্টিফর্ম-অ্যাসেসমেন্ট প্রকল্পটি কি কিছুটা

হলেও কোনও ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার দক্ষতা কীভাবে পরীক্ষা করা বা ভেঙে ফেলা যায় তা নিয়ে ছিল? এতে কি সিআইএ সহায়তা করেছে?"

যদিও ইউনাবম্বরের এত বছরের এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অপব্যবহারের মুখোমুখি হওয়া সাথে তার পরবর্তী আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তবে এমনটি সম্ভব যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করেছিল তা তার সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব পরিবর্তন করতে এবং সভ্য বিশ্বের বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলেছিল। চেস আরও লিখেছেন, "আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ক্যাজিনস্কি চূড়ান্ত একাকী নন যেমনটা তাকে তৈরি করা হয়েছিল। এমনকি তিনি কোনো ক্লিনিক্যাল সেন্সেই মানসিক রোগী নন। তিনি একজন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দোষী সাব্যস্ত হত্যাকারী এবং এই দুটি সত্যের মধ্যে সংযোগ বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই তার হার্ভার্ডে অবস্থানকালীন সময়ে ফিরে দেখা উচিত।"

মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, কারাবন্দি, গর্ভবতী, অনাথ এবং প্রতিবন্ধী সহ বহু লোকের উপর সরকার, সামরিক, ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলো এবং কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রচুর অধ্যয়ন ও পরীক্ষার পেছনে অবশ্যই কোনো এজেন্ডা আছে। তবে কেন আমরা কেউ সিআইএর হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছে বলে দাবি করলেও সন্দেহ করি? একজন চিকিৎসক যিনি প্রকাশ্যে এই পরীক্ষাগুলোর সত্যতা এবং সেগুলোতে তাঁর নিজের ভূমিকা স্বীকার করেছেন তিনি হলেন ড. জি. এইচ. এস্টাব্রুকস। তিনি তাঁর Spiritism এবং Hypnotism বইগুলোতে একাধিক ব্যক্তিত্ব (Multiple Personality) গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের পরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। এস্টাব্রুকস হিপনোসিস ব্যবহার কুরিয়ার এবং কাউন্টারইন্টেলিজেন্স এজেন্ট তৈরি করেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। পাশাপাশি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কীভাবে জটিল ব্যক্তিত্বতে বিভক্ত করা যায় তাও বর্ণনা করেছিলেন। এমনকি তিনি শিশুদের নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তৎকালীন এফবিআইয়ের পরিচালক জে. এডগার হুভারের সাথে কিশোর-কিশোরীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হিপনোসিসের বিভিন্ন ব্যবহারের বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন।

এস্টাব্রুকস যুদ্ধের চাহিদার কারণে সুপারস্পাই এবং সুপারঅ্যাসাসিনদের সৃষ্টি করাকে নৈতিক বলে অভিহিত করেছিলেন, তবে যারা এসব পরীক্ষায়

নিয়োজিত ছিলেন তারা মোটেই নৈতিকতার ধার ধারতেন না। এসব মুনাফিক স্বভাবের মানুষরাই সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় ছিল, তারা The Manchurian Candidates প্রজেক্টে কাজও করেছে।

যদি এই বিবেক নিয়ন্ত্রণ থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা সত্য বলে থাকেন, তবে পুরো MKUltra সময়কাল হলো মানবতার বিবর্তনের অন্যতম কালো অধ্যায়। এটি কি এখনও চলছে, অন্য নামে এবং ছদ্মবেশে? PSYOP, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, আজ যুদ্ধের একটি স্বীকৃত রূপ। বড় বড় ফার্মাগুলো দিন দিন যেসব নতুন নতুন ড্রাগস উৎপাদন করছে কাউকে না কাউকে তো সেগুলো ব্যবহার করে দেখতে হবে। সিআইএ নথি ১৭৩৯৫, পৃষ্ঠা ১৮ থেকে:

পরীক্ষণীয় মডেলগুলো ব্যবহৃত হবে। সেখানে সাবজেক্টকে তার সামগ্রিক পারফর্মেন্সের উপর ভিত্তি করে পুরস্কৃত করা হবে বা শাস্তি দেয়া হবে এবং বিভিন্ন উপায়ে উজ্জীবিত করা হবে। সে ঠিক করেছে কিনা তা বলা হবে, টার্গেটকে মানসিক চাপে ফেলে, ইলেকট্রিক শক প্রয়োগ করে ইত্যাদি। অন্যান্য ক্ষেত্রে ড্রাগস এবং মানসিক কারসাজি ব্যবহার করে তার আচরণ পরিবর্তন করা হবে। গবেষকরা বিশেষ করে ডিসোসিয়েটিভ অবস্থা, তথাকথিত মিডিয়ামের শিথিল মানসিক অবস্থা থেকে একাধিক ব্যক্তিত্বে পরিবর্তনেই বেশি আগ্রহী এবং হিপনোসিস ব্যবহার করে এই ধরনের অনেকগুলো অবস্থা তৈরী করার একটি প্রচেষ্টা চালান।

আপনার ট্যাক্সের ডলারকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রজেক্ট মোনার্ক: বাস্তবতা নাকি কল্পনা?

গবেষকদের মতে, আপনি যখন একজন শিশু বা কম বয়সী তরুণ-তরুণীকে ধর্ষণ, ইলেকট্রিক শক, বিভিন্ন সহিংস বিষয় দেখানোর মাধ্যমে নির্যাতন করবেন; সে এই শক নিতে পারবে না। ফলে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের তৈরী হবে। যা মাল্টিপল পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার নামে পরিচিত। তারা জটিল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে এ সকল ভিক্টিমদের পরীক্ষা করে।

ভিক্টিমকে তারা পতিতা, মাদক বহনকারীসহ অনেক কাজে ব্যবহার করে। তাদের কাছে ভিক্টিম হলো ফাইলের মতো যাকে তারা ট্রমা, সহিংসতা ইত্যাদির মাধ্যমে তৈরি করেছে। তারপর তাকে সক্রিয় করে তোলার জন্য তাদের কাছে নির্দিষ্ট কোড বা পাসওয়ার্ড আছে। এম কে আল্ট্রার অধীনে সিআইএর এ বিশাল প্রজেক্ট চলে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত। এ পুরো প্রজেক্টের নাম হল প্রজেক্ট মোনার্ক।

এর সাথে আরো ১৪৯টি সহপ্রজেক্ট আছে। এগুলো সম্পর্কে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য পাই না। কিন্তু এসব প্রজেক্ট থেকে যারা বেঁচে ফিরেছেন তাদের থেকে অনেক তথ্য উদ্ধার করা গেছে। আবার অনেক গোয়েন্দাও মাঝেমধ্যে তাদের থেকে তথ্য বের করে আনেন। মোনার্ক ঘুমন্ত কিছু এজেন্ট তৈরি করে নির্দিষ্ট কোড দেয়ার মাধ্যমে তারা সক্রিয় হয়। সাধারণত এই অপারেশনগুলোর কারণ তারা দেখতে চায় মানুষের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব আর তারা কীভাবে কীভাবে মানুষকে ব্যবহার করতে পারে।

আমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে এই প্রজেক্টকে কেবল ভয় দেখানো মনে হতে পারে। এর ফলে সংঘটিত রোগকে Marionette Syndrome বলা হয়। অনেক বিজ্ঞানী একে আবার Imperial Conditioning নামে আখ্যায়িত করেছেন।

মার্ক ফিলিপ এবং ও ব্রাইন একটি বই লিখেন–Trance Formation Of America। এখানে ও ব্রাইন লিখেছেন যে কীভাবে তার বাবা বছরের পর বছর তার সাথে অজাচার আর নির্যাতন করেছেন। মার্ক ফিলিপ ছিলেন সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা, কিন্তু কোনভাবে তিনি সেখানে ফেঁসে গিয়েছিলেন। ক্যাথি

পরবর্তীতে আরো কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন তাকে জোর করে পতিতাবৃত্তি করানো হয়েছিল। এছাড়াও তাকে মাদক পৌঁছে দেয়ার কাজে লাগানো হয়। সিআইএ অবৈধভাবে এগুলোর মাধ্যমে টাকা উপার্জন করে। সমস্যা হলো আমরা কোন সুনির্দিষ্ট সোর্স থেকে এই তথ্যগুলো যাচাই করতে পারি না।

সিজ স্প্রিংমেয়ার আর কিসগো উইলার নামের ব্যক্তিদ্বয় প্রজেক্ট মোনার্ক-এর ব্যাপারে তথ্য দিতে পারবেন বলে দাবি করেছেন। তারা দুজনে মিলে The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave নামের একটি বই লিখেছেন যেখানে একজন মানুষের বিবেক নিয়ন্ত্রণ করে কীভাবে দাস বানানো যায় তা বর্ণনা করেছেন। বইটি একটি এনসাইক্লোপিডিয়া ধরনের। সেখানে তারা ট্রমাকে ব্যবহার করে কীভাবে কাজ করা যায় তার পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন। স্প্রিংমিয়ার ভিক্টর স্কুপ মূলত মোনার্ক থেকে হুইলারকে (যিনি লিন্ডা এন্ডারসন নামেও পরিচিত) বাঁচানোর লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন। ফিলিপ আর ও ব্রাইনের মতো তারাও অনেক তথ্য বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ট্রেড গেন্ডারসন নামের একজন এফবিআই এজেন্ট প্রজেক্ট মোনার্কে শয়তানি বিভিন্ন আচারানুষ্ঠান পালনের বিরোধিতা করে এসেছেন। গেন্ডারসন সবসময় সাবেক আর্মির লেফটেন্যান্ট কর্ণেল, সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার এক্সপার্ট এবং টেম্পল অব সেটের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মাইকেল একিউনোর কাজকর্মের বিরোধিতা করে এসেছেন। কেন? কারণ তিনি চার্চ অব স্যাটান বা শয়তানের চার্চের সাথে যুক্ত ছিলেন। একিউনো বলে এসেছেন যে তাদের এখানে বাচ্চাদের কিডন্যাপ করা, নির্যাতন করা কিংবা উৎসর্গ করার মতো কোন শয়তানি আচারানুষ্ঠান পালন করা হয় না; এর কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। সত্যিকার অর্থে বেশিরভাগ ভিক্টিমই ভীত থাকেন এবং ব্যক্তিত্বের সংকটে ভোগেন। তাই আমরা এই তথ্যগুলোর ব্যাপারে সবসময় নিশ্চিত হতে পারি না। কিন্তু তাই বলে কি ভিক্টিমরা কি ভিক্টিম নন?

১৯৯২ সালে False Memory Foundation সংগঠনটি জন্মলাভ করে। তারা সিআইএর কর্মকাণ্ডের কঠিন বিরোধিতা করেন এবং বাচ্চাদের বাঁচানোর জন্য জোর আওয়াজ তোলেন। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য প্রচারের অভিযোগ আনা হয়। MKUltra-র ডক্টর জলি ওয়েস্ট, শিশুকাম নিয়ে কাজ করা

ডাক্তার রলফ আন্ডারওয়েগার সহ যে কমিটি ছিল তা পরবর্তীতে আরো অনুসন্ধান করে। তারা অনেককিছুই অস্বীকার করেছেন।

হারলান গ্রানার্ড ১৯৯০ সালে অনেক তথ্য বের করে আনলেও যৌক্তিক কোন প্রমাণ দেখাতে পারেননি। অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও লেখক এইচ পি আরবেরালিও MKUltra-র ব্যাপারে সন্দেহাতীত কোন তথ্য বের করে আনতে পারেননি। তাই এই মুহূর্তে MKUltra প্রজেক্ট থেকে যারা বেঁচে ফিরে এসেছেন তাদের উপর আস্থা রাখা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। তবে তাদের কেউ কেউ এসকল নির্যাতন ও কাজ-কর্মের উপর বেশ ভালো লিখেছেন। ইউনিভার্সিটি অফ ইউথাহের মনোবিজ্ঞানী ডক্টর কোরাইডন হামমোন্ড তার বিখ্যাত লেকচার Hypnosis in MPD: Ritual Abuse এ যেসকল লোকেরা বেঁচে ফিরেছে তাদের কথাবার্তাকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, বেশিরভাগ ভিক্টিমরাই এখন সরকারের হয়ে কাজ করছে। এসকল কাজের সাথে সিআইএ এবং নাজিদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং তারা ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন শয়তানি কার্যক্রমের আশ্রয় নিয়েছে। যদিও তিনি প্রজেক্ট মোনার্ক কথাটি বাদ দিয়েছেন, কিন্তু তিনি এখনও বিশ্বাস করেন যে এই ধরনের কোন প্রজেক্ট ছিল।

১৯৯৫ সালের ১৫ই মার্চ ওয়াশিংটন ডিসিতে President's Committee on Human Radiation এক্সপেরিমেন্টে তিনি এ কাজ করেন। জার্মান ডাক্তাররা তাদের কীভাবে নির্যাতন করেছে, মাদকাসক্ত করেছে, ইলেক্ট্রিক শক এবং হিপনোসিস করেছে এই বিষয়গুলো তিনি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। রেডিওর প্রবল প্রভাবে তাদের যে ক্ষতি হয়েছে তাও ফুটিয়ে তোলেন। আচারগত নির্যাতন ও ট্রমা ভিত্তিক বিবেক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি তাঁর প্রবন্ধে তুলে আনেন।

ড. এলেন পি লেকটার সান ডিয়াগোর একজন বিখ্যাত ডাক্তার ও বিবেক নিয়ন্ত্রণ এক্সপার্ট। তিনি আচারানুষ্ঠানের নির্যাতন ও ট্রমার সমন্বয় দেখিয়েছেন। ড. কলিন এ রস নামের আরেক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী তার BLUEBIRD: Deliberate Creation of Multiple Personality বইয়ে এসকল বিষয়গুলো পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এসকল কাজে কীভাবে মানুষকে পরিবর্তন করা হয়, নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়, হিপনোসিস ও বিভিন্ন নির্যাতন ব্যবহার করা হয় সে কর্মকান্ডসমূহ বইটিতে তুলে এনেছেন।

ক্যাথলিন সুলেবান হচ্ছেন আরেকজন MKUltra ভিক্টিম যিনি Unshackled: A Survivor's Story of Mind Control বই লিখেছেন। এটি ছিল অপরাধ জগতের অংশ হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতার বর্ণনা যা তিনি পেয়েছিলেন মিলিটারি এবং সিআইএ সাথে চুক্তিবদ্ধ ডাক্তার, ইন্টেলিজেন্সের সদস্য, স্বাস্থ্যকর্মী, কাল্ট নেতা ও সদস্য, শিশুকামি, পর্নোগ্রাফির পরিচালক, মাদক ব্যবসায়ী এবং নাজিদের ব্যবহার থেকে। তারা Monarch Butterfly নামের একটি প্রজেক্টের আওতায় ছিলেন।

ক্যারল রুজ নামের আরেকজন ভিক্টিম Nation Betrayed: Secret Cold War Experiments Performed on Our Children and Other Innocent People নামের একটি বই লিখেছেন। মজার বিষয় হলো, তিনি আসলেই বিশেষ কিছু তথ্য তুলে এনেছেন যেগুলো অন্য বইগুলোতে ছিল না। তিনি ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট নিয়ে কথা বলেছেন। চার বছর বয়স থেকে তাঁকে কেমন নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তাও বর্ণনা করেছেন। প্রজেক্ট মোনার্ক নিয়ে ১৯৯০ এর দশকে বিভিন্ন কল্পনা, ভুল তথ্য জড়িত ছিল। কারণ সঠিক তথ্য উদঘাটন করা যাচ্ছিল না। কিন্তু সিআইএ যে এমনভাবে অনেককে নির্যাতন করেছে সেটি অস্বীকার করার কোন সুযোগ ছিল না।

রন প্যাটন একজন ষড়যন্ত্র-তাত্ত্বিক, লেখক এবং Tesla Wolf Media এর প্রযোজক। তিনি Paranoia: The Conspiracy Store in San Diego, California এর ও মালিক। তিনি অনেক টকশো, পডকাস্টে প্রায়ই আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে কথা বলেন। পরবর্তীতে তিনি MKzine তৈরি করেন যেখানে তিনি অনেক ধরনের নির্যাতন ও ভিক্টিমদের বর্ণনা নিয়ে এসেছেন।

যদিও MKUltra মানুষের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে এবং সিনেট ১৯৭০ এর দশকে এর ইতি টেনেছে, তবু আজও তারা নতুন নতুন নামে একই কাজগুলো করে যাচ্ছে। কীভাবে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা এই কাজগুলো করে যাচ্ছে এবং মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করছে তা সামনে আরো আলোচনা করব। আজকে কাউকে হয়তো ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না কিন্তু এমন ভাবে মানসিকতা বদলে দেয়া হচ্ছে যার ফলে আমরা অভাবনীয় অনেক কাজ করে ফেলছি।

সামনের অধ্যায়ে আমরা সাধারণ কিছু পদ্ধতি নিয়ে কথা বলব যে পদ্ধতিগুলোর কথা আমরা কখনো ভাবিনি।

নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি ও কৌশলসমূহ

বাস্তবতা নিয়ন্ত্রণের মূল নিয়ামক হলো শব্দের প্রভাব। শব্দের অর্থ ঠিক করে দিতে পারলে আপনি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন সে শব্দগুলো দিয়েই।

- ফিলিপ কে ডিক।

আপনি আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ না করলে অন্য কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

- জন এলস্টোন।

আমি জানি না কী ঘটেছিল। আমি সেখানে ছিলাম। তারা বললো আমি নাকি কেনেডিকে খুন করেছি। আমার মনে নেই আমি কী করেছি। তবে আমি নিজের মধ্যে ছিলাম না সে সময়।

- সিরহান সিরহান।

মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে খুব সহজলভ্য একটি প্রযুক্তি আছে। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের লক্ষ্যে এ কাজ করা হয়। মন নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সুক্ষ্ম, নিখুঁত হতে পারে। কিন্তু গোপন প্রক্রিয়াগুলো আরো সহজ এবং বাস্তব।

মনোবিজ্ঞানী ও In Sheep's Clothing: Understanding & Dealing with Manipulative People এর লেখক জর্জ কে সিমন বলেন, এ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে চারটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

- নিজের আগ্রাসী চিন্তা গোপন রাখতে হবে।
- ব্যক্তির মানসিকতা উপলব্ধি করতে হবে ও সে অনুযায়ী নিয়ম সাজাতে হবে।
- ব্যক্তির ক্ষতির দিকে নজর দেওয়া যাবে না।
- সম্পর্ক ও সাধারণ বিষয় দেখিয়ে গোপন আগ্রাসী প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে।

পুরো প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির মানসিক দূর্বলতার জায়গাগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই এসবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন ও এসবের পূর্ণ সুবিধা নেন।

Reinceforcement

Reinceforcement বা শক্তিবৃদ্ধি হলো একইসাথে নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া ও অস্ত্র।

ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধি মানে হলো প্রশংসা, তোষামদ, শ্রদ্ধা, আকর্ষণ, উপহার, ভালোবাসা, যৌনতা, আবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির মনে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগ্রত করা। বিষয়টি সাইকোপ্যাথ বা আত্মপ্রশংসায় ডুবে থাকা মানুষরা ব্যবহার করে। একে Love Bombing ও বলা হয়। এভাবে ব্যক্তিকে এমন এক মানে উন্নীত করা হয় যেন সে ভালোবাসার দাবি বা এ কারণে জঘন্য ও বর্বর কাজগুলো করে। বিষয়টি এক প্রকার শাস্তি। তবে ঘোড়া ও কুকুরের জন্যও এ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। বিষয়টি অনেক সময় উপকারও করে; যেমন স্কুলে ছোট বাচ্চাদের কিংবা অ্যাথলেটদের ক্ষেত্রে। এভাবে সাহসিকতা ও আত্মনির্ভরশীলতা তৈরি হয়। বিপরীত বিষয়টিও প্রায় একই, তবে তা খারাপ কাজে ব্যয়িত হয়।

ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধির এ প্রক্রিয়া ধর্মীয় সংগঠনগুলোতে বেশি দেখা যায়। সাধারণত ধর্মনেতা ও তাদের শিষ্যদের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে এ প্রক্রিয়া কাজে লাগানো হয় (বিস্তারিত অধ্যায় ৭ এ)। এসবের মাধ্যমে মানুষকে এসব সংস্থায়ও আহ্বান করা হয়। বলা হয় তারা ঈশ্বরের চোখে বিশেষ কিছু। তাদেরকে এভাবে উৎসাহিত করা হয় ও নেতিবাচক ইচ্ছা প্রদর্শন বা কাজের কোনো সুযোগ রাখা হয় না। এসবের ফলে যে ধরনের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও নির্ভরশীলতা তৈরি হয়, উদ্দেশ্য খারাপ হলে এগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তির ক্ষতিও করা যায় বা তাকে যেকোনো জঘন্য কাজে নিয়োজিত করা যায়।

নেতিবাচক শক্তিবৃদ্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যক্তির চিন্তা ও আদর্শে পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য নির্যাতন, সমালোচনাসহ অনেক গোপন বিষয়ও প্রয়োগ করা হয়। মানুষকে জনসম্মুখে লজ্জিত করা, সমালোচনা, নিন্দাসহ শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত করা হয়। কুকুরের ক্ষেত্রে আমরা এসব করি। কুকুরকে তার পায়ে নাক ঘষানো কিংবা চড় মারা ইত্যাদি। অনেকে ভাবে যে এসব ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধির চেয়ে ভালো কাজ করে!

যাই হোক, যুগে যুগেই মানুষের ক্ষতি বা নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব জঘন্য কাজ হয়ে এসেছে। নেতিবাচক এ প্রক্রিয়া খুব জঘন্য পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। সামনে আরো পরিষ্কার হবে।

সমস্যা হলো, নির্দিষ্ট কোনো শক্তিবৃদ্ধি ব্যবহার করা হয় না। বরং এ দুটোর সম্মিলিত রূপ নিয়েই কাজ করা হয়। Intermittent Reinforcement বা

নিয়মিত ভয়াবহ এ প্রক্রিয়ার ফলে কোনোভাবেই এ প্রক্রিয়া থেকে বের হওয়া সম্ভব না। এখানে কেউই নির্যাতনকারী থেকে বেঁচে ফিরতে পারে না। কেননা এ প্রক্রিয়া মানুষের সন্দেহ, আশা, হতাশা, ভয়, ভালোবাসা অর্থাৎ মানুষের গভীর থেকে গভীরতম আবেগ নিয়ে কাজ করে। এগুলোকে তারা পরিবর্তন করে ট্রমার পর্যায়ে নিয়ে যায়। এসব অনেক সময় আত্মহত্যার কারণ হয়।

প্রথমে ইতিবাচক বিষয়াশয়ই ব্যবহার করে। আপনাকে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আপনার আবেগকে তাদের অনুগামী করা হয়। তারপরই আসে Intermittent পর্যায়। তারা আপনার মধ্যে দুশ্চিন্তা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। সে অনেকভাবে ইতিবাচক দিকগুলোর সন্ধান পেতে চায়, রীতিমতো পাগল হয়ে যায় সেসবের জন্য। এমনকি সেগুলো পাওয়ার জন্য সে নেতিবাচক শক্তিবৃদ্ধিগুলোও গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এ পর্যায়ে ব্যক্তিকে অল্প থেকে ভয়াবহ নির্যাতনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এক পর্যায়ে ব্যক্তি শতভাগ নির্যাতনকারীর আচরণকে গ্রহণ করে নেয়। এভাবে পরিপূর্ণভাবে আবেগ ও চিন্তার উপর কর্তৃত্ব অর্জন হয়।

Intermittent পর্যায়ে ব্যক্তি সেসব ইতিবাচক আচরণ পাওয়ার জন্য যে কোনো কিছু করতে রাজি থাকে। সাইকোলজিতে একে Traumatic Bonding বলা হয়।

এসব গোপন প্রক্রিয়ায় কিছু শব্দ ও বাক্যের আড়ালে হারিয়ে যায় ব্যক্তি। এখানে ক্ষতিগুলো হয় অবচেতন পর্যায়ে। অনেকেই দাবি করেন, নির্যাতিত হওয়ার কিংবা আবেগের পর্যায়ে উঠে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা কেউই বুঝতে পারেননি যে তাদেরকে নিয়ে এভাবে খেলা হচ্ছে। বিষয়টি কেবল আচরণ বদলে দেয় না। বরং চিন্তা, আবেগ, বাস্তবতা পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়।

আপনার মনে হতে পারে যে কেবল দূর্বল মানুষরাই এসবের শিকার হয়। ভুল! যেকোনো মেধাবী মানুষ, উদার চিন্তার বা নরম অন্তরের মানুষ এসবের শিকার হয়। সেজন্যই অহরহ বাচ্চারা এসব এক্সপেরিমেন্ট ও আচরণের শিকার হয়। অনেক বেশি মেধাবীরাও কাল্টে যোগ দেয়। অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং অনেক সময় সাইকোলজিস্ট বা নার্সিসিস্টরা এমন মানুষই খোঁজে।

Coercive Persuasion

এ পদ্ধতিও একইভাবেই কাজ করে, একই উদ্দেশ্যে কাজ করে। ইউনিফিকেশন চার্চের লাইসেন্সড কাউন্সিলর ও সাবেক সদস্য স্টিভেন আলান হাসান এখন

Freedom of Mind Center পরিচালনা করেন। সেখানে তিনি মন নিয়ন্ত্রণের শিকার ব্যক্তিদের ব্যাপারে রিসার্চ করেন ও তাদেরকে এসব থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেন। ২০০৭ সালে হাসান লেখক লিয়ান লিডম, এমডির সাথে একটি সাক্ষাৎকারে ব্রেইনওয়াশিং, মন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'মনের নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তিকে সরিয়ে ফেলাই ব্রেইনওয়াশিং এর প্রধানতম হাতিয়ার"। চারটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এগুলো হলো BITE। অর্থাৎ Behaviour বা আচরণ, Information বা তথ্য, Thought বা চিন্তা, Emotions বা আবেগ।

আচরণগত বিষয়টি হতে পারে ঘুমানো, খাওয়া, তাকানো ইত্যাদির মতো দৈনন্দিন বিষয়গুলো। বিষয়টি মূলত নির্যাতনকারীর উপর নির্ভরশীলতা থেকে সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা আর থাকে না।

তথ্যগুলো মূলত ব্যক্তির চিন্তা ও মনোজগতে সৃষ্ট বাস্তবতা পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিকে শিখিয়ে দেওয়া হয় কীভাবে চিন্তা করতে হবে, ব্যক্তি সেভাবেই চিন্তা করে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একই বিষয়ের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সে ভিন্ন রকম আবেগ প্রদর্শন করে। ভয়, লজ্জা, দোষারোপ ইত্যাদি বিষয়গুলো মানুষের অন্তর পরিবর্তন করে দেয়। অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। অনেক সময়ই মানুষ এমন দোষও স্বীকার করে নেয় যা সে আদৌ করেনি। খাদ্য, পানি, ঘুম থেকে বঞ্চিত করা, তথ্য সংগ্রহ, অধিক আলোতে অবস্থান, শারীরিক নির্যাতন ও বিভিন্ন মানসিক প্রভাব সবচেয়ে কঠোর মানুষটিকেও পরিবর্তন করে দেয়।

যখন ব্রেইনওয়াশিং এর ব্যাপার আসে তখন বিষয়গুলো খুব ধীর ও গাঠনিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধর্মীয় চার্চের বিরোধী সাইকোলজিস্ট ডা. মার্গারেট সিঙ্গার তার জীবনভর কাল্ট, মন নিয়ন্ত্রণ ও ব্রেইনওয়াশিং নিয়ে কাজ করেছেন। FACTNet-এ Coercive Mind Control Tactics শিরোনামে তিনি লিখেন, "Coercive psychological system-গুলো আসলে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগানো হয়। এ পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তি যেকোনো আদর্শকে কীভাবে দেখবে তার একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।" ব্যক্তি বা সামাজিক—যেকোনো ক্ষেত্রে বিবেক নিয়ন্ত্রণের কিছু প্রক্রিয়া সিঙ্গার লিস্ট করেছেন,

- **মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারানো:** অডিও, ভিডিও, কথার ইঙ্গিতের মাধ্যমে মানসিক সক্ষমতা নাড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকি হিপনোসিস, ঘুমে সমস্যা, খাদ্য ও পানি থেকে বঞ্চিতও করা হয়।
- **সামাজিক পরিবেশ ও ব্যক্তিদের উপর নিয়ন্ত্রণ:** একাকিত্ব, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নির্যাতনকারীর উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি।
- **তথ্য বাঁধাগ্রস্ত করা:** এজেন্ডা বা উদ্দেশ্যের বাইরে যেকোনো তথ্যকে চিন্তার বাইরে রাখা।
- **ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে জোর করে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা:** ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবতা, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা।
- **আত্মবিশ্বাসে ফাটল সৃষ্টি:** বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নির্ভরশীলতা তৈরি এবং ব্যক্তির বিবেক ও আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করা।
- **ক্রমাগত মিথ্যা আবেগ সৃষ্টি:** শারীরিক নির্যাতনের বাইরে গিয়ে লজ্জা, দোষারোপ ও একাকীত্বের ফলে আবেগ সৃষ্টি করা ও ভুল প্রেক্ষাপটে ভুল আবেগ সৃষ্টির বিষয়টি অভ্যাস করা।
- **ভয় দেখানো:** ব্যক্তি যদি নির্যাতনকারীর কথামতো আচরণ, চিন্তা ও কাজ নিয়ন্ত্রণ না করে তবে কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো।

যত কঠোরভাবে এসব প্রয়োগ করা হয়, ব্যক্তি তত নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে। ব্যক্তি খুবই হতাশা, ভয় এমনকি PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) এ আক্রান্ত থাকে। তারা প্রক্রিয়া থেকে, নির্যাতনকারীর হাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরও এ হতাশা, এ ট্রমা থেকে বের হতে পারে না। তাদের অনিদ্রা, শারীরিক অসুস্থতা, আবেগের অর্থহীনতা, মনোযোগের অক্ষমতা ইত্যাদি কেবল বাড়তেই থাকে। অনেক সময় পর হয়তো এসব সমস্যা থাকে না। তবে এসব প্রক্রিয়া চলতে থাকলে ব্যক্তি একসময় পাগল হয়ে যায়, এমনকি আত্মহত্যাও করে।

রেটরিক ও মতবাদ

মানুষের বিশ্বাস ও ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এ দুটো হয়ে ওঠে মোক্ষম অস্ত্র। ভয়াবহ ধর্মীয় উগ্রতারও জন্ম দেয় এসব। ধর্মীয় নেতাদের রেটরিক ও মতবাদ হলো যমজ দুই ভাইয়ের মতো। তারা তাদের অনুচরদের পুরো ব্যক্তিত্ব ও পরিচয় পরিবর্তন করে তাদেরকে নিজেদের আজ্ঞাবহ রাখতে এ অস্ত্র ব্যবহার করে।

যুক্তি ও তথ্যকে নিজেদের বিশ্বাস ও চিন্তা অনুসারে সাজিয়ে, পরিবর্তন ও সংযোজন করে সৃষ্টিকেই রেটরিক বলে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা একে যোগাযোগের একটি ধারা হিসেবে চিহ্নিত করতেন। তারা মানুষের বিবেক পরিবর্তনে রেটরিকের তিনটি আবেদনের কথা বলেছেন—

- **Logos:** চিন্তা, কল্পনা ও যুক্তির ব্যবহার।
- **Pathos:** শ্রোতাকে আবেগী করে দেওয়া।
- **Ethos:** বিশ্বস্ততা, কর্তব্যপরায়ণতা ও পারদর্শিতার এক চিত্র হাজির করা।

যুক্তি, আবেগ, বিশ্বাস ও যাদুকরি পারদর্শিতা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তারা উদার, এখানে দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ আছে। অথচ এদের অবস্থা ঠিক তার উল্টো। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সংগঠনের নেতারা রেটরিককে তাদের মতবাদ প্রচারে ও তাদের অনুচর বানিয়ে রাখতে ব্যবহার করে। তারা তাদের মতবাদ অনুসারে নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস ব্যক্তির মনে প্রবেশ করায়। মতবাদ হলো যেকোনো বিশ্বাস বা আদর্শের মূলভিত্তি। আর পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত অনুসারে অনুচররা একটা সীমার মধ্যে থাকে, থাকতে হয়। মতবাদ আসলে তাদের সবচেয়ে সেরা অস্ত্র না, তবে বিবেক নিয়ন্ত্রণের খুব ভালো অস্ত্র। তাদের নিজেদের ক্ষতি সত্ত্বেও মতবাদ ও রেটরিক ব্যবহার করে আপনি তাদেরকে আপনার পক্ষে কাজ করাতে পারবেন।

রেটরিক মূলত মতবাদ গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা হয়। আপনাকে নির্যাতন করতে হবে না, সে এমনিই আপনার পক্ষে চলে আসবে। এডলফ হিটলার একই সাথে ছিলেন শব্দের যাদুকর ও ভয়াবহ অত্যাচারী। সে এভাবেই তার পক্ষে লোক যোগাড় করেছে, ভিন্নমত দমন করেছে ও লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে।

Capture Bonding/Stockholm Syndrome

কম নির্মমতা, বেশি লাভ কিংবা মানুষের চিন্তার ধারাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য তারা আরেকটা কাজ করে। বিষয়টাকে অনেকটা নির্যাতিত স্ত্রীদের সাথে তুলনা করা যায়। তারা একইসাথে স্বামীর সাথে প্রেম করে ও অনুগত থাকে। অনেকসময় এ নির্যাতন ভয়াবহ রূপ নেয়। কিন্তু নির্যাতিত ব্যক্তি এর জন্য নিজেকে দোষারোপ করে ও ভালো সময়গুলোর জন্য অত্যাচারী লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। একে একইসাথে Capture Bonding বা Stockholm Syndrome বলে।

যুদ্ধবন্দি ও জিম্মিদের অনেকসময় তাদেরকে যারা বন্দি করেছে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য জন্ম নেয়। দীর্ঘদিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পর যখন একটু শান্তি পায়, তখন তাদের অত্যাচারী লোকদের প্রতি আবেগ জন্ম নেয়। তখন সে নির্যাতিত লোক মনে করতে থাকে যে অত্যাচারী দয়ালু। অনেকসময় তাকে রক্ষকও ভাবে। অবশ্য আত্মমর্যাদাও এখানে একটা ভালো ফ্যাক্টর। অনেকদিন নির্যাতনের পর একটি রক্ষণাত্মক জায়গা থেকেও এ অনুভূতি জন্ম নিতে পারে। জিনগতভাবেও এটা আসতে পারে। হয়তো কেউ তাদের পূর্ব পুরুষদের জয় করেছিল, আটক করেছিল। তাদের পরিবার ও নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা বিদ্রোহ করত না। তারা আক্রমণকারীদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে বসতো ও কিছু বেশিদিন হয়তো তাদের আয়ু বৃদ্ধি পেত।

বিষয়টি মাঝেমধ্যে খুব জঘন্য রূপ নেয়। নির্যাতিত লোকরা অত্যাচারীদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে একমত হয়ে বসে।

Stockholm Syndrome নামটি এসেছে সুইডেনের স্টকহোম শহর থেকে। ১৯৭৩ সালে স্টকহোমের নরম্যামস্ট্রম্ব এলাকায় ব্যাংক ডাকাতি হয়। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ৬ দিন জিম্মি রাখা হয়। পুলিশ সেসব ডাকাতদের সাথে আলোচনায় বসে। সমস্যা হলো, সে ব্যাংক কর্মকর্তারা একসময় ডাকাতদের পছন্দ করা শুরু করে। মুক্ত হওয়ার পর তারা সরকারের বিরুদ্ধে ডাকাতদের অবস্থান ও আদর্শের পক্ষে কথা বলতে শুরু করে।

বিপরীতটাও হয়। আক্রমণকারী আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আবেগী হয়ে পড়ে। একে বলা হয় Lima Syndrome। পেরুর লিমায় ১৯৯৬ সালে একটি সন্ত্রাসী

গ্রুপ জাপানিজ রাষ্ট্রদূতের একটি পার্টিতে অনেক মানুষকে জিম্মি করে। পরবর্তীতে সহানুভূতিশীল হয়ে তারা অধিকাংশ জিম্মিকেই মুক্ত করে দেয়।

আমাদের অনেকেরই মনে হতে পারে, আমরা তো কখনো এসব পরিস্থিতির শিকার হইনি। আমাদের নির্ভরশীলতা, আত্মপ্রশংসা ও সাইকোপ্যাথদের অভিজ্ঞতা দেখলেই বোঝা যায় এসব আমাদের মাঝে প্রায়ই হয়। বিবেক নিয়ন্ত্রণ আমাদের বিবেকের স্বাভাবিক কার্যক্রমের সাথেই সম্পৃক্ত।

How Full is Your Bucket? বইটির লেখক টম র‍্যাথ ও ডোনাল্ড ও. ক্লিফটন, পিএইচডি কোরিয়ান যুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দিদের চিকিৎসা নিয়ে কাজ করছিলেন। তারা আমেরিকান আর্মির প্রধান মানসিক ডাক্তার মেজর উইলিয়াম ই মেয়ারের কাজ অনুসরণ করছিলেন। মেয়ার কোরিয়ার কাছে বন্দি থাকা ১০০০ যুদ্ধবন্দির মানসিকতা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি ভয়াবহ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দেখেন যে বন্দিদেরকে খুব একটা শারীরিক নির্যাতন করা হয় নি, তাদেরকে খাবার, পোষাক ও আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য অস্ত্রধারী গার্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

তাহলে কেন যুদ্ধবন্দিদের আত্মহত্যার হার ৩৮% ছিল? তাদের বেশিরভাগই কেন হাল ছেড়ে দিল? দেখা গেল, তুমুল মানসিক নির্যাতনের পর তারা একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছে। যাদেরকে পরে মুক্ত করা হয়েছে তাদেরও একই অবস্থা। উত্তর কোরিয়ার লক্ষ্য ছিল, "মানুষ পারস্পরিক যোগাযোগ ও আচরণের কারণে যে মানসিক শক্তি পায় তা নস্যাৎ করে দাও।" তাদেরকে পৃথক করে রেখে, সমালোচনা ও প্রচুর নেতিবাচকতা (Negativity) দিয়ে, তাদের আত্মীয়দের চিঠি তাদের কাছ থেকে আড়াল করে তারা বন্দিদের ভেতর থেকে ধ্বসিয়ে দিত। মেয়ারের মতে, "তারা জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে যায়। রাষ্ট্র ও স্রষ্টা তো বটেই, নিজেদের ও ভালোবাসার মানুষদের প্রতিও তাদের আস্থা চলে যায়। উত্তর কোরিয়া এমন এক অবস্থায় আমেরিকান সৈন্যদের রেখেছে যা আমরা কখনো ভাবিনি।"

এ ধরনের বিষয়গুলো খুবই ভয়ংকর। আমরা অনেকেই এর মধ্য দিয়ে গিয়েছি। আমরা হতাশ, ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে বুঝতেই পারি না কোন বিষয়টি আমাদের কুঁড়ে কুঁড়ে নিঃশেষ করে ফেলছে। মজার ব্যাপার হলো, আমরা

যদি প্রভাবকগুলো সম্পর্কে জানি, তাহলে আমরা আমাদের মন, আত্মা ও দেহের উপর এর প্রভাব নিশ্চিহ্ন করতে অনেক কিছুই করতে পারি!

ক্রমাগত সাংস্কৃতিক দুর্ব্যবহার, Programming Cues এবং উৎসেচক

নির্যাতন হলো বিবেক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রক্রিয়া। সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন কার্যক্রম দ্বারা এ নির্যাতন করা হয়। শিশুদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণ, নরবলি ইত্যাদির মতো স্যাটানিক কাজ দিয়েও বিবেক নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হয়। এসব কিছু ছোটকাল থেকেই শুরু করা হয়। সবসময় সরকারের নির্দেশনা মতো এসব নাও হতে পারে। অনেকে বলেছেন এসব সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে বংশীয়ভাবে চলে এসেছে। বংশের মাঝেই গোপন সংগঠনগুলো এসবের বীজ বুনে রেখেছে। আবার অনেকে সামরিক ও সরকারি বড় কর্মকর্তাকে এসবের জন্য দায়ী করেছেন।

এসব প্রক্রিয়া নেতা, যোদ্ধা বা খুনি তৈরি করতে কাজে লাগানো হয়। অনেক সময় এসব কেবলই সংস্কৃতি হিসেবেই কাজ করে, কোনো আলাদা উদ্দেশ্য ছাড়াই। বিশ্বের অনেক সভ্য দেশেই অনেক বলির পাঁঠা দাবি করেছেন যে তাদের সরকারগুলোর এমন গোপন বিবেক নিয়ন্ত্রণের এজেন্ডা ও কার্যক্রম আছে। বেশিরভাগই ছিল ১৮ বছরের নিচে। অর্থাৎ তাদের কারো সম্মতি ছিল না। তাদের অনেকের বাবা মা তো জেনে বা না জেনে নির্যাতনকারী বা নির্যাতনকারীর সহযোগীর ভূমিকায় ছিলেন। যারা বেঁচে ফিরেছেন তারা অনেক সংগঠনের সুন্দর মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক মৃত্যুঞ্জয়ীরা বলেছেন, তাদেরকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালে সহিংসতা, দুর্ব্যবহার ও আতঙ্কবিরোধী ১৩তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ২০০৭ সালে ড. ক্যারিকার কর্তৃক প্রকাশিত Extreme Abuse Surveys (EAS) রিপোর্টের ব্যাপারে আলোচনা হয়। সেখানে বলা হয়–

- ২৫৭ জন দাবি করেছেন শৈশবে তাদের উপর বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়।
- ৬৯% বা ১৭৭ জন দাবি করেছেন কার্যক্রমগুলো স্যাটানিক ছিল।
- ৯৩% অভিজ্ঞ ব্যক্তি যারা কিনা অন্তত একজন মৃত্যুঞ্জয়ীর সাথে কাজ করেছেন তাদের মতে, কাউকে এ নির্যাতনের ব্যাপারে জানালে হত্যা করা হবে–এমন হুমকি দেওয়া হয়েছে।

- ২১৮ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে ৬৭% অন্তত একজনের কথা বলেছেন যাদেরকে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া হয়েছে।
- ৫০% প্রাপ্তবয়স্ক মৃত্যুঞ্জয়ী ইলেক্ট্রিক নির্যাতনের কথা বলেছেন।

এসব পরিসংখ্যানের বাইরেও স্মৃতি পরিবর্তনের কিছু ধারা আছে। সেগুলো হলো:

- নির্যাতনে রক্ত ব্যবহার
- ক্ষুধা
- মস্তিষ্ক উত্তেজিত করা
- পতিতাবৃত্তি
- মাদকাসক্ত করা
- অনুভূতি বিকৃত করা
- পশুহত্যার দৃশ্য দেখানো
- খাঁচায় বন্দি করে রাখা
- অন্য ব্যক্তিকে নির্যাতন করতে বাধ্য করা
- দাসত্ব
- সেলাই
- বিভিন্ন যৌন নির্যাতন
- মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার
- রেডিয়েশনের ব্যবহার
- UFO
- অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে দেওয়া
- পর্ণোগ্রাফি
- প্রচণ্ড ব্যথা উদ্রেককারী ড্রপ
- অজাচার

দুঃখজনকভাবে এটা খুব ছোট একটা চিত্র। এসব নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে খুব সাধারণ একটি সমস্যা হলো DID বা Dissociative Identity Disorder। এর ফলে মানুষের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ একটি স্বাভাবিক ও একটি আতঙ্কগ্রস্থ ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। ট্রমা ও ভীতি থেকে ব্যক্তিত্ব রক্ষার জন্য আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। হত্যা, অপরাধ, গুপ্তহত্যার জন্য এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। এটি বাদে হয়তো পৃথিবীতে বেশিরভাগ অপরাধেরই অস্তিত্ব

থাকতো না। একই মানুষের মধ্যে দুটো ব্যক্তিত্বই থাকতে পারে। আমাদের সত্যিকার ব্যক্তিত্বকে বলা হয় Front Personality। বেশিরভাগ DID তেই ব্যক্তি জানেই না যে তার মধ্যে অন্য কোনো সত্ত্বা কাজ করছে। আপনাদের Sibly মুভিটার কথা মনে আছে নিশ্চয়? সেখানে শার্লি সিবিল মেসন তার সাইকোলজিস্ট ড. কর্নেলিয়া উইলবারের (জোয়ানা উডওয়ার্ড ছিলেন এ চরিত্রে) সাথে কাজ করেন। তার মধ্যে ১৬টি আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। সবগুলোরই মূল কারণ ট্রমা। মেসন এ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতেন কিনা তাকে আলোচনার বাইরে রাখলেও রোগটা সত্য। মূলত আচারানুষ্ঠানের নির্যাতন এসবের জন্ম দেয়।

Hell Minus One এ জনসন ডেভিড ছোটবেলায় তার বাবা-মা কর্তৃক শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা তার শয়তানের পূজারি ছিল। উথা এটর্নি জেনারেল অফিসে তার বাবা-মা এসব নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছেন। ২৫০,০০০ ডলার খরচের পর ও তিন বছর অনুসন্ধানের পর আমরা এসব জানতে পারি। তারা সেসময়ই স্বীকার করেননি। এনির ৩ বছর বয়স থেকেই এসব নির্যাতন শুরু হয়। ১৭ বছর বয়সে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তাকে নির্যাতন করা হয়েছে, উৎসর্গ করা হয়েছে। তার গায়ে রক্তের ছিটা দিয়ে তার নিজের সন্তানদের নির্যাতন করতে বলা হয়েছে। ৩০ বছর বয়সের আগে সে এসব গোপন রেখেছিল। এ স্মৃতিগুলো বারবার তার কাছে ফিরে আসে। সে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু এটিই একমাত্র গল্প নয়। এমন অনেকেই তাদের গল্প নিয়ে এসেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, Childhood Ritual Abuse and Drawn Swords বইয়ের লেখক জিন এডামস। ২০০৪ সালের শীতে MKzine এ এডামস "I Am Many: Profiling the Ritual Abuse Survivor," শিরোনামে লিখেন, "আমরা একে অপরকে খুঁজে বের করছি ও পরস্পরকে সাহায্য করছি।" তারা ভিক্টিমদের বের করে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করছেন। এর সাথে তারা সাধারণ মানুষকেও এসবের ভয়াবহ দিক সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন।

এডামস তার রিসার্চে এসব নির্যাতনের কারণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে আনতে চেষ্টা করেছেন। তার মতে, নির্যাতন মূলত শৈশবকালে শুরু হয় ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। যারা এসব ট্রমাতে ভোগেন তাদের বেশিরভাগেরই বয়স

৩০-৪০ এর মধ্যে। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকা বয়স হলো ৪০-৫০। অনেক ভয়াবহ নির্যাতনও মানুষ এড়িয়ে থাকে, ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা আর সম্ভব হয় না।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদেরকেই সমাজ দায়ী করে। তারা হয় পাগল বা নয় দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় আছেন। অনেকেই বলেন যে তারা False Memory Syndrome এ ভুগছেন।

False Memory Syndrome

যারা ছোটবেলায় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন তাদের অধিকাংশই সেগুলো যথাযথভাবে মনে রাখতে পারেন না। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর আমরা মানসিকভাবে আরো শক্তিশালী হই ও আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়। এ সিনড্রোম হলো মানুষ তার একেবারেই কাছের মানুষদেরকে তার উপর নির্যাতনকারী বলে মনে করে। তার মাথায় এসব নির্যাতনের অনেক স্মৃতি ঘোরে। কিন্তু বাস্তবে এসব কিছুই ঘটেনি। ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই এসব বিশ্বাস করতে শুরু করে। এ আতঙ্ক তার ব্যক্তিত্ব, জীবনকে প্রভাবিত করে। এসব তার মাথা থেকে বের করা সম্ভব হয় না।

এ সিনড্রোমটি বিজ্ঞানীমহলে খুব একটা সমাদৃত নয়। তবে আমাদের মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসে আক্রমণ করে থেরাপি দিয়ে এ সিনড্রোম তৈরি করা যায়। তারা আমাদের স্মৃতিকে জাগ্রত করে ও সেখানে কিছু মিথ্যার ফ্লেভার দিয়ে দেয়। আমাদের মস্তিষ্ক তার অপূর্ণাঙ্গ স্মৃতিকে পূর্ণ করতে সবসময় সজাগ থাকে। কারো কারো মতে, ব্যক্তি নিজেই থেরাপি নিয়ে, আত্ম-উন্নয়নমূলক বই পড়ে এসব সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়। দেখা যায় যে কিছুই হয়নি, কিন্তু হঠাৎ ব্যক্তি তার পরিবার নিয়ে এমন ধারণা করতে শুরু করে।

আমাদের স্মৃতির উপর ভরসা রাখা যায় না। সময়, দূরত্বে তা বদলায়। তাই শারীরিক কোনো প্রমাণ বা সাক্ষী ছাড়া বিষয়গুলো গ্রহণ করা সম্ভব না। তাদের সবগুলোকে ভ্রান্তও বলা যায় না। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার স্বীকারোক্তি দেয়, ছবি বা ভিডিওটেপ ও সাক্ষী পাওয়া যায়। এটা সাদা-কালো কোনো বিষয় না।

ম্যাকমার্টিনের ঘটনার উপর একটি বিচার প্রক্রিয়া ছিল খুবই জনপ্রিয় একটি মামলা। ১৯৮০ সালের দিকে অনেকেই স্যাটানিক বিভিন্ন আচারানুষ্ঠানের

নির্যাতনের শিকার বলে দাবি করেছেন। তার মধ্যে অনেক শিশুও আছে। ম্যাকমার্টিন পরিবারের বিরুদ্ধে ১৯৮৩ সালে তাদের পরিচালিত অনাথাশ্রমে ৩২১টি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যায়। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত ভার্জিনিয়া ম্যাকমার্টিন, পেগি বাকে, রে বাকে, পেগি আনা বাকে, শিক্ষক মেরি এনা জ্যাকসন, রেটি রাইডার, বেবেট স্পিলটার সহ অনেকেই গ্রেফতার হন। ১৯৯০ সালে পুরো মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এটি হলো আমেরিকার ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল মামলা।

আজকের দিন পর্যন্ত অনেকেই মনে করে যে নির্যাতনগুলো হয়েছে। যেহেতু নির্যাতনের শিকার ভিক্টিমরা শিশু ছিল , স্বাভাবিকভাবেই তাদের পক্ষে বেশি প্রমাণ যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। অনেক শিশুই বড় হয়ে এখনও একই অভিযোগ করেন। তবে সে কেস সত্য হোক বা না হোক, আমরা জানি, আমরা প্রতিদিনই এমন অনেক ঘটনা শুনি। তার সব মিথ্যা হতে পারে না। স্যাটানিক আচারগুলো আমাদের সমাজে এমনভাবে দাঁনা বেঁধেছে, একে ঝেটিয়ে বিদায় করা ছাড়া উপায় নেই।

SMART Response

প্রতি গ্রীষ্মে, অনুশীলনমূলক আচরণ এবং বিবেক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কাজ করে যাওয়া একটি নিউজলেটারের সম্পাদক নীল ব্রিক, SMART (Stop Mind Control & Ritual Abuse Today), নামের একটি সম্মেলনের আয়োজন করে কানেক্টিকাটে। এর শিরোনাম ছিল "আচার অনুষ্ঠান, সেক্রেটিভ অর্গানাইজেশন এবং মাইন্ড কন্ট্রোল কনফারেন্স।" মন নিয়ন্ত্রণ এবং অপব্যবহারের সাথে জড়িত স্পিকার এবং উপস্থাপনাগুলোতে কাজে লাগানো বিভিন্ন চিহ্ন এবং ট্রিগার উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা বেঁচে যাওয়া লোকরা অর্জন করেছেন। How cues and Programming work in Mind Control & Propaganda, শিরোনামে মে ২০০৩ সালে তিনি বলেছিলেন:

"অনেক ট্রিগার বা সংকেত সহজাত হয়। একটি ওভেন বার্নারের কাছে যাওয়ার সময় ট্রিগার বা কিউ হলো উত্তপ্ত অনুভূতি। প্রায় সহজাতভাবে, কোনও ব্যক্তি বার্নার থেকে তাদের হাত সরিয়ে ফেলবে। এটি একটি নিঃশর্ত প্রতিক্রিয়া। শর্তযুক্ত এবং শর্তহীন ট্রিগার বা উদ্দীপনার শর্তযুক্ত বা শর্তহীন প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

পাভলোভিয়ান ক্লাসিকাল কন্ডিশনার শর্তযুক্ত সাড়া পাওয়ার জন্য একটি শর্তহীন উদ্দীপনার সাথে একটি শর্তযুক্ত উদ্দীপনা যোগ করেছে।

যারা আচার বা অত্যাচার-ভিত্তিক বিবেক নিয়ন্ত্রণ থেকে বেঁচে ফিরেছেন, প্রোগ্রামিংয়ে তারা বিভিন্ন উদ্দীপনার শর্তযুক্ত প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কখনও কখনও, একজন ব্যক্তিকে বারবার নির্যাতন করা হয়। সেখানে একটি বিকল্প ব্যক্তিত্ব তৈরি করা হয়। এবং তারপর তাকে সক্রিয় করার একটি সূত্র দেওয়া হয়। (Lord of The Rings যারা দেখেছেন, এটা অনেকটা তীব্র নির্যাতনের ফলে গোলামের যে অবস্থা হয় অনেকটা তেমন।) এটি কোনও নির্দিষ্ট শব্দ, শব্দগুচ্ছ, গন্ধ বা সংখ্যা হতে পারে। ব্রিক লিখেছেন, "ট্রমাটির শক্তি এবং কিউর শক্তির উপর নির্ভর করে পুরো প্রক্রিয়া। একটি শক্তিশালী গন্ধ একটি শক্ত আঘাত এর সাথে যুক্ত হয়ে ব্যক্তির অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এছাড়াও যদি সক্রিয়তা এবং কিউকে একসাথে যুক্ত করা হয় বা সময়ের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ করা হয় তবে তারা আরও সহজেই যুক্ত হবে।"

অবাক হবেন জেনে, বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের পণ্য কেনানোর জন্য অনেক সময় একই কাজ করে। এ সম্পর্কে আরও আলোচনা হবে। তবে মনে রাখবেন, বিবেক নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামগুলো সবসময় গোপনীয় এবং ষড়যন্ত্রমূলক প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। এগুলো যে কারো সাথে করা যায়। ব্রিক লিখেছেন, "প্রচারের কৌশল ও প্রোগ্রামিং কৌশল বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই রকম। কেউ বলতে পারেন, প্রোপাগাণ্ডা আর শারীরিক নির্যাতন কি এক হলো? সমস্যাটা আসলে প্রভাবে ও নিয়ন্ত্রণে। টিভিতে দৃষ্টি এবং শব্দের সংমিশ্রণ একজন ব্যক্তিকে আরও প্রভাবিত করে তোলে।"

ধর্মীয় নির্যাতন থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা এই সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তাদের অনেকের প্রতিই এ আচরণ শৈশবকাল থেকেই শুরু হয়। এতে চরম আকারের শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন জড়িত। এমনকি যদি কোনও আনুষ্ঠানিক নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে সহায়তা পায়ও, তাও তারা এসব নিয়ে অন্যের মুখোমুখি হতে ভয় ও লজ্জা অনুভব করেন। তারা জানত যে তাদের কাছের মানুষ এসবে জড়িত। তাদেরকে সাহায্য করার লক্ষ্যে তাদের

আচরণের উপর আমরা একটি লিস্ট করেছি। যেগুলো তাদেরকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

নীল ব্রিক এসব ট্রমা থেকে বের হয়ে আসার জন্য ২০০৪ সালে MKzine এ কিছু নিয়মাবলি উল্লেখ করেছেন:

- টিভি কম দেখা বা একেবারেই না দেখা। এর বিক্ষিপ্ত চিত্রায়ন মানসিক ক্ষতি করে।
- নেশা থেকে বেরিয়ে আসা। নেশা কোনোভাবেই ভালো পথ না। ট্রমা বরং আরো জেঁকে বসে।
- আধ্যাত্মিক কোনো পথ ধরুন। ধর্মের পথে যান। কিন্তু কোনোভাবেই কাল্ট না।
- সরকার ও তাদের দূর্নীতি সম্পর্কে জানুন। তারা মানুষের বিরুদ্ধে কীভাবে কাজ করে তা জানা। তাহলে তাদের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।
- কখনো হাল ছেড়ে দেবেন না। যদি বিবেক নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে যুগের পর যুগ লাগে, তারপরও মানসিক স্বাধীনতা অর্জন সবচেয়ে কঠিন কাজ।

ক্যাথলিস সুলিবান তার নিজের পরিবারের হাতেই MKUltra ভিক্টিম ছিলেন। তার পরিবার ছিল একই সাথে সামরিক বাহিনীর ও স্যাটানিস্ট। তারা ফ্রিম্যাসন ও কাল্টেরও সদস্য ছিলেন। তার বই Unshacked: A Survivor's Story of Mind Control এ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন পুরোটাই। ক্যাথলিস সেখান থেকে বেঁচে ফিরে আসা ব্যক্তিদের তাদের বর্তমান মানসিক অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য প্রবন্ধ লিখেছেন।

নিজ ঘরে স্বাগতম!

ক্যাথলিন সুলিবান

১৯৫৫ সালে জোসেফ লুফত ও হ্যারি ইনগাম কর্তৃক পরিচালিত জোহারি উইন্ডো আমার খুব প্রিয়। এগুলো দিয়ে চার জানালার কাজের মডেল করা হয়। সেটি মূলত মানুষের মানসিকতার চারটি স্তর বর্ণনা করে। জানালা আসলে আমাদের চার ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে। সেগুলো হলো—

- **খোলা অংশ** (উপরের বাম কোয়াডরেন্ট): আমাদের সচেতন অংশ।
- **অন্ধ অংশ** (উপরের ডান কোয়াডরেন্ট): আমাদের সেই অংশ যার সম্পর্কে অন্যরা সচেতন, কিন্তু ব্যক্তি নিজে সচেতন না।
- **লুকানো অংশ** (নিচের বাম কোয়াডরেন্ট): আমাদের এমন অংশ যা আমরা ভালোভাবে জানি কিন্তু অন্যরা জানে না।
- **অজানা অংশ** (নিচের ডান কোয়াডরেন্ট): যেটা আমরা বা তারা- কেউই জানে না।

অপরাধীরা জানে আমাদের সমাজের ব্লাইন্ড স্পট কোনটা। তাই তারা লুকিয়ে থাকতে পারে। তারা আমাদেরকে আমাদের চেয়েও বেশি জানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। আমরা সেটাই মেনে নিয়েছি। তবু আমরা সচেতন হই না।

তারা আমাদের সমাজের ব্লাইন্ড স্পটকে দুইভাবে দেখে—ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সামষ্টিক। তারা এটাও জানে যে সমাজের একগাঁদা অসচেতন মানুষের মধ্যে মেধাবী কেউ না কেউ থাকবে যারা আলো জ্বেলে দেবে। ফলে বেরিয়ে আসবে তাদের চেহারা।

অবশ্য আমাদের নিজেদেরও ব্যক্তিগত ব্লাইন্ড স্পট আছে। আমাদের জীবন ও অতীতের ব্লাইন্ড স্পট খুঁজে বের করা, সচেতন হওয়া ব্যাপক কষ্ট ও শ্রমের ব্যাপার।

বিবেক নিয়ন্ত্রণ থেকে বেঁচে ফিরে আসা ব্যক্তিদের জন্য এ যুদ্ধ আরো কঠিন। তাদের অনেককেই বিভিন্ন অপরাধে জড়িত হতে বাধ্য করা হয়েছে। তাদেরকে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। তাদের কাজগুলো এতোটাই ক্ষমার অযোগ্য যে তারা এসব নিজের কাছেই রাখতে চান। তাদের মনের ক্ষত ভীষণ গভীর। তারা সবচেয়ে জঘন্য মানুষদের মোকাবেলা করেছিল। তবে সমাজ থেকে সাহায্য পাওয়া জরুরি। দুঃখজনকভাবে তারা মনে করে যে

এসব শেয়ার করলে মানুষ নিজেদের মধ্যে থাকা শয়তানি খুঁজে পাবে। তাই তারা চুপই থাকে।

যারা বেঁচে যান তারা সবাই ইতিমধ্যেই অনেক বেশি বিশ্বাসঘাতকতা ও কষ্টের শিকার হয়েছেন। তারা হীনমন্যতায় ভোগে। তারা মনে করে যে তারা এতোটাই গর্দভ যে তারা নিজেদের দেহ ও মনের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে পারে না। তারা যদি এসব মানুষের সামনে প্রকাশ করে তাহলে মানুষ তাদেরকে ঘৃণা করবে ও একসময় এভাবেই তাদের মৃত্যু হবে। এজন্যই তারা গুটিয়ে যায়।

তাদেরকে নির্যাতনকারীরা শিখিয়ে দেয় যে তারা গর্দভ, শয়তান ও এ সমাজে থাকার উপযুক্ত না। এসবকিছু তারা মাথা থেকে বের করতে পারে না। তারা ভালোবাসার যোগ্য না। অনেকেই তাদের গল্পগুলো মিথ্যা গালগল্প মনে করে। তারা আরো হতাশ হয়ে যায়। তাদের ন্যূনতম মানসিক ভারসাম্য এভাবেই হারিয়ে যায়। তারা কুঁড়ে কুঁড়ে মারা যায়। মানুষ জানে না যে একসময় তারাও এসবের মুখোমুখি হবে। তারা মানুষকে এভাবে মৃত্যু ও হতাশার দিকে নিয়ে যায়। পৃথিবী যে একটি নিরাপদ আবাসভূমি—তাতে ভিক্টিমদের বিশ্বাস চলে যায়।

অনেকেই তাদের নির্যাতনকারীদের কাছে ফিরে গিয়েছে। কেননা তাদের আশেপাশের মানুষরা তাদেরকে বিশ্বাস করত না। তারা মনে করতো যে আর কেউ না বুঝুক, নির্যাতনকারীরা তো তাদের কষ্ট বোঝে। তাই তারা সেখানে ফিরে যেতো। তারা এটাও জানে যে কীভাবে সব অত্যাচার নীরবে সয়ে যেতে হয়। তারা কষ্টের সাথেই বসবাস শুরু করে। তারা অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করেছে, নতুন করে কাছের মানুষদের কাছ থেকেও কষ্ট পেতে চায় না আর। এটা আগেও ছিল, এখনও আছে।

আজকাল তো অনেক ভিক্টিম নির্যাতনকারীদের থেকে উদার পৃথিবীতে বেশি নির্যাতিত বোধ করে। অবশ্য অনেক ভিক্টিমই যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছে, সাহায্য পাচ্ছে। বিপরীত চিত্রকেও অস্বীকার করা যায় না। তারা সচেতনভাবেই নিজের মনে নির্যাতনের বিষয়গুলো লুকিয়ে রাখে। তাদের নীরবতা অনেক ক্ষতি করছে সমাজের। তাদের নীরবতার কারণেই বিবেক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাওয়া কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

সেসব লোকের শক্তির উৎস, ক্ষমতা আমাদের জানা প্রয়োজন। আমরাই পারি তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে, তথ্য বের করে আনতে। আমাদের কেবল

তাদের কথা শুনতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। তাদেরকে আশ্বাস দিতে হবে যে তারা আমাদেরই একজন, আমরা সবাই তার পাশে আছি। এমনভাবে তাদের কথা শুনতে হবে যেন আমরা এর জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। এভাবেই আমরা পারবো সবার জন্য সুন্দর পৃথিবী তৈরি করতে। আশা রাখছি, এ বই তাদেরকে সাহায্য করবে।

আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে আমরা যে সমাজ গড়ে তুলেছি সেখানে প্রতিটি মানবাত্মা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাই সবার পাশে আছি। আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, সাহস জোগাতে হবে। অনেক মানসিক অভিবাসী দেশে থেকেও পরবাসী। এটাই সময় তাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে আনার।

হিপনোসিস

হিপনোসিস খুব জনপ্রিয় বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া। হিপনোসিস শব্দটি এসেছে গ্রিক Hypnos থেকে যার অর্থ 'ঘুম'। এটি হলো মূলত আমাদের অবচেতন মনে আমাদের স্মৃতিতে মনোযোগ ধরে রেখে কিংবা অতীতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। অবশ্য অন্য কোনো কল্পনায় মানুষ ঠিকই জেগে থাকে। এসব ভিক্টিমরা জোম্বি না, তবে অনেক বেশি প্রভাবিত। হিপনোসিস বিনোদনের কথা বাদ দিলে এ প্রক্রিয়া মন নিয়ন্ত্রণের খুব ভালো একটি পদ্ধতি। এটি ব্রেইনওয়াশিং বা নির্যাতনের চেয়ে কম না।

মানুষ এখানে আশপাশ সম্পর্কে জানে কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। মানুষ কোনো ভয় থেকে বের হতে বা ভালো স্বাস্থ্যের জন্য বা ধূমপান ছাড়ার জন্য হিপনোসিস করে। আমাদের মন খুবই সতর্ক থাকে, হাঁটার সময়ের চেয়েও বেশি। ২০০৫ সালে American Psychological Association (APA) হিপনোসিসের একটা সংজ্ঞা দিয়েছিল। তাদের মতে,

হিপনোসিস মানে আমাদের কল্পনায় কিছু বিষয় যোগ করে দেওয়া। হিপনোসিসে মানুষের স্মৃতি ও কল্পনাকে ব্যবহার করা হয়। সামনে হয়তো আরো বিস্তৃত সংজ্ঞা আসবে। হিপনোসিস মূলত কল্পনার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়া। এখানে ব্যক্তি তার হিপনোসিস্টের নির্দেশনা অনুযায়ী কল্পনায় পরিবর্তন আনে। দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ, আচরণসহ অনেক কিছুতে পরিবর্তনেই এটি কাজ করে। মানুষ নিজে নিজেও হিপনোসিস করতে পারে। এখানে নিজেই ব্যক্তি বা বিষয়, নিজেই নির্দেশক। অনেকেই মনে করেন মানুষ হিপনোটিক অবস্থায় হিপনোসিস করে।

আবার অনেকের দাবি, হিপনোসিসের জন্য হিপনোটিক অবস্থা জরুরি না। যদিও আগেরপক্ষ একে জরুরি বলেই মানে।

MKUltra প্রজেক্টে কারো ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করতে হিপনোসিস ব্যবহার করা হয়। যৌনসঙ্গম কিংবা হত্যার ইতিহাস মানুষ কখনোই জানায় না। সেগুলো তারা হিপনোটিক অবস্থায় নিয়ে বের করে আনে। কাল্টে সবসময় হিপনোটিক ভাষা ব্যবহার করা হয়। তারা অনেক মেধাবী মানুষকেও কথার জাদুতে বশ করে ফেলে। ফলে তারা তাদের জীবন, সম্পদ সব বিসর্জন দেয়।

সাইকোলজিস্ট, অধ্যাপক ও লেখক ড. করিডন হ্যামন্ড তার "Cults, Ritual Abuse and Mind Control: Exploring the Role of Cults in Ritual Abuse and Mind Control," এ বলেন, "এখানে প্রথমত মানুষের অন্তরকে বিভক্ত করা হয়। এটিই গোয়েন্দাবাহিনী চায়। কাউকে ঘাতক বানাতে চান? মন বিভক্ত করে দিন।" হ্যামন্ড মূলত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে হত্যাকারী সিহরান সিহরানের কথা বলেছেন। সাইকিয়াট্রিস্ট বার্নার্ড ডায়ামন্ড বলেছেন যে সে পুরোপুরিভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ছিল। হ্যামন্ডের মতে,

তারা মূলত একজন বাচ্চাকে গড়ে তোলে। আড়াই বছরের বাচ্চার মাথায় তারা ধ্বংসাত্মক সব চিন্তা প্রবেশ করায়। তারা ব্যক্তিকে শারীরিক, যৌন নির্যাতন করে। আপনি বাচ্চার কান্না বন্ধ করার জন্য অনেক কিছুই করবেন। তারাও সে কাজই করে। তারা আড়াই থেকে শুরু করে আচরণকে হঠাৎ ছয় বছরের বাচ্চার পর্যায়ে নিয়ে যান। তারপর যৌবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় আনতে থাকে।

এখন প্রত্যেকের উপর হিপনোসিস প্রয়োগ খুবই সহজ হয়ে গিয়েছে। কোনো অপরাধীর যৌনতা, খুন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন উদ্দীপনা ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তির মনেও থাকে না সে কী বলেছে। হিপনোসিস ও অত্যাচারের সমন্বয় একজন মানুষের সবকিছু পরিবর্তন করে তাকে জোম্বি বা রোবটে পরিণত করে। ব্যক্তি আর নিজের মাঝে থাকে না।

১৯৬৮ সালে Hypnosis বইটির লেখক এইচ ডি বির্নস বলেন, "একজনের মধ্যে প্রথমে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব তৈরি করা হয়। ব্যক্তির চেতনার উপর নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা তাতে কিছু আসে যায় না। পরের ধাপ হলো সচেতনভাবে চিন্তার ক্ষমতা সরিয়ে নেওয়া। বিষয়টি সময়সাপেক্ষ, কিন্তু কাজের।"

ড্রাইভার যেমন গাড়ি চালায়, হিপনোসিস্ট তেমন ব্যক্তিকে চালায়।

হিপনোসিসের অনেক স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন ভিক্টিমরা। মানুষ একসময় ভুলে যায়, সে আসলে কে। অনেক ব্যক্তিত্ব নিয়ে সে সন্দিহান থাকে। হিপনোসিস্ট ঠিকই জানে এসব থেকে কীভাবে বের হয়ে আসা যাবে। সাধারণ একজন মানুষ, যে পরিবারের সাথে সময় কাটায়, কফি খায়, অফিসে যায় সেও একজন দক্ষ ঘাতক হয়ে উঠতে পারে। সাধারণত তথ্য ফাঁস করতে চাওয়া মানুষরা এসবের প্রধান হাতিয়ার।

মানুষকে উঁচু মানের ঘাতক বানাতে গিয়ে তার মধ্যে অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস দিয়ে দেওয়া হয়, তাকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। হয়তো এ কারণেই ১৯৬৯ সালে স্যান কুয়েন্টিন কারাগারে ড. এডওয়ার্ড সিমসন-ক্যালাস তার সহকর্মীসহ উপসংহারে আসেন যে সিরহান সিরহান কোনো সিজোফ্রেনিক রোগী নন। বরং তাকে খুব ভালোভাবে হিপনোসিস করানো হয়েছে। এমনকি কোর্টেও সিমসন বলেন যে সিরহানকে কেনেডি হত্যার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আরব হিসেবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা খুবই সহজ। কিন্তু বাস্তবতা হলো সে এর জন্য দায়ী নয়।

নাজিদের থেকে শুরু করে ঠান্ডা যুদ্ধের পর পর্যন্ত আমাদের সরকারও বিভিন্ন কারণে হিপনোসিস ও বিবেক নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি ব্যবহার করেছে। তারা গোপনে খুনি তৈরি করেছে। হিপনোটিজমের এনসাইক্লোপিডিয়ায় বলা হয়েছে, MKUltra সহ অনেক প্রজেক্টেই সিআইএ হিপনোসিস ব্যবহার করেছে। কার্লা এমারি সিআইএর হিপনোটিক মানসিক প্রশিক্ষণকে সরাসরি বিবেক নিয়ন্ত্রণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এসকল প্রজেক্ট সরাসরি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। তার দুটো কারণ আছে।

- অবচেতন মন তৈরি করা যেত তারা গোপন তথ্য বহন করে নিয়ে যেতে পারে।
- যেখানে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় না সেখানে ব্যক্তিকে মানব টেপ রেকর্ডার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

Project Bluebird এর লক্ষ্য ছিল প্রতিবাদ ও মানুষ নিয়ন্ত্রণ। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি জানতো না তাকে কে প্রভাবিত করছে। সিআইএর মেমো "Defense Against Soviet Medical Interrogation and Espionage Techniques"

এ বলা হয়, "হিপনোটিজমের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা যায়, নিজেদের মতো গড়ে তোলা যায় ও পুরো অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়।"

সত্যিকার যোদ্ধা!

Shooter Syndrome

যেহেতু সম্মোহন বা হিপনোসিস সিআইএর প্রকল্পগুলোর সাথে যুক্ত রয়েছে, প্রশ্ন আসে যে হত্যাকাণ্ড, স্কুলের শিশু অপরাধ এবং হত্যা-আত্মহত্যার মতো সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো কি এসবেরই ফলাফল? আমরা জানি যে কোনও ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই সম্মোহিত হলে নির্যাতনকারী, ব্যক্তির ধারণা বা চিন্তাভাবনা সফলভাবে বদলে দিতে পারে। অবশ্য এসব ব্যবহার করে মানুষ ওজন কমাতে পারে, ধূমপান বন্ধ করতে পারে, খারাপ অভ্যাসের অবসান ঘটাতে পারে। সম্মোহন এমনই।

কিন্তু এর অর্থ কী এই যে পৃথিবীতে যতবারই ভয়াবহ কিছু ঘটে, তার কারণ এটাই? কলম্বাইন, স্যান্ডি হুক, অররা সিনেমা থিয়েটার, গোপন তথ্য ফাঁসকারীদের আত্মহত্যা, রাষ্ট্রপতি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের হত্যাকাণ্ড, শ্যুটারদের নির্দিষ্ট মানসিকতা ও সামাজিকতা তৈরির জন্যও কি এর ভূমিকা আছে? সাইকিয়াট্রিস্ট কলিন রস, এমডি, তাঁর অনেক বইয়ে লিখেছেন যে সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সরকারী ও সামরিক প্রকল্পগুলো মনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই ট্রমা ব্যবহার করে সমাজকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপরে তারা সাধারণত যে কাজগুলো করত না তা তাদেরকে দিয়ে করানো হয়—যেমন হত্যা এবং গণহত্যা।

ষড়যন্ত্র তত্ত্বের প্রবর্তকরা পুলিশ কাস্টডি ও আদালতে তাদের কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি এবং অদ্ভুত চিন্তাভাবনাসহ শ্যুটার এবং হত্যাকারীদের উদ্ভট আচরণকে যৌক্তিক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

উদাহরণ হিসাবে স্যান্ডি হুক (কানেকটিকাট) স্কুল শুটিংয়ের কথাই ধরি।

১৪ ই ডিসেম্বর, ২০১২ এ, অ্যাডাম লানজা নামে এক যুবক তার মাকে গুলি করেছিল। তারপরে সে কানেকটিকাটের নিউটনের স্যান্ডি হুক এলিমেন্টারি স্কুলে যায় এবং ২০ জন ছাত্র এবং ছয় কর্মী সদস্যকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করে। মিডিয়া ল্যাঞ্জা সম্পর্কে আরও রিপোর্ট প্রকাশ করে। তার বয়স ছিল ২০। ছোটবেলায় সংবেদনশীল প্রসেসিং ডিসঅর্ডার কিশোর হিসাবে

Asperger's Syndrome এবং হতাশাসহ বেশ কিছু মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিল। সে সেলেক্সা নামক একটি অ্যান্টি-ডিপ্রেশন গ্রহণ করত। কিন্তু তার বাবা পিটার ল্যাঞ্জা সেটা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং আশঙ্কা করছিলেন যে তাঁর ছেলে সম্ভবত সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। তিনি তার জানালাগুলোতে কালো টেপ রেখেছিলেন। তিনি কাউকে তার ঘরে ঢুকতে দেন না। পরবর্তী বছরগুলোতে সে কেবল ইমেলের মাধ্যমে তার মায়ের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। গুলি চালানোর আগে তার ভাই এবং বাবার কাছ থেকেও তাকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। সে 'গণহত্যা' নিয়েই মেতে থাকত। মারা যাওয়ার আগে তার কম্পিউটারে নারীদের তথ্য রেখে যায় সে। তার মা ন্যান্সির বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

মানসিক অসুস্থতা ও সাথে আগ্নেয়াস্ত্র—ভবিষ্যৎ খুব বাজে।

কিন্তু তিনি কি বিবেক নিয়ন্ত্রণের ভিক্টিম ছিলেন? তিনি ছিলেন বা ছিলেন না এমন কোনও প্রমাণ নেই। কিছু ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক মনে করেন যে তার গণ-শ্যুটিং সহ শেষ পর্যন্ত যে যে শিরোনামের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এগুলো সবই তার ট্রমাকে নির্দেশ করে। এগুলো সরকারি এজেন্ডারই অংশ। এই বিষয়গুলো এজেন্ডার গিনিপিগগুলোর অজানা কিছু নয়। এগুলো জনসাধারণের মধ্যে ভয় ও বিভাজন সৃষ্টি করা, ইন্টারনেট, ইউটিউব এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া বিশৃঙ্খলা, দলীয় ব্যানারে মানুষকে বিভক্ত করা, ধর্মীয় গোঁড়ামি তৈরি করা, এবং নিজস্ব দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভর করে বন্দুক বিক্রি করার লক্ষে পরিচালিত হয়। এই শ্যুটার এবং ঘাতকরা কেবল বিবেক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র। আমরাও এসব প্রক্রিয়ার শিকার।

বন্দুক তাদের কাছে ছেলেখেলা।

এদের মধ্যে বেশিরভাগ শ্যুটার এবং ঘাতক মারা গেছেন। তাই এসব সত্যের আলোকে পরীক্ষা করা যায় না। জেল বা মানসিক প্রতিষ্ঠানে যারা বেঁচে থাকে, তাদের কাজের জন্য তারা চিরকালের কলঙ্কিত হয়। তারা যদি ফিরেও আসে তাও তারা কলঙ্কিতই থাকে। ফালতু কাজ।

আরও একটি উদ্বেগজনক ঘটনা হলো জেমস হোমসের। সে ২৪ বছর বয়সী শ্যুটার, যিনি ২০ জুলাই, ২০১২ সালের অরোরা, কলোরাডোর মুভি থিয়েটারে ১২ জনকে হত্যা করেছিলেন এবং ৭০০ জনকে আহত করেছিলেন।

হোমস একটি প্রতিরক্ষামূলক গিয়ার পরা ছিল, যার মধ্যে একটি গ্যাস মাস্ক এবং লোড-বেয়ারিং ছিল। অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যখন তিনি একটি থিয়েটারে গিয়েছিলেন তখন সেখানে The Dark Knight Rising এর স্ট্রিমিং চলছিল। তিনি সেখানে টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড স্থাপন করেছিলেন। একটি রাইফেল, একটি শটগান এবং একটি গলক ২২ সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তিনি শ্রোতাদের আক্রমণ করেন। হোমস পরে থিয়েটারের পিছনে ধরা পড়েন এবং গ্রেপ্তার হন। তাঁর চুল লাল রঙ করা হয় এবং তিনি নিজেকে "জোকার," বলে পরিচয় দেন। কলোরাডো আদালতে সবাই ব্যাপারটি দেখেছিল। স্পষ্টতই, তিনি একাই কাজ করেছিলেন এবং তার অ্যাপার্টমেন্টকে আড়ালে রেখেছিলেন। ঘটনাটি প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব পুরো ঘটনার ভয়াবহতায় স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং শীঘ্রই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব শুরু হয়ে যায়।

ব্ল্যাকলিস্টড নিউজের জন্য লেখা প্রবন্ধে ওয়েন মাদেন বলেন, হোমস ছিলেন ডেনভারের ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডোর আনসচুটজ মেডিকেল ক্যাম্পাসে একটি জাতীয় ইনস্টিটিউট অব হেলথ নিউরোসায়েন্স ট্রেনিং গ্রান্টের রিসিপেন্ট। তিনি রিভারসাইডে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নায়ুবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এই গণহত্যার আগে, হোমস আনসচুটজ ক্যাম্পাসে "সাইকিয়াট্রিক এবং স্নায়বিক ব্যাধির জৈবিক ভিত্তি" সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিল। আনসচুটজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর আর্মি মেডিকেল সেন্টারের একটি ডি-কমিশনড সাইটটি খৃস্টান মৌলবাদী তেল ও রেলপথের ব্যবসায়ী ফিলিপ আনশুটজের নামে। তাকে The Examiner ও Weekly Standard মালিক হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। হোমস ১৮ বছর বয়সে ক্যালিফোর্নিয়ার লা জোলার সল ইনস্টিটিউটে একটি গবেষণা ইন্টার্ন ছিলেন। সল্ক ইনস্টিটিউট এর আগে ডারপা, ডিফেন্স অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্টে ডার্ক চকোলেটে পাওয়া অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ফ্ল্যাভিনল ব্যবহার করে যুদ্ধ সৈন্যদের ক্লান্তি রোধ করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে গবেষণায় জড়িত ছিল। MARS ক্যান্ডি সংস্থাও জড়িত ছিল।

ম্যাডসেনের নিবন্ধে যেমন বলা হয়েছে, এই গবেষণা প্রোগ্রামটি যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যবহারের জন্য মস্তিষ্ক-মেশিন ইন্টারফেস তৈরির প্রোগ্রাম ছিল। এটি ডারপা'র "Peak Soldiers Performance Program" এর একটি অংশ ছিল। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, জেমস হোমসের পিতা ড. রবার্ট হোমস, নিউরাল নেটওয়ার্কিং এবং

কট্রনিক নিউরাল নেটওয়ার্কগুলোর সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন যা কোনও মেশিনকে আক্ষরিক অর্থেই উদ্দীপনা ব্যাখ্যা করতে এবং মানুষের মতো চিন্তা করতে দেয়। ড. রবার্ট হোমসের নিউরোবায়োলজি এবং প্রতিরক্ষা এবং সরকারী সংস্থাগুলোর গবেষণার সাথে সংযোগ ছিল।

কিন্তু প্রতিরক্ষা শিল্পের এই লিঙ্কগুলো কি হোমসের উপর কোনো প্রভাব ফেলেছে? মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুবিজ্ঞানের সাথে তার নিজের কাজটির কি এমন কোনো সংযোগ ছিল যার কারণে তিনি কোনোভাবে সিনেমা থিয়েটার শ্যুট করার জন্য ট্রিগার হয়েছিলেন? এই লিঙ্কগুলো কি সন্দেহজনক এবং অস্বাভাবিক? বা কেবল "পৃথকীকরণের ছয় ডিগ্রি"? এমন লিংক কি আছে যা আমরা গভীরভাবে দেখলে আমরা কারও সাথে সংযুক্তি খুঁজে পেতে সক্ষম হবো?

স্যান্ডি হুক শ্যুটার অ্যাডাম ল্যাঞ্জার কাছে ফিরে যাই। এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো প্রায়ই জনগণের কাছে নির্দিষ্ট বার্তা প্রদান করে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে কি একটি নির্দিষ্ট আচরণগত প্রতিক্রিয়া তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে? হতে পারে এটা বন্দুক নিয়ন্ত্রণের আইনের জন্য একটি সতর্কতা। বা অন্য কিছু? এই গণ শ্যুটিংয়ের ঘটনা কি আরও বড় কোনও কিছুর লক্ষণ? মিডিয়া কি তা লুকিয়ে রাখবে এর আড়ালে? ল্যাঞ্জা ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোর সাথে অপরিচিত ছিলেন না, কারণ তার পিতা পিটার ল্যাঞ্জা জিই এনার্জি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের সহ-সভাপতি ছিলেন। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব অনুসারে, পিটার ল্যাঞ্জার কাছে এলআইবিওআর কেলেঙ্কারী সম্পর্কিত তথ্য ছিল যা কিনা লন্ডনের বড় ব্যাংকগুলোর গড় সুদের হার এবং LIBOR (London Inter Bank Offer Rate) সাথে সংযুক্ত একটি জালিয়াতি। এই কেলেঙ্কারিতে বেশ কয়েকটি ব্যাংক তাদের সুদের হার স্ফীত করে বা হস্তান্তর করে যাতে তারা ব্যবসায় থেকে লাভ করতে পারে। এই ধারণাও দেয় যে তারা আগের চেয়ে বেশি ক্রেডিট হোল্ডার। পিটার লানজার সিনেট ব্যাংকিং কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ছিল, তবে এ শুনানির সময় নির্ধারিত হয়নি। পিটার ল্যাঞ্জা দ্য নিউ ইয়র্কারকে বলেছিলেন: "আমি জানি যে এডাম সুযোগ পেলে আমাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলত। আমি এক মিনিটের জন্যও প্রশ্ন করিনি কেন সে ন্যান্সিকে চারবার গুলি করেছে। কারণটি আমাদের প্রত্যেকেরই জানা: ন্যান্সির জন্য একটি; তার জন্য একটি; [তার ভাই] রায়ানর জন্য একটি; আমার জন্য একটি।" ছেলের অদ্ভুত আচরণের জন্য কি বাবার

কথিত পাপগুলো কোনোভাবেই দায়ী ছিল? আমরা জানি না। কিন্তু ষড়যন্ত্র তো চলছেই।

বিবেক নিয়ন্ত্রণ: প্রেক্ষিত ভবিষ্যৎ পৃথিবী

"7 Future Methods of Mind Control" নামের একটি প্রবন্ধে নিকোলাস ওয়েস্ট ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বিবেক নিয়ন্ত্রণের কিছু সম্ভাব্য পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ কাজগুলো সমাজের এলিটরাই করে থাকে—আরো ধীর, সুসংগঠিত উপায়ে। ওয়েস্ট লিখেছেন, "ভবিষ্যৎ বিশ্বে ডিজিটাল মন এসব নিয়ন্ত্রণ করবে"। সে ৭টি উপায় হলো:

- **নজরদারি ও গ্যাজেট:** ওয়েস্ট নজরদারি ও গ্যাজেটের প্রতি মানুষের অত্যাধিক ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখেন। আমাদের চিন্তার উপর টিভি ও ভিডিও গেইমসের প্রভাব অন্য মাত্রায়। তিনি ইন্টারনেট, টিভি, মোবাইল, ট্যাবলেটকে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাবক মনে করেন। মন ও কম্পিউটারকে একসাথে কাজ করানোর প্রযুক্তি নিয়ে এখনই গবেষণা হচ্ছে।
- **রোবট ও ড্রোন:** মানুষ ও মেশিনের সমন্বয় হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে রোবট। ভবিষ্যতে নিজস্ব মস্তিষ্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা ড্রোনও হয়তো চলে আসবে!
- **ম্যাগনেটিক প্রভাব:** আমাদের সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে। সমাজই আমাদের মানসিকতা ও বিবেক নিয়ন্ত্রণ করছে।
- **প্রোথিত ও গলাধঃকরণ করা:** আপনার মাঝেই আপনি চিপ নিয়ে চলবেন। আপনার খাবার, ওষুধ, সবকিছুতেই এ চিপই আপনার সাথী!
- **জেনেটিক ও নিউরো-ইঞ্জিনিয়ারিং:** MIT এর নিউরো ইঞ্জিনিয়ার এড বয়েন বলেন, "আমরা যদি আসলেই আমাদের মস্তিষ্কে চিপ বসানো নিয়ে সতর্ক হতে চাই তাহলে আমাদেরকে মস্তিষ্কের কাজও বুঝতে হবে"। এর চেয়ে খারাপ আর কী আছে?
- **নিউরো-সায়েন্স:** মানুষের মস্তিষ্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা-গবেষণা করা হয়। এটিই পৃথিবীকে পাল্টে দেবে। ভালো-খারাপ দুটোই হতে পারে।

- **সরাসরি অন্তর্ভুক্তি:** ব্রেন হ্যাকিং এখন কেবল সায়েন্স ফিকশন না। The Singularity Is Near এর লেখক ও গুগলের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিরেক্টর রায় কুর্জওয়েল বলেন, "মানুষ শীঘ্রই নিজেদের নতুন সংস্করণ আবিষ্কার করবে—হোক তা জৈব বা অজৈব।

রিমোট কন্ট্রোল

ধরুন, আপনার দিকে একপাল ষাঁড় ছুটে আসছে। রিমোট ছাড়া তা বন্ধ হবে না। কী করবেন আপনি? ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক ড. জোস এম আর ডেলগাডোকে ধন্যবাদ। তিনি ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছেন। ২০১৩ সালে স্পেনের কর্ডোভায় তিনি এমন একটি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। রিমোট দিয়ে তিনি ষাঁড়কে চালিয়েছিলেন। তিনি ষাঁড়ের মস্তিষ্কে ইলেক্ট্রোড বসিয়ে দেন। পরবর্তীতে রিমোটের ইঙ্গিতে আক্ষরিকভাবেই ষাঁড়ের আচরণ বদলে যায়।

ডেলগাডো বিষয়টি নিয়ে গত ১৫ বছর ধরে কাজ করছেন। শেষমেশ তিনি সফল হলেন। ২০১৪ সালের জুলাইয়ে নিউ ইয়র্কে "'Matador' with a Radio Stops Wired Bull Modified Behaviour in Animals the Subject of Brain Study" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি বলেন, মানুষের বন্ধুত্বের অনুভূতি, আনন্দ, কথাকে মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে পরিবর্তন করে ফেলা যাবে।" যদিও ১৯ শতক থেকেই এসব চেষ্টা চলছে। কিন্তু এ গবেষণাটা অনেক বেশি অগ্রসর। ডেলগাডোর কথা অনুসারে, কেবল প্রাণীই নয়, বরং মানুষের উপরও এগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে। তিনি নিজেই তা করেছেন। এপিলেপ্সির চিকিৎসায় তিনি এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। সেখানে ইলেক্ট্রনিক সংকেতের মাধ্যমে দুশ্চিন্তা দূর করা, বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা ও সহনশীলতা সৃষ্টির কাজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন থেকেই যায়, রিমোট কার হাতে?

যত যাই হোক, তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে এটা অস্বীকার করা যায় না। দিন যাচ্ছে, তথ্যের প্রবাহের গতি বাড়ছে।

আমরা কি নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলব?

কাল্টের ইতিহাস: যুগে যুগে কাল্টের প্রভাব

কাল্টে ভিক্টিমকে ব্রেন কেমিক্যাল দেওয়া হয়। এগুলো সব বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থায় করা হয়। দিনকে দিন কাল্ট আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর আমাদের বিশ্বাস নির্ভর করে। আমাকে আপনি বন্ধু হিসেবে দেখলে আমি আপনার বন্ধু। বাবা হিসেবে দেখলে বাবা। যাদের বাবা নেই আমি তাদের বাবা। আমাকে রক্ষক ভাবলে আমি রক্ষক। আমাকে খোদা ভাবলে আমিই খোদা।

- *People's Temple* এর জিম জোনস।

নেটের যুগে কাল্ট খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। মাত্র ১২ জন লোকের একটি কাল্ট, যাদের কিনা ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, তারা তাদের সমস্যা মোকাবেলায় হঠাৎ সমাধান পেয়ে যায়। বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য।

-টিম বার্নারস লি।

জোনস: *প্লিজ! ঈশ্বরের দোহাই লাগে! এভাবেই চলো। আমরা এমনভাবে এতদিন চলেছি যেভাবে কেউ চলেনি। কিংবা এভাবে চলতে কেউ ভালোবাসেও না। আমরা যা পাওয়ার, পেয়েছি। প্লিজ এটা শেষ করো। প্রতিদিন হাঁটা ও ধীরে ধীরে মারা যাওয়া খুব কষ্টের। বাচ্চাকাল থেকে চুল সাদা হওয়া পর্যন্ত আমরা মারা যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। অসৎ তারা। তারা অবশ্যই পস্তাবে। অবশ্যই পস্তাবে। এটি একটি বৈপ্লবিক আত্মহত্যা। এটা নিজেকে ধ্বংস করা নয়। তারা আমাদেরকে আজ এ অবস্থায় এনেছে। আমি তাদেরকে এ অবস্থায় রেখে যাচ্ছি। যে বাচ্চার কাছে যেতে চায় সে যাক। এটা মানবতা। আমি যেতে চাই। আমি তোমাদেরকে যেতে দেখতে চাই। তারা আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। আমি চাই তোমরা যাও। এ জাহান্নামে আর থেকো না। আর না। আর না। আর না। আমরা চেষ্টা করছি। আমি চাই সবাই বিশ্রাম নিক। আর এটাই শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম। সমস্যামুক্ত না হলে বিশ্রাম সম্ভব না।*

এ স্ক্রিপ্টটি হলো People's Temple এর ধর্মগুরু জেমস ওয়ার্নার জিম জোনসের সুইসাইড নোট। এটি তিনি ১৯৭৮ সালের ১৮ নভেম্বর দিয়েছিলেন তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে। গোয়ানার বনে তিনি তার ৯০০ অনুসারীসহ আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে তাদের সন্তানসহ আত্মহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর ইতিহাসেই এটিই সবচেয়ে বড় আত্মহত্যা। ১৯৫৫ সালে এই চার্চটি খোলা হয়েছিল মানুষে মানুষে সম্পর্কন্নোয়ন, গরীবদের অভ্যর্থনা ইত্যাদি মহৎ উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে একজন মানুষ এ চার্চকে ভুলপথে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সে লোকটি তার পরিচিতদের উপর জাদু করতো ও তাদের জীবনে ভয়াবহ দুর্যোগ নিয়ে আসতো।

রেটরিক ও যুক্তির ব্যবহার করে তিনি কংগ্রেসম্যান লিও রেয়ান ও NBC রিপোর্টিং স্টাফকে হত্যা মামলা থেকে বাঁচতে চেয়েছেন। তাদেরকে চার্চের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত রিপোর্ট তৈরির চেষ্টা করায় হত্যা করা হয়। জোনসই সে ব্যক্তি। তিনি তার অনুসারীদের সম্মানের মৃত্যুকে গ্রহণ করতে বললেন। জোনস অনেক সময়ই নিজেকে নবী দাবি করেছেন। তার অনুসারীরা তার জন্য তাদের সম্পদ, সময়, ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়েছে। তাই তিনি তাদেরকে তাদের আনুগত্যের পুরষ্কার হিসেবে জীবনদান করতে চেয়েছেন। তিনি তাদেরকে বহির্বিশ্বের অন্যদের বিরুদ্ধে এক হতে বলেছিলেন।

তারপর সেখানে ক্ষমতা ও আত্মপ্রশংসার পাগল এ লোক তার ৯০০ অনুসারীসহ আত্মহত্যা করে। এ লোকটি "জঘন্য এ বিশ্বে বিপ্লব হিসেবে" তার অনুসারীদেরকে তাদের সন্তান হত্যা করতে আহ্বান করেছিলেন।

হাস্যকর! আত্মহত্যা ও শিশু হত্যার চেয়ে জঘন্য আর কী হতে পারে? আমাদের হয়তো এমন অনেক প্রশ্ন আছে। কিন্তু তার অনুসারীদের এমন কোনো প্রশ্ন ছিল না। তাদের মধ্যে কোনো বিবেক অবশিষ্ট ছিল না। তাদের মনকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছিল তাদের ধর্মনেতারা। তাই তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করত ও মেনে চলত।

জোনস: *আমি মর্যাদার সাথে মারা যাচ্ছি। শুয়ে পড়ো মর্যাদার সাথে! অশ্রু ও অপমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে না। এগুলো মৃত্যুর কোনো কারণ নয়। ম্যাক বলেছিল, এটি কেবলই অন্য বিমানে আরোহন করা। এ পথে চলবে না। হিস্টারিক রোগীর মতো আচরণ করবে না। আমাদের রাস্তা কমিউনিস্টদের মতো*

নয়। আমাদের মর্যাদার সাথে মারা যাওয়ার আর কোনো পথ খোলা নেই। আমাদেরকে অবশ্যই মর্যাদার সাথে মরতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই মর্যাদার সাথে মরতে হবে। আমাদের কাছে এখন কিছু উপায় আছে। তোমরা কি মনে করো তারা আমাদেরকে এ পথে যেতে দেবে? তোমরা পাগল হয়ে গিয়েছ। দেখো বাবারা, এটা কেবল বিশ্রাম। হে খোদা!

(বাচ্চারা কাঁদছে) *মা, মা, মা, মা, মা, প্লিজ! মা, প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ, আমাদেরকে মেরে ফেলবে না। তোমরা এমন কেন করছো? এটা করো না!*

১৪ নং নারী: *আমরা এসব তোমাদের জন্যই করছি।*

জোনস: *শেষ পর্যন্ত আমরা মুক্ত। আবেগ সরিয়ে ফেলো। বাচ্চারা! এতে কষ্টের কিছু নেই। তোমরা চুপ থাকো। (মিউজিক ও কান্না) তোমাদের মনে হচ্ছে এসব আগে হয়নি। কিন্তু পৃথিবীর সব গোত্র এসব করেছে। সব গোত্র যারা খারাপের মধ্যে টিকে ছিল। আমাজনের সব ভারতীয়রা এ কাজই করছে। তারা কোনো সন্তান নেয় না। তারা সন্তান জন্মালেই মেরে ফেলে। তারা এমন পৃথিবীতে বাঁচতে চায় না। তাই ধৈর্য ধরো। কত চিৎকার শুনছ তাতে কিছু আসে যায় না। এ পৃথিবীতে আরো ১০ দিন থাকার চেয়ে মৃত্যু কোটিগুণ ভালো। তোমরা যদি জানতে তোমাদের জন্য সামনে কী অপেক্ষা করছে তবে আজকের সিদ্ধান্তে তোমরা খুশিই হতে।*

এগুলো হলো জোনসের 'বিপ্লবী আত্মহত্যা'র বিবৃতি। আপনার নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, কাল্টে মানুষ কীভাবে যোগ দেয়? সাইনাইড জেলি বা বিষপানের সাথে আসলেই বুদ্ধিবৃত্তির তেমন কোনো সম্পর্ক থাকে না। জীবনের উদ্দেশ্য খোঁজা, সহানুভূতি সম্পন্ন, গুরুত্বপূর্ণ মনগুলোই তাদের আসল টার্গেট। জোনসের মতোই তারা মানুষকে সমাজ থেকে আলাদা করে রাখে। তাদের অনুভূতি নাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে 'বিশেষ কিছু' বানিয়ে দেওয়া সহজ। তারা এভাবে তাদের টাকা, সময়, যৌন চাহিদা কেড়ে নেয়।

নিয়ন্ত্রণের কাল্ট

কাল্টগুলো খুবই জঘন্য, অসুস্থ চিন্তার মানুষরা চালায়। অনেকে অবশ্য জানেও না। Merriam-Webster's Dictionary অনুসারে Cult মানে হলো, "ধর্মে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এমন একটি ছোট গ্রুপ যাদের বিশ্বাস অধিকাংশ

মানুষের কাছেই ভয়াবহ বলে মনে হয়।" Dictionary.com ভালোভাবে কাল্টকে সংজ্ঞায়িত করেছে:

- উৎসব বা বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উপায়ে আরাধনা।
- নির্দিষ্ট ব্যক্তি, আদর্শ অনুসরণে শারীরিক পরিচর্যার কাল্ট।
- উপাসনা বা সেবার উদ্দেশ্য।
- একদল মানুষ যারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ধর্মকেন্দ্রিক সম্পর্ক স্থাপন করে।
- সমাজবিজ্ঞান। একদল মানুষ যারা বিশ্বাস করে তারা পবিত্র ধর্ম মানে ও পবিত্র চিহ্নের পূজা করে।
- ক্যারিশমাটিক নেতার নেতৃত্বে থাকা একদল ভ্রান্ত চিন্তার, চরমপন্থী, সমাজবিচ্ছিন্ন লোক।
- কোনো ধর্ম বা ধর্মের গ্রুপগুলোর সদস্য।

তো বোঝা গেল, কাল্টকে ধর্মীয় হতে হবে না। একদল লোক হলো কাল্ট যারা কোনো ব্যক্তি বা আদর্শের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পূজা করে। তবে সুসংগঠিত ধর্ম কাল্টের মধ্যেই পড়ে। কোনো ব্যক্তি, এমনকি কচ্ছপের পূজারিরাও কাল্ট হতে পারে।

আমাদের মনোযোগ দেওয়ার বিষয় হলো তাদের কাজ, অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি। পুরোটাই তারা করে থাকে বিবেক নিয়ন্ত্রণ ও আচরণ পরিবর্তনের কিছু পন্থা দিয়ে যেন তারা তাদের অনুসারীদেরকে শৃঙ্খলিত ও তাদের গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে। এসব পদ্ধতি শারীরিক ও মানসিকভাবে ব্যাপক ক্ষতি করে। অনেকের PTSDও হয়ে যায়। তারপরও তারা বাধ্য করে রাখার জন্য এসব করে।

জিম জোনসের মতোই অধিকাংশ কাল্ট নেতা আকর্ষণীয়, ক্যারিশমাটিক ও প্ররোচিত করার প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন। তারা একা, হারিয়ে যাওয়া, গরীব, ব্যতিক্রম, বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে টার্গেট করে। কাল্ট নেতারা মমতাময়ী, প্রবল সহানুভূতি সম্পন্ন, আত্মপ্রশংসায় মগ্ন ও পাগল মনগুলোকে চায়। এখানে মেধা কোনো কাজে আসে না। কাল্ট নেতারা সুন্দর সব বাক্য দিয়ে তাদেরকে বোঝায় যে তারা স্পেশাল, তাদের জীবনের অসাধারণ উদ্দেশ্য আছে ও তারা ক্ষমতাশালী।

আদর্শিক বনাম ব্যক্তিগত

দুই ধরনের কাল্ট আছে। একটি হলো যেখানে একজন নেতা সবকিছু পরিচালনা করে। তিনি সব নীতি নির্ধারণ করেন, আইন প্রণয়ন করেন এবং অবাধ্য হলে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ডেভিড কোরেশ, চার্লি ম্যানসন, জিম জোনসের মতো নেতারা হলেন একেবারে মূলধারার। নিঃসন্দেহে তাদের আদর্শ ও ধর্ম আছে। কিন্তু তাদের সংগঠিত করার ক্ষমতা মারাত্মক। তারা মারা গেলে কিংবা তাদের মন পরিবর্তন হলে কাল্ট জগৎ ধ্বসে পড়বে। হিটলারকেও অনেকে কাল্ট নেতা বলেন। কাল্ট নেতারা ভালো, খারাপ, বিশ্রী, সুন্দর—সবই হতে পারেন। রেটরিক, ব্যক্তিত্ব, আকর্ষণ ক্ষমতা মানুষকে নিজের ও নিজের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজন।

আদর্শিক কাল্ট নিজেদের বিশ্বাসের উপর অধিক ভরসা করে। The Ku Klax Klan সাদা আধিপত্যের একটি কাল্ট। নেতাকে পূজা করা হতো না সেখানে, বিশ্বাসকে করা হতো। সদস্যরা বিশ্বাসকে পুরোপুরি ধারণ করত, যদি সেখানে অপরাধ আর হত্যাও থাকে। বৈষম্য ও ধর্মভিত্তিক কাল্টগুলো আদর্শিক। তাদের নেতা বা নেতাদের কমিটি থাকতে পারে। কিন্তু নেতার মৃত্যুতেও এটি বন্ধ হয় না। রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উন্নয়নমূলক কাল্টগুলো মানুষের চিন্তা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে। সেটা হতে পারে উদারতা বা রক্ষণশীলতা। আপনি ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য কিছু কাজ করলে সেখানেও কিন্তু আপনার পকেটবুকের লিস্ট পাল্টে যাচ্ছে।

প্যাটি হার্স্টের কথা মনে আছে? তিনি ছিলেন Hearst newspaper fortune এর মালিকের বংশধর। Symbionese Liberation Army (SLA) ১৯৭৪ সালে কিডন্যাপ করে। হার্স্টই স্টোকহোম সিন্ড্রমের হাল আমলের উদাহরণ। সে বের হয়ে আসার পর তাদের নির্যাতন, ব্রেইনওয়াশিং নিয়ে তো কথা বলেইনি, বরং তাদের বিপ্লবের পক্ষে ও অপরাধগুলোর পক্ষে সাফাই গাইতে থাকে। সে Giant Show এর ল্যারি কিংকে বলেন, ব্রেইনওয়াশিং এর কোনো কিছুই তার মনে নেই।

হার্স্ট তার Patty Hearst: Her Own Story বইটিতে লিখেছেন, তাকে চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। সে কিছুই দেখতে পায়নি। তারা তাকে একটি বদ্ধ ঘরে রেখে নির্যাতন ও ধর্ষণ করতো এবং তাকে Indoctrination & re-

education নামের একটি প্রজেক্টের আওতায় রাখে। তাকে তার বিলাসী জীবন ও বংশধারার জন্য তারা লজ্জা দিত। ডোনাল্ড ক্লিংক ডি ফ্রিজ ছিল নেতা। সে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করত এবং বারবার বলত যে আমেরিকা কতো খারাপ ও বৈষম্যপূর্ণ। তারা তাকে কর্পোরেট ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের 'নেড়িকুত্তা' ও তার বাবাকে 'শুয়োর' বলে আখ্যায়িত করত। এর সাথে সাথে কিছুটা ভালো আচরণ করা হতো। খাবার, পানি দেওয়া হতো। এভাবে তার মধ্যে স্টোকহোম সিন্ড্রম তৈরি হতে থাকে।

সে ল্যারি কিংকে বলে, "আমি বেশিরভাগ সময় তাদের সাথেই থাকতাম। আমার কোনো স্বাধীন ইচ্ছা ছিল না। আমি তাদের কথাগুলোই ভাবতাম।"

হার্স্ট কেবল বাঁচার জন্য যে তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল তা নয়, বরং তার মনে আবেগ সৃষ্টি হতে থাকে। ধীরে ধীরে সে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, একজন 'মুক্তিযোদ্ধা' হয়ে যায় এবং কালো পোষাক পরে তাদের সাথে ব্যাংক লুট করে। সে নেতাদের আলোচনায় সম্মোহিত হয়ে যায়। সে ভুলে যায় তাকে করা সব জঘন্যতম নির্যাতনগুলোর কথা। সে ক্রমান্বয়ে ভুলে যায় তার নিজের অবস্থান। সে এমন এক দলের অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে যাদের নাম সে আগে কখনো শোনেনি।

প্রায় সব কাল্টেরই ব্যক্তিগত ও আদর্শিক ফোর্স আছে। কিন্তু একটু গভীরে দেখলেই তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও সমালোচনা প্রকাশ পায়। ব্যক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা কাল্টগুলো মিডিয়ায় প্রভাব ফেলতে চায়। কেননা এমন কে আছে যে এমন এক নেতার ফ্যান্টাসিতে থাকে না যে কিনা একাই পুরো জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে?

Scientology

Scientology হলো কাল্টের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতে ব্যক্তি ও আদর্শ-উভয়ের আনুগত্যের সমন্বয় করা হয়। ১৯৫০ সালের দিক থেকে গুরু এল রন হাব্বার্ড সায়েন্স ফিকশনের সাথে ব্যক্তি আত্মোন্নয়ন তুলে ধরেন। মানসিক ব্লক ও ভয়ের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়ায়কে হাব্বার্ড নাম দেন 'Dianetics'। তার বই Dianetics: The Modern Science of Mental Health ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি ক্যামডেন, নিউ জার্সিতে The Church of Scientology প্রতিষ্ঠা করেন ও একে একটি ধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেন।

সায়েন্টোলজি এখন পশ্চিম ও পূর্বের সকল দর্শনের সমন্বয় ঘটাতে চায়। তারা মনে করে, মানুষের আধ্যাত্মিক সব প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক জবাব এভাবেই পাওয়া যাবে।

তবে বিশ্বের অনেক বিশেষজ্ঞই কাল্টকে ধর্মের সাথে মেলাতে চান না। কেননা তারা ব্রেইনওয়াশিং, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে থাকে; যা ধর্মের সাথে যায় না। তাদের সাথে কিছু বিখ্যাত অভিনেতা ও জনপ্রিয় ব্যক্তিরা যোগ দেয়। তারা বিশ্বাস করে, মানসিক পরিবর্তনের এ প্রক্রিয়া হলো আসলে নতুনভাবে ভেবে দেখা। তারা মানুষকে দুশ্চিন্তা ও ভয়ের স্মৃতিগুলো জাগ্রত করতে বলে যেন বারবার মনে করার মাধ্যমে তা যেন হারিয়ে যায়। এটাই তাদের সফলতা। যারা এসব কাল্ট থেকে বের হয়ে যায়, তারা এসব গোপন প্রক্রিয়াগুলো প্রকাশ করে দেয়। এগুলো চার্চের আচরণ না। এসব কাল্টের আচরণ। অনেক ছদ্মবেশী ধর্ম নিজেদেরকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য ভান ধরে।

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে UK Daily Mail Online—এ রিপোর্টার লরা কলিনস সায়েন্টোলজির ৩৫ বছর বয়সী উচ্চ পদস্থ সদস্য ও প্রেসিডেন্টের স্ত্রী ক্যারেন ডি লা ক্যারিয়ারের সাক্ষাৎকার নেন। ততদিনে তিনি এসব থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি প্রথমেই গোপন সংগঠনটির ভয়াবহ নির্যাতনগুলোর কথা বর্ণনা করেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, একটি পুলের চারপাশে টানা তিনমাস ১২ ঘন্টা করে দৌড়াতে বলা হয়। অথবা একটা 'The Hole' নামের স্থানে বন্দি রাখা হয়। সেখানে সে একা একটি পুল রঙ করতে হয়। সেখানে তাকে গোসলের কিংবা কাপড় বদলানোর সুযোগ দেওয়া হয় না। তার বাচ্চাকেও তার কাছে যেতে দেওয়া হয় না। পরবর্তীতে তিনি সন্তানসহ বের হয়ে আসেন। তার সন্তান নিউমোনিয়ায় মারা যায়। ডি লা ক্যারিয়ারের মতে, তার সন্তানকে যথাযথ চিকিৎসা নিতে না দেওয়ায় তার অকাল মৃত্যু হয়েছে।

সেখানে ক্ষমতার দম্ভ দেখানো হতো। তারা সদস্যদের থেকে টাকা তুলতেন। তাদের কাজে কেউ অসহযোগিতা করলেই তার উপর মারাত্মক নির্যাতন নেমে আসতো। আর যারা বের হয়ে যেতে চায়, তারা অনেকেই বের হতে পারে না। তাদেরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হয়। ডি লা ক্যারিয়ারের মতে, "সায়েন্টোলজি হলো ধ্বংসের সুনামী। সেটা আপনার উপর আসে। আর যখন তা

চলে যায় এটি কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবন, ভাঙ্গা পরিবার, দেউলিয়া মানুষই রেখে যায়। তারা মানুষের স্বপ্নকে কেড়ে নেয়।" তিনি জিম জোনসের অনুসারীদের মতো ছিলেন না। সফলভাবে বেড়িয়ে এসেছিলেন।

এমন আরেকটি গল্প আছে টাম্পা বে টাইমসের। ২০১৪ সালের মার্চে Scientology Clergy Force a Mother to Choose: Son or Daughter, শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। রিপোর্টার জো চাইল্ড সাবেক চার্চ সদস্য সারা গোল্ডবার্গের সাক্ষাৎকার নেন। তিনি তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজি হননি বলে তাকে অনেকবার শাস্তি দেওয়া হয়। তার সন্তানের নাম নিক। সে সায়েন্টোলজির চার্চেই বড় হয়েছে। পরবর্তীতে সেও কিছু তথ্য বের করে দেয়। কিন্তু তার মেয়ে কাল্টেই আছে। তিনি তার কন্যাকে বাদ দিয়েই কেবল ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

সায়েন্টোলজি চার্চের নেতারা যেসকল ব্যক্তি তাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি হয় না তাদেরকে তুমুল মানসিক ও অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন করে। এদেরকে "SP" বা Suppressive Person বলা হয়। তারা নিজেদের মধ্যেই সামাজিক হতে চায়। তারা অনেককেই সায়েন্টোলজিস্ট হিসেবে চাকুরি দেয় ও বাকিদের ব্যবসাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। বিচ্ছিন্নতা কেবল অসামাজিকই করে না বরং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও ঘটায়। তাদেরকে পাপমোচনের আশ্বাস দেওয়া হয়। সায়েন্টোলজিস্টরা একেই অমরত্বের রাস্তা মনে করে। SP ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগুলোকে তারা বহিষ্কার করে।

অবশ্য সব সায়েন্টোলজিস্টরা এক নয়।

৭টি চিহ্ন ও বেথানির গল্প

বোজ হ্যারিংটন The Atlantic Online-এ লেখা তার বিখ্যাত প্রবন্ধ "The Seven Signs You're in a Cult,"-এ কাল্টে মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তার দূর্দশার একটা ধারণা পাই। হ্যারিংটন নিজেই IHOP (International House Of Prayer)-এ সংযুক্ত একটি ধর্মীয় গ্রুপের সাথে ছিলেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। হ্যারিংটনের সবচেয়ে ভালো বন্ধু বেথানি লিডলিনের আত্মহত্যার জন্য এ কাল্ট দায়ী। তিনি অনেক পরে বুঝতে পারেন যে এটি একটি কাল্ট। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। তারা দুই বন্ধু টেক্সাসে Southern

University-তে পড়ালেখা করেছেন। IHOP-এর প্রতিষ্ঠাতারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কাল্টের পার্থক্য বোঝাতে একটি লিস্ট করেছে:

- যুক্তিবাদী চিন্তার বিরোধীতা।
- সদস্যদের সমাজবিচ্ছিন্ন করে রাখা ও ছেড়ে যেতে বাধা দেওয়া।
- মূল বইয়ের বাইরে আলাদা আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা।
- অযৌক্তিক আনুগত্য চাওয়া।
- পারিবারিক বন্ধনকে অশ্রদ্ধা।
- ব্যক্তিগত মালিকানা, যৌন পবিত্রতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাইবেলকেও ছাড়িয়ে যাওয়া।
- চার্চ থেকে সরে আসা।

সময়ের সাথে সাথে তারই সহপাঠী টেইলার ডিটন ধীরে ধীরে একে কট্টর খৃস্টীয় বিশ্বাস অর্থাৎ কাল্টের দিকে নিয়ে যান। টেইলরকে অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের দাবি করা হ্যারিংটন অনেক উৎসাহিত হন। তিনি মনে করতে থাকেন যে তিনি আরো অসাধারণ কিছু করতে পারেন। তিনি বলেন, "আমি একা ও বিরক্ত ছিলাম। স্কুল ছাড়ার আগেই আমি অসাধারণ কোনো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিলাম। হিরোর মতো কাজ, রহস্য উদঘাটন বা সিনেমার মতো প্রেম।" ডিটনের কাজ ছিল ঠিক এমনই একটা দুঃসাহসিক অভিযান। সে আরো বলল, "আমি আমার জীবনে এমন কিছুই খুঁজছিলাম। টেইলর আমাকে সে সুযোগ এনে দিলো"।

দুঃখজনকভাবে গল্পটি তার সেরা বন্ধুর আত্মহত্যা দিয়েই শেষ হয়। সেখান থেকে হ্যারিংটনকে দূর্বল অন্তরের মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করে আলাদা করে রাখা হয়। কেউ কথা বলত না তার সাথে। এটাও একটা বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া। হ্যারিংটন গ্রুপে ফিরে আসে। তারপরই সে যেন পরিষ্কার এ গোপন সংগঠনটির সব ন্যাক্কারজনক কাজগুলো দেখতে পায়। এসব কিছু নেতারাই করে। সাধারণ নিরীহ চাহনিকেও অনেক সময় ভয়ঙ্কর ভাবা হতো। টেইলর দাবি করত, স্রষ্টা তার সাথে কথা বলেন ও তাকে নির্দেশ দেন।

বেথানি টেইলরের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে ও একসময় এসব জঘন্য কাজে অংশ নেয়। হ্যারিংটনকে আবার বের করে দেওয়া হয়। কাল্ট ও তার বন্ধু তাকে পরিত্যাগ করে। তারপরই সে বেথানির মৃত্যুসংবাদ পায়। গোয়েন্দা রিপোর্ট

অনুসারে, টেইলরের অনুরোধে মিকাহ নামের একজন সদস্য বেথানিকে হত্যা করে।

এটা আত্মহত্যা ছিল না।

হতে পারে জোনসটাউনেও সুইসাইড ঘটেনি। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি শব্দ, আবেগ, আধ্যাত্মিকতা দিয়ে একদল মানুষকে তার ইচ্ছামতো কাজ করতে বাধ্য করেছে। টেইলর একটি হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। কিন্তু জোনস তার ক্ষমতা দিয়ে অসংখ্য মানুষ হত্যার জন্য দায়ী। কেউ একবার আকৃষ্ট হয়ে গেলে তার উপর মানসিক, শারীরিক, যৌন নির্যাতন করা সম্ভব। অনেকে তা খুশিমনে মেনেও নেয়। তারা তাদের নেতার স্পর্শকে স্রষ্টার স্পর্শ ভাবে।

আমরা এক অধ্যায়ে তিনটি শক্তিশালি বিষয়ের আলোচনা করেছি।

- **Logos:** চিন্তা, কল্পনা ও যুক্তির ব্যবহার।
- **Pathos:** শ্রোতাকে আবেগী করে দেওয়া।
- **Ethos:** বিশ্বস্ততা, কর্তব্যপরায়ণতা ও পারদর্শীতার এক চিত্র হাজির করা।

প্রভাবশালী কাল্ট নেতারা একাজগুলো করে। তারা মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নও করে। সেটা হতে পারে সব অনুসারীকে একটি বনে আলাদা করে রাখা অথবা কোনো দোষীকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে রাখা। কেবল কাল্টেই না, বরং মৌলবাদি চার্চেও এসব প্রয়োগ করা হয়। অনেকের গল্পই শোনা যায় যারা একাকীত্ব থেকে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল।

অনেক সাবেক কাল্ট সদস্যরা মানুষের মানসিক শক্তি ধ্বংস করা ও আনুগত্য অর্জন করার জন্য বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কথা বলেছেন। কিন্তু কাল্টকে অনেক সময় সে পর্যায়ে নাও যেতে হতে পারে। অনুসারীদের এতটুকু বোঝানোই যথেষ্ট যে তারা স্পেশাল। তাদের জন্য বিশেষ কিছু অপেক্ষা করছে। তারা সঠিক স্থানে সঠিক চাল চেলে দেয়। সবার জন্য সবকিছু প্রযোজ্য নয় তা তারা জানে।

"Obey Your Father: Jim Jones Rhetoric of Deadly Persuasion," বইয়ে লেখক জ্যাকব নেইবর বিষয়টি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আসলে আদর্শ কিংবা বাঁধা—কোনোটির উপরই একটি কাল্টের শক্তি নির্ভর করে না। বরং তার শক্তি নির্ভর করে অনুসারীদের

যোগ্যতার উপর"। কোনো কাল্টই অনুসারীদের শারীরিক বা অর্থনৈতিক ত্যাগ ছাড়া টিকে থাকবে না। তিনি আরো লিখেছেন, "জোনসের অনুসারী অন্তর্ভুক্তির ভয়াবহ চাহিদা থেকে সে মানুষের যোগ্যতা ব্যবহার করার চিন্তাটা বের করে আনে। যত বেশি মানুষকে সে প্রভাবিত করতে পারছিল তার ক্ষমতা ততই বাড়ছিল। এগুলোই জোনসকে ক্ষমতার পাগল করে দেয়। নিজের Ethos ও অনুসারীদের Solus ব্যবহার করে সে অপ্রতিরোধ্য কাল্ট নেতা হয়ে উঠতে থাকে।"

জনবিচ্ছিন্ন করে রেখে কাল্ট নেতারা আরো রেটরিক শেখানোর সুযোগ পান। জোনস নিজের আধ্যাত্মিকতা জাহির করছিল। সে বলছিল যে সে স্রষ্টার দূত। সে মানুষকে বাঁচাতে পারবে, স্বর্গের সন্ধান দিতে পারবে। পৃথিবীতে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের উদাহরণ দিত সে। সত্যি বলতে অসংখ্য মানুষ এমন ধর্মগুরুদের ধোঁকার শিকার ছিল।

নেইবর আরেকটি যে পয়েন্ট বলেছেন তা হলো, একজন সত্যিকার ক্যারিশমাটিক নেতা নিজের প্রতি নির্ভরশীলতা তৈরি করেন। ফলে অনুসারীদের স্বাধীন ও যৌক্তিকভাবে চিন্তার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। জোনস তাদেরকে আলাদা করার কারণ হিসেবে বলেছিল যে বিশ্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে সুন্দর একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে, নিজস্ব Ethos কাজে লাগিয়েছে ও অনুসারীদের শক্তি ও টাকা ব্যবহার করে সে আরো ক্ষমতাবান হয়েছে। সে মানুষকে আলাদা রাখতো যেন অন্যদের সংস্পর্শে এসে তারা সত্যিকার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে না পারে। নিঃসন্দেহে এদের অনেকেরই স্টোকহোম সিন্ড্রোম তৈরি হয়েছে। এতো নির্যাতনও তারা এজন্য মেনে নিয়েছে। সাথে আধ্যাত্মিক কারণ তো আছেই। তারা মনে করা শুরু করে যে তাদের নেতারা তাদেরকে ভালোবাসে, তারাই তাদের অভিভাবক ও তারা এমন সময় তাদেরকে (অনুসারীদেরকে) আঁকড়ে ধরেছে যখন তাদের পাশে কেউ ছিল না। ফলে তারা তাদের জন্য পরিবার, সমাজ, সন্তান, ব্যবসা—সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা নেতাদের মাঝেই বিলীন হয়ে যায়। যতক্ষণ তা তারা কোনো বাস্তবতা বা ঘটনার সম্মুখীন না হয়, তারা এ বিভ্রান্তি থেকে বের হতে পারে না।

Groupthink ও চিন্তার ছক

কাল্ট জনবিচ্ছিন্ন হলেও অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তোলে। কাল্টে বিভিন্ন আচার কৃষ্টিসহ নিজেদের সাধারণ লক্ষ্য, বিশ্বাসের আলোচনা, যোগাযোগ ও সামাজিকতা তাদের মধ্যে এক অন্যরকম বন্ধন সৃষ্টি করে। গ্রুপ ডায়ানামিকের অংশ হওয়ার জন্য মানুষ তার নিজের চিন্তা ও আদর্শের বাইরে গিয়ে হলেও কাজ করে। নিজেদের ব্যক্তিত্ব পাল্টে ফেলে।

গ্রুপের বাইরে কাজ করলে যে কেবল শাস্তি পাবে তা নয়, বরং একইসাথে কাজ করা সঙ্গীরাও তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বাজে ব্যবহার করে। কেননা মূল আনুগত্যের স্থান তো কাল্ট। সে এমন কেউ হতে পারে যে কিনা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছে, সত্যকে চিনতে পেরেছে। এমন আচরণের ফলে সে গ্রুপের পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পেয়ে যায়। অনেকেই ট্রমা থেকে বেরোতে পারে না। সাংঘর্ষিক সম্পর্কে থাকা গ্রুপগুলো সুক্ষভাবে নিজেদের সমস্যা মোকাবেলা করে। একে অপরকে মৃত্যুর হুমকিও দেয়। সবই নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে।

১৯৭২ সালে Victims of GroupThink বইটির লেখক ইরভিং জেনিস Groupthink শব্দটির জন্ম দেন। তিনি এ শব্দ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রুপের চাপে মানুষ তাদের ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ অনেক সময়ই এগুলোর কোনো যৌক্তিক ভিত্তি থাকে না ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর চিন্তাশক্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তারা অনেকসময়ই বিকল্পকে অস্বীকার করে এবং অন্য গ্রুপকে মানুষের কাতারেই ফেলে না। জেনিসের মতে, এ সমস্যাগুলো তখন প্রবল হয় যখন সদস্যরা একই ক্যারিয়ারের মানুষ হয় ও তারা অন্য কোনো চিন্তার সংস্পর্শ পায় না। তাদের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।

জেনিসের মতে, Groupthink এর ৮টি বৈশিষ্ট্য আছে।

- **অস্তিত্বের বিভ্রান্তি:** তারা ভয়াবহ আশাবাদী। ফলে তারা অবাস্তব সব ঝুঁকি নেয়।
- **যুক্তির অভাব:** তারা কখনোই দুইবার ভাবে না।
- **বিশ্বাসের নৈতিকতা:** 'বিশ্বাসই আসল, কাজ নয়' নীতিতে বিশ্বাসী। কাজে নৈতিকতার ধার ধারে না।

- **অন্য গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা:** 'শত্রু' গ্রুপ নিয়ে ভ্রান্ত চিন্তা অপ্রয়োজনীয় সংঘাতের দিকেও নিয়ে যায়।
- **চিন্তার ব্যাপারে চাপ:** অন্য গ্রুপের চিন্তার পক্ষে যুক্তি দেখানো একেবারেই নিষিদ্ধ।
- **নিজের মধ্যে গুটিয়ে ফেলা:** গ্রুপের চিন্তা সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহ প্রকাশ না করা।
- **সার্বজনীন বিভ্রান্তি:** অধিকাংশের রায়কে সার্বজনীন রায় মনে করা।
- **নিজেদের মতো শৃঙ্খলা:** বিভ্রান্তিকর যে কোনো তথ্য নেতাকে না জানানো। এমন তথ্যও যা গ্রুপের চিন্তার বাইরে যায়।

এ ধরনের চিন্তা রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে কাল্ট পর্যন্ত সবাই করে। এ ধরনের চিন্তাধারার মানুষ এক হলে জনসাধারণের জন্য অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। স্বেচ্ছাচারিতা জন্ম নেয়। যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কাল্টে যুক্ত হয় তারা প্রত্যেকেই স্বেচ্ছাচারিতা লালন করে। ডাকাত মানসিকতা তৈরি হয়।

তারা যায় বা যেতে বাধ্য হয়। তারা মনে করে তাদের সবকিছুই ব্যতিক্রম হবে। কারণ তারা স্পেশাল।

এলিয়েন ও স্বর্গের দরজা

১৯৯৭ সালের মার্চে যখন পুলিশ ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যাংকো সানটা ফিতে Bo & Peep নামে পরিচিত মার্শাল আপেলহোয়াইট ও Do & Ti নামে পরিচিত বোনি নিটলস পরিচালিত কাল্ট থেকে ৩৯ সদস্যের লাশ উদ্ধার করে তখন The UFO Millennial cult Heaven's Gate নামে একটি শিরোনাম আসে। The Heaven's Gate কাল্টটি মূলত একদল মানুষের কাল্ট যারা মনে করত যে তারা এলিয়েনদের সাথে যোগ দিয়ে একসময় Comet Hale-Bopp এ সফর করতে পারবে। তারা বিশ্বকে খালি করতে চাইত। মার্শালের নীতি অনুসারে তারা আপেল সসের সাথে ফেনোবার্বিটাল যুক্ত করে ভদকা দিয়ে পরিষ্কার করতো। তারপর তাদের মাথায় প্লাস্টিক ব্যাগ রাখত।

এরপর ৯,২০০ স্কয়ার ফিট জায়গায় তাদের লাশ পাওয়া যায়। তাদের চেহারা ও শরীরের উপরের অংশ বেগুনী রঙা কাপড়ে ঢাকা ছিল। প্রত্যেকের পকেটেই ৫ ডলার ৩ কোয়ার্টার দামের গ্রহ সংযোগের ডিভাইস ছিল। তাদের

গায়ে একেবারে নতুন পোষাক, কালো শার্ট-প্যান্ট ও Heavens Gate Away Team লেখা ব্যান্ড ছিল।

এদের প্রত্যেকের বয়স ছিল ২৬ থেকে ৭২ এর মধ্যে। তারা মনে করত এভাবে তাদের আত্মা এলিয়েনদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। বিষয়টি হাস্যকর হলেও ঘটনাটি সত্য। তাদের মধ্যে ৩৯ জন আসলেই মার্শাল ও নিটলসের ক্যারিশমা ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস করতো (আরো দুজন ছিল যারা মৃত্যুর আরেক দিন বেছে নিয়েছিল)। তাদের স্বজনরা এসব বুঝবে না। কিন্তু তাতে কিছু করার নেই। মার্শাল ও নিটলস ১৯৮৫ সালে মারা যান। তাদের অনুসারীরা মানুষের চেয়েও মহান কিছুর অংশ হতে চেয়েছিল। তারা পৃথিবীর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতো।

মৃত্যুর সাথে আত্মার মুক্তির সংযোগে অনেক কাল্টই বিশ্বাস করে। তাদের অনুসারীরা এসব বিশ্বাসও করে—যদিওবা আমাদের কাছে এগুলো হাস্যকর। The Heaven's Gate কাল্টের সদস্যরা গর্দভ ছিল না। বরং তারা কম্পিউটার ও প্রযুক্তিতে দক্ষ ছিল। সে এলাকায় যারা থাকে (যেমন সহলেখক ম্যারি) তারা স্বীকার করেছে যে সে মানুষগুলো খুবই দয়ালু ও একেবারেই স্বাভাবিক ছিল। তারা সামাজিকভাবে তাদের উন্নতির জন্য কাজ করতো। কিছু একটা তাদেরকে সেই দুজন ব্যক্তির কথায় আস্থা রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা এলিয়েন ও তাদের আত্মার মুক্তির কাল্পনিক গল্পে বিশ্বাস করেছিল। নির্ভীক নেতা মার্শাল খুব স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেন। ১৯৭২ সালে তার নিটলসের সাথে দেখা হয় ও জীবন বদলে যেতে থাকে। তারা আধ্যাত্মিকতা ও মেটাফিজিক্যাল বিষয়াশয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তারাই স্রষ্টা মনোনীত ব্যক্তি। তাই তারা প্যাসিফিকে ফুল তোলার জন্য ভ্রমণে যান। নিটলসের মৃত্যুর পর মার্শাল ও তার অনুসারীরা এলিয়েনদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। যদিও সে আত্মহত্যা থেকে একজন বেঁচে গিয়েছিল তারপরও বোঝা যায়নি কীভাবে মার্শাল তার মেধাবী অনুসারীদেরকে প্ররোচিত করেছিলেন। তবে গবেষকরা বলেন, তিনি তার ক্যারিশমা, প্রজ্ঞা ও রেটরিক ব্যবহার করেছিলেন। সাথে ছিল বিশ্বাস—যা আসলেই শক্তিশালী অস্ত্র। তিনি বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বকেও তার কাজের জন্য ব্যবহার করেছেন। তিনি ও তার সহযোগীরা

নিজেরাই একটি ধারণা নিয়ে কাজ করেন। এর কারণে তারা মনে করতেন পৃথিবীর এক নাটকীয় ধ্বংসে তারা ভূমিকা রাখতে পারবেন।

তারা খুবই বাধ্য অনুসারী ছিলেন। বহির্বিশ্বের সাথে তাদের যোগাযোগ সীমিত ছিল। বাইরের কারো আগমনের ক্ষেত্রেও যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হতো। মার্শাল একনায়ক ছিলেন না। তিনি তাদের বাবার মতো দিকনির্দেশনা দিতেন। সদস্যরা নতুন অস্তিত্বের জন্য বিভিন্ন স্থানে আত্মহুতি দিয়েছিলেন। হোক সেটা ক্যাম্পগ্রাউন্ড কিংবা বুট ক্যাম্প। মা দিবস বা বাবা দিবসের মতো দিনগুলোতে সদস্যরা পরিবারের কাছে যেতেন। স্বাধীনতা ও বন্দিত্বের এ সমন্বয় ভালোভাবে তাদের ধারণাকে আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করেছে।

সব বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে কঠিন বা সরাসরি বা দমন পীড়নের হতে হয় না। দয়ার সাথে তাদেরকে হত্যা করো এবং তাদের জীবন ও সম্পদের দিকে নজর রাখো—এ নীতিতে মার্শাল কাজ করতেন। কিছু কিছু কাল্ট তো বাকস্বাধীনতাও স্বীকার করে। তবে তা নেতার বেঁধে দেওয়া সীমা পর্যন্ত। জোর করে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে বিশ্বাস করানো, "আমেরিকা বনাম অন্য সবাই" মানসিকতা তৈরি করার ফলে বলির পাঁঠা জনগণ সাধারণ মানসিক স্থিতি হারিয়ে ফেলে।

কাল্টবিরোধী মনোবিজ্ঞানী মার্গারেট সিংগারের মতে, দোষারোপ ও ভয়ের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালোভাবে মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পারিবারিক, সামাজিক, অতীতের কাজকর্মসহ অনেক ব্যাপারেই দোষারোপ করা যায়। এগুলো ধর্মীয় কাল্টগুলোর ভালো অস্ত্র। তারা মানুষের পাপ ব্যবহার করে তা মোচন করার ও আত্মাকে মুক্ত করার ঠিকাদারি নিয়ে নেয়। তাদেরকে খোদা ও নেতৃত্বের ভয় দেখানো হয়। যেভাবেই হোক, নিয়ন্ত্রণ হাতে চলে আসবে তা নিশ্চিত।

অনেক সময়ই আরো সহজ পন্থায় এ কাজ করা হয়। সিংগারের মতে, কাজগুলো ধীরে ধীরে করা হয় যেন কাল্ট সদস্য তার মধ্যকার ও আশেপাশের পরিবর্তন বুঝতে না পারে। সে যখন বুঝতে পারে, তখন সে এর সাথেই চলতে চায়। কেননা বাকি সবাই এভাবেই চলছে। একসময় তার আচরণে নির্ভরশীলতা প্রকাশ পেতে থাকে ও সে নেড়িকুকুরের মতো পুরোপুরি বাধ্য হয়ে যায়। একজন ব্যক্তি ও নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মানুষ হিসেবে চলাটা কেমন হয় ভিক্টিম তা সম্পূর্ণ

ভুলে যায়। মানুষের শান্তিপ্রিয় স্বভাব ও স্বভাবগত শ্রদ্ধাকে দাসত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, আবেগ ও যৌনতার দিক থেকে একজন মানুষকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়, কোনো বাধা ছাড়াই।

১৯৬১ সালে আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ও লেখক রবার্ট জে লিফটন যুদ্ধ ও সংঘাতে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করেন। তিনি তার বই Thought Reform and the Psychology of Totalism-এ বিবেক নিয়ন্ত্রণের কাল্টের ৮টি প্রকার চিহ্নিত করেন।

- **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ:** Milieu হলো ফ্রেঞ্চ শব্দ যার অর্থ হলো পরিবেশ। কাল্টের নেতারা বিচ্ছিন্নতা ও নতুন তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে তাদের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তারা তাদেরকে বাইরের সব তথ্য থেকেও আলাদা রাখেন। অন্য তথ্য মাথায় থাকলে নির্দিষ্ট দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই তারা এ কাজ করেন।
- **আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণ:** কাল্টগুলো তাদের কাজের জন্য স্রষ্টাকে ব্যবহার করে। তারা যদি অবাধ্য হয়, স্রষ্টা শাস্তি দেবেন। তারা ভালো থাকলে স্রষ্টা পুরষ্কার দেবেন। না খেয়ে থাকা, গান, ঘুম বাদ দেওয়া—এসবকিছু সদস্যদের একটি আধ্যাত্মিক মানে উন্নীত করে যার ফলে তাদের নিজেদেরকে বিশেষ কিছু মনে হয়।
- **পবিত্রতা:** দেহ-মনের পবিত্রতা। সকল 'খারাপ' বিষয় বাদ দিতে বলা হয়। তাদের দৃষ্টিতে যৌনসঙ্গমও খারাপ। (কিন্তু নেতারা এসব অনেক বেশি করে!)
- **স্বীকারোক্তির কাল্ট:** খুব দ্রুত দোষ স্বীকার করতে হয়। তারা পাপমোচনে কাজ করে। সাথে সাথে সদস্যদের পাপকে নেতারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশেও কাজে লাগায়।
- **পবিত্র বিজ্ঞান:** কাল্টের মতাদর্শই একমাত্র পবিত্র ও সত্য। মানুষের নৈতিকতার এটাই একমাত্র সংস্করণ। একে প্রশ্ন করা যায় না।
- **কঠিন ভাষা:** যেকোনো বিভ্রান্তি ও বিতর্ক নিরসনে ভারী ভারী বাক্য ব্যবহার করা হয়। এ ভাষাই সত্যের মুখ বন্ধ করে। তুমি হয় মেনে নাও নয় আলোচনা শেষ। শব্দ খুব ভালো মানসিক অস্ত্র।

- **মানুষের উপর মতাদর্শ:** ডকট্রিন বা মতাদর্শই সত্য। বাস্তবতা ভুল হতে পারে, কিন্তু মতাদর্শ না। মানুষ যুক্তিকেও আদর্শ অনুসারে বদলে নেয়। ব্যক্তির চেয়েও কাল্টের আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ।
- **অস্তিত্বের বন্টন:** কাল্টই ঠিক করে কে থাকবে আর কে থাকবে না। ভালো ও খারাপের দ্বন্দ্বে কাল্টই সর্বেসর্বা। অনেক আন্দোলনেরই এটাই মূল বার্তা ছিল। নাজি জার্মানিতেই দেখুন। ছোট ছোট মতপার্থক্যেই মানুষ খুন হতো।

কাল্টের যেকোনো নীতিই যেকোনো রাজনৈতিক মহল গ্রহণ করতে পারে।

সহিংসতার প্রসার

কাল্ট, রাজনৈতিক দলগুলোর মতো সহিংসতাকে বিশ্বাসের অংশ করে নেয়। সদস্যরা স্বেচ্ছায় কাজ করে। এমনকি তাদের পরিবার হত্যার মতো কাজও। অনেক কাজের জন্য সহিংসতা খুব প্রয়োজন।

চার্লস ম্যানশন ও ডেভিড কোরেশ এমনই কালতের উদাহরণ।

১৯৯৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী, The Branch Davidians এর সাথে নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষ হয়। সেখানে ১৭ শিশু ও কাল্ট নেতা ডেভিড কোরেশসহ ৭৬ জন নিহত হয়। ডেভিড কোরেশ ১৯৮২ সালে কাল্টে যোগ দেন। ১৯৯০ সালে তিনি নাম পরিবর্তন করেন। টেক্সাসের ওয়াকোতে গিয়ে তিনি নিজেকে নবী দাবি করতে থাকেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন গায়ক। তিনি তার দুই ডজন অনুসারীসহ ওয়াকোর পাশে অবস্থান নেন। দুই বছর পর তিনি প্রাক্তন নেতাদেরকে নিয়ে Mount Carmel Center Camp প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেখানে নতুন নাম নেন।

বাইবেলে উল্লেখিত রাজা 'ডেভিড' ও পারস্যের সাইরাস দ্য গ্রেটের অনুসরণে 'কোরেশ' নাম রাখেন। কোরেশ নিজেকে মাসীহ দাবি করতো ও ঐশ্বরিক দাবি নিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতো। কিন্তু ধর্ষণ, শিশু নির্যাতন ও অস্ত্র মজুদসহ অনেক অভিযোগেই ATF এজেন্টদের সাথে তার সংঘর্ষ হয়। ৫৩ দিনব্যাপী অবরোধ ও সংঘাতের পর ১৯ এপ্রিল ভয়াবহ ফলাফল নিয়ে এ সংঘাত শেষ হয়।

অবশ্য কোরেশ একজন সরকারবিরোধী হিরো হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক কাল্ট নেতাদের মতো। তারা এমন ভাব করেন যেন বিশ্ব

ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ও কেবল তারাই একে বাঁচাতে পারেন। কোরেশ তার ক্যারিশমা ও ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করেছেন, সাথে দিয়েছেন একটু আধ্যাত্মিকতার ঘ্রাণ। মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি কুমারি ও বিবাহিত নারীদের সাথে আধ্যাত্মিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। অনেকের মতে, কোরেশ আশাবাদি একজন মানুষ। তিনি মিউজিকে সফল হননি, তাই তিনি অন্য রাস্তা বেছে নিয়েছেন। তিনি মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

তিনি একজন 'অহিংস' মানুষ যিনি সংঘাত চান না। কিন্তু তার অনুসারীদেরকে উৎসর্গ করেন। এ আর এমন কী! চার্লস মিলস ম্যাডক্স পরবর্তীতে চার্লস মিলস ম্যাসন নাম ধারণ করেন। তার অপরাধ জীবন শুরু হয় ৯ বছর বয়স থেকে। তখন সে কার চুরি করেছিল। তিনি অনেকবারই জেলে গিয়েছেন। শেষমেশ ১৯৬০ সালে ম্যাকনিল আইল্যান্ড পেনিটেনটিয়ারিতে তিনি মা বার্কার গ্যাংয়ের সাবেক সদস্য আলভিন ক্রিপি কার্পিসের দেখা পান। সে তার থেকে গিটার বাজানো শেখে। ম্যাসন তার গিটার নিয়ে এতোটাই আচ্ছন্ন ছিল যে সে তার অনুসারী টেরি মেলকারকে হত্যা করে। টেরি তার মিউজিক জীবন শুরু করছিল সবে।

ম্যাসন পরবর্তীতে স্যান ফ্র্যান্সিসকো হাইট আশবারিতে কিছু অনুসারী নিয়ে অবস্থান নেয়। নিজেকে সে 'গুরু' নামে আখ্যায়িত করে। এরা তার উদ্দেশ্য জানত। লঞ্জ এঞ্জেলেসের স্যান ফ্রান্সিসকোর উত্তরে ক্যালিফোর্নিয়ার স্পান র‍্যাঞ্চে সে অবস্থান নেয়। সেখানে সে স্যাটানিজম ও সায়েন্টোলজি থেকে দর্শন ধার করে স্বতন্ত্র আদর্শ প্রচার করতে থাকে। এমনকি সে Helter Skelter গানও গাইতো। ১৯৬৯ সালে হঠাৎ কালোরা সাদাদেরকে হত্যা করতে থাকে। তখন ম্যাসন কালোদের পক্ষ নিয়ে একে আরো সহিংস করে তোলেন।

ম্যাসন তার অনুসারীদের 'পরিবার' বলে সম্বোধন করত। সে ভাবত টেরি তার অনুসারীদেরকে ভাগিয়ে নিচ্ছে। সে ও টেরি একসাথে গাইত। পরে সে টেরিকে হত্যা করে। কিন্তু তার অনুসারীরা লস এঞ্জেলসে ১০০৫০ চিলো ড্রাইভে গিয়ে টেরিকে পায় না। কেননা সে সেখানে থাকত না। এদিকে ম্যাসন পরিবারের চারজন নায়িকা শ্যারন টেট ও তার গর্ভের বাচ্চাকে হত্যা করে। তার স্বামী রোমান পোলান্সকি তখন ইউরোপে ফিল্ম পরিচালনা করেছিলেন।

১৯৬৯ সালে খুনিরা আটক হয়। ১৯৭০ সালের প্রথমে ম্যাসন আটক হয় ও হত্যা, হত্যার নির্দেশ, হত্যাচেষ্টার দায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৯৭২ সালে অনেকের ফাঁসি হলেও ম্যাসন এখনো করকোরান জেলেই আছে।

প্রশ্ন এটা না যে 'কীভাবে' হলো। প্রশ্ন হলো 'কেন' হলো। একজন রক্তের নেশায় উন্মাদ মানুষও নিজের দাসত্বে অন্যকে আকর্ষণ করে ফেলছে। হত্যাকাণ্ডেও জড়িত করছে। নিরীহ মানুষের রক্ত দিয়ে তারা হাত রঞ্জিত করেছে। কোরেশ ও ম্যাসন—উভয়ই তাদের সদস্যদেরকে বলত যে স্রষ্টা তাদেরকে পছন্দ করেছেন। এভাবে তারা তাদের পছন্দকে স্রষ্টার উপর আরোপ করে তাদের আচরণও বদলে ফেলত। শুধু কাল্টেরই এমন ক্ষমতা আছে। তারা ভালোবাসার সাথে সদস্য নেয়, কিন্তু শীঘ্রই তা নির্যাতন, প্রভাব বিস্তারে রূপ নেয়। শেষমেশ, আচরণ, চিন্তা, আবেগ ও কাজের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন। এরা সবচেয়ে ভয়ংকর কাল্ট।

ডিপ্রোগ্রামিং ও বেরিয়ে যাওয়া

আপনি কি বেরিয়ে যেতে পারবেন? যদি ব্রেইনওয়াশিং ও বিবেক নিয়ন্ত্রণ কাল্টে যোগদানের কারণ হয়, আপনি কি এসব থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারবেন?

মানুষ যখন বোঝে যে তার পরিবার, জীবনের ক্ষতি হচ্ছে তখন সে কাল্ট থেকে বেরিয়ে আসে। তারা ভণ্ডামি ও দূর্নীতি দেখেও বেরিয়ে আসে। তারা বেরিয়ে আসে যখন তারা তাদের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আবিষ্কার করে। অনেকসময় নিয়ম ভেঙে ফেলা কিংবা কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যও তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়।

কিন্তু সায়েন্টোলজিতে দেখেছি, তারা চিহ্ন ছাড়া বেরোতে পারে না। যারা এসব প্রভাব, হতাশা, নির্যাতনের শিকার হয়েছে বছরের পর বছর, তাদের অনেকেই PTSD-তে আক্রান্ত। তাদের লজ্জা, অপরাধবোধ, অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা তো বাদই দিলাম। তাদের স্মৃতিতে কিছু বার্তাসহ কিছু চরিত্র বেঁচে থাকে। তাদের কাল্ট নেতাদের প্রতি যে নির্ভরতা তৈরি হয় তা থেকে বের হতে অনেক বেশি কষ্ট হয়।

মানসিক আঘাত অনেক সাধারণ। অনেক সাইকোলজিস্ট বলেছেন যে অনেক চিকিৎসার পরও তারা সে ট্রমা থেকে বের হতে পারেন না। এমনকি নতুন করে সৃষ্টি হওয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও।

অবশ্য ডিপ্রোগ্রামিংয়ের একটি বাজে অতীত আছে। যখন পরিবারগুলো তাদের আত্মীয়দের কিডন্যাপ করে আটকে রাখত তখন তাদেরকে কাল্টের প্রভাব থেকে বের করে আনার জন্য ডিপ্রোগ্রামিং করা হতো। ১৯৭০ এর দিকে যখন কেউ কোনোভাবে কাল্ট থেকে বেরিয়ে আসত তখন তার বন্ধু বা পরিবার তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করত। কাল্টের সকল চিন্তা-চেতনা থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে নতুন চিন্তায় দীক্ষিত করাই ছিল এর মূল কাজ। অনেক সময় দেখা যেত যে ডিপ্রোগ্রামাররা নিজেই সাবেক কাল্ট সদস্য ছিলেন। তাই তারা এ ধরনের মানুষদের সাথে ভালোভাবে আচরণ করতে পারতেন। সমস্যা হলো, অনেক কাল্ট সদস্যরা এমন পলায়নকে সমর্থন করেননি। অনেকে ফিরেও গিয়েছে!

টেড প্যাট্রিক হলেন ডিপ্রোগ্রামিংয়ের পথিকৃৎ। তিনি তার পদ্ধতির সহিংসতার জন্য বিতর্কিত ছিলেন। তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তার মতে, তিনি তার সন্তান কাল্টে থাকার সময় এসব শিখেছেন। তিনি এখন ডিপ্রোগ্রামিংয়ের আদিপিতা। তার পরিবার আক্রান্ত সবাইকে সাহায্য করত। নাগরিক আইন না মানা, কঠোর পদ্ধতি, ধর্মীয় সহিংসতা ইত্যাদি অনেক অভিযোগ ছিল তার নামে। তাকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তিও পেতে হয়েছিল। তার পাঁচ ধাপে এ কাজ করত।

- কাল্ট নেতা ও কর্তৃপক্ষকে হেয় করা।
- বিপরীত আদর্শ দেখানো ও কাল্টের ভণ্ডামি তুলে ধরা।
- ডিপ্রোগ্রামারের কথা শোনার প্রবণতার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির দূর্বল পয়েন্ট খুঁজে বের করা।
- ব্যক্তিকে কাল্টের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা, ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া। একাজ করতে উৎসাহিত করা।
- যখন কাল্ট নেতাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেতে থাকে তখন পরিচয়পর্ব ও অন্য ঘরে সরিয়ে দেওয়া।

এ কাজটা সহিংস কিছু না। এ প্রক্রিয়ায় এক অভিনব পন্থায় ভিক্টিমদেরকে নিজেদের জন্য ভাবতে ও নতুন জীবনযাত্রা গ্রহণ করতে আগ্রহী করে তোলা হয়। তাকে তার কাল্টপূর্ব জীবনের ব্যাপারে আবেগী করে তোলা হয়। এটি হলো ব্যক্তিকে নতুন করে শেখানো, জীবনের ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করা।

অবশ্য অনেক ডিপ্রোগ্রামার কিডন্যাপ, জোর করে বেঁধে রাখা বা সূক্ষ্ম নির্যাতনও করত। কাল্টের চেয়ে কোনদিক থেকে ভালো হলো তারা? এ কাজগুলো ন্যূনতম নাগরিক অধিকারের বিরুদ্ধে যায়। অনেক কাল্ট তাদের সদস্যদের প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়। তাদের জন্য নতুন পদ্ধতি এসেছে, Exit Counseling। এ কাজে কোনো শক্তি বা অর্থ খরচ হয় না। এ প্রক্রিয়াটি সাবেক কাল্ট সদস্য ও তার পরিবার উভয়ের জন্যই। যেন প্রত্যেকের কাছেই এ ফিরে আসাটা স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়। কেউ যেন ভিক্টিমের বিচার শুরু করে না দেয়। তবে খুব সতর্ক থাকতে হবে যে ভিক্টিম যেন কোনোভাবেই মনে না করে যে মানুষ তাকে দোষী ভাবছে, তার বিচার করছে। তাহলে সে আবার কাল্টে ফিরে যেতে পারে।

অনেকেই স্বাভাবিক হয় না। অনেকে আবার খুব দ্রুত হয়। মানসিক চিকিৎসার জন্য বিষয়টি খুব বিরক্তিকর। অনেক থেরাপিস্ট জানেন না কীভাবে নির্যাতিত এ মানুষগুলোকে তারা সাহায্য করবেন। আমরা ইন্টারনেটের কাছে কৃতজ্ঞ। এর ফলে আমরা বিবেক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনেক বইয়ের সন্ধান পাচ্ছি। বুঝতে পারছি কীভাবে তাদের সাথে আচরণ করবো। ইন্টারনেটের সবই গ্রহণযোগ্য না। তবে মোদ্দা কথা হলো, সাবেক এ কাল্ট সদস্যরা যেন একা অনুভব না করেন। এটাই হবে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার প্রথম পদক্ষেপ।

দুটি শিহরণ জাগানিয়া কাল্ট অভিজ্ঞতা

একটি অভিজ্ঞতা

প্যায়ারি টৌ

কাল্ট'-এ বড় হওয়া আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছিল। আমি ভীত হওয়ার মতো অবস্থায় ছিলাম না কিংবা আমাকে এমন অবস্থানেও রাখা হয়নি যা শিশু হিসাবে শারীরিকভাবে ক্ষতির কারণ হবে। বেড়ে ওঠার পুরো সময়ে আমি কখনই এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি যেখানে আমার পরিবার অভাবে ছিল বা খাবার জোগাড়ে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার বিলাসিতা আমার জন্য একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। টেলিভিশনের মতো বিনোদনের বিষয়গুলো আমার বাড়িতে নিষিদ্ধ ছিল, আমি শুধু 'গসপেল' মিউজিক শুনতে পারতাম। এমনকি আমি প্রতিটি বই পড়ার পূর্বে তা বাবা-মা অবশ্যই যাচাই করে নিতেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বুঝতে পারি যে, মিডিয়ার সংবেদনশীল সেসব উপভোগ্য বিষয় থেকে আলাদা থাকার কারণে নিজের মধ্যে এক কল্পনা ভিত্তিক বিনোদনের জগৎ তৈরি হয়েছিল, যা আমার সৃজনশীলতাকে আরো শাণিত করেছে।

যখন আমার মা এবং বাবার বিবাহবিচ্ছেদ হয়, ঠিক একই সময় গীর্জাও দুভাগে বিভক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা দ্রুতই আমার পিতামাতাকে পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য করে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম যে তারা আমার মা এবং বাবা যাতে এক হতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করেছিল। অস্বীকার করার জো নেই, তাদের স্বভাব ভালো। বিবেককে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারগুলোতে তারা হস্তক্ষেপ করত—যেমন আমার বাসায় এসে তারা মায়ের জন্য প্রার্থনা করত যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি কান্না করেন। এসব বিষয় আমাকে অস্থির করে তোলে। একদিন আমি তাদের বাসা থেকে তাড়িয়ে দিই। তখন থেকে, তারা আমার মাকে এটা ভাবতে বাধ্য করে যে আমি স্যাটানিক। এমনকি আজকের দিন পর্যন্ত তিনি আমার অস্তিত্ব নিয়ে লজ্জিত কারণ আমি গীর্জার রীতিনীতি অনুসরণ করিনি।

চার্চের মতো অসাম্প্রদায়িক হওয়াতে দোষ নেই বটে। কিন্তু তাদেরকে এমন নবীর উপাসনা করতে দেখে ক্লান্ত হচ্ছিলাম যাকে যীশুর দ্বিতীয় আগমনের আগ পর্যন্ত শেষ নবী বলে বিশ্বাস করত। আপাতদৃষ্টিতে তারা ঈশ্বরের চেয়ে সে

মানুষটিকে বেশি উপাসনা করছিল। চার্চ গো-ইয়াররা তাঁর উপদেশের দীর্ঘ গবেষণার শিকার হয়েছিল। আমাদেরকে 'ওয়ার্ড' এর বাইরে ডেটে যেতে নিষেধ করা হতো এবং অন্য সবাইকে খারাপ হিসেবে দেখানো হতো। গীর্জার মধ্যে তারা কয়েক মিলিয়ন অর্থ ও সম্পত্তি জালিয়াতি করে (আমার পিতার থেকেও শেষমেশ) এবং ধর্ম-উপদেশের অডিওট্যাপ ও চার্চের গায়কদল তৈরী করে—যা চার্চে যাতায়াতকারীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। চার্চে রয়েছে পারিবারিক বোর্ডিংয়ের একটি জটিল ব্যবস্থা। তারা চার্চের পিছনে একটি স্কুল স্থাপন করেছে (একটি চার্টারবিহীন স্কুল) যেখানে বাচ্চারা সারা বছর পড়াশোনা করতে পারে।

আমি বড় হওয়ার সাথে সাথে সবাইকে পরিবারের মধ্যে রাখার মনস্তাত্ত্বিক অস্বাস্থ্যকর প্রবণতাটি দেখতে শুরু করি। আমরা একে অপরকে কেবল ভাই-বোন হিসাবে সম্বোধন করতাম (তবে একে অপরের সাথে প্রেমের সম্পর্কও ছিল)। যখন থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে এসবকিছু পাত্তা দেওয়া উচিত না তখন থেকে এই বিষয়গুলো আর প্রভাব ফেলেনি। তারা আমাকে থামানোর জন্য খুব একটা চেষ্টা করেনি। তারা আমার বাড়িতে প্রার্থনা করার জন্য লোক পাঠিয়েছিল এমনকি আমাকে গীর্জার দিকে আকৃষ্ট করতে অন্য মেয়েদের মাধ্যমে ডেটে নেয়ারও চেষ্টা করেছিল কিন্তু কিছুই কাজে আসেনি। তারা ছয় মাসের মধ্যে হাল ছেড়ে দেয়।

সত্য হচ্ছে, আমি অপেক্ষাকৃত ভালো মানুষ হিসেবে সে জায়গা থেকে বের হয়ে এসেছিলাম। শিশু হিসাবে আমি প্রচুর পরিমাণ অনাকাঙ্খিত বিষয় এড়িয়ে গিয়েছিলাম। বিষয়গুলো একজন মানুষ হিসাবে আমার নিজস্ব সামর্থ্য এবং শিল্পী হিসেবে জীবনের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। যদিও আমি এতে ভালো দেখতে পাচ্ছি, তবুও এতে সন্দেহ নেই যে আমি অন্ধভাবে বিশ্বাস অনুসরণ করে এমন লোকদের নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। ঈশ্বরকে নিয়েই খৃষ্ট ধর্ম, আপনার নিজের অহংকারের জন্য কোনও কাল্ট/সেক্ট তৈরি করার দরকার নেই।

ওহ, আমি উল্লেখ করতে ভুলে গেছি: কেবল পুরুষদেরই ধর্ম প্রচার করার অনুমতি ছিল। মহিলাদের ভূমিকা ছিল শান্ত হয়ে বসে থাকা, গীর্জায় গান গাওয়া এবং সন্তান জন্মদান। আমার মায়ের মানসিকতা আজ অবধি এই রকম; ইচ্ছে

হয় ধারণাটা বদলে দেয়ার। তবে যতক্ষণ সে সুখি, ততক্ষণ আমি নিজের মতামত নিজের কাছেই রাখার চেষ্টা করি।

গোপন এজেন্ডা

লেখক: পল বি

১৯৯৪ এর শেষের দিকে, আমার বাগদত্তা পরামর্শ দিয়েছিল যে আমি আমার ব্যবসায়ে যেন তার ভাইকে একজন ব্যবসায়িক পরামর্শদাতা হিসাবে রাখি। সে আমাকে বলেছিল যে সে প্রখ্যাত মন গবেষক জন সি লিলি এবং জোসে সিলভাসহ অন্যদের সাথে পড়াশোনা করেছেন এবং একটি ছোট ব্যবসার কাজ করছেন। আমি সম্মত হয়েছিলাম। আমাদের সহায়তা দরকার। তার ভাই ডন নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দেখালেন। তবে ১৯৯৫ এর গ্রীষ্মকালে আমাদের ব্যবসায়ের সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর পদ্ধতিটি মূলত আলোচনাভিত্তিক ছিল। তবে সে এটাতে একটি আধ্যাত্মিক কাঠামো যুক্ত করেছিল—টলটেক। আমরা কথাবার্তায় অসংখ্য ঘন্টা ব্যয় করেছি, তবে আমাদের কর্মক্ষেত্রে "অপশক্তি পরিষ্কার করতে" ধর্মীয় আচারও করেছি। ব্যবসায়ের পুনর্গঠন হয়ে গেলে ডন চলে গেল। ব্যবসা আজ অবধি লাভজনক, তবে সম্পর্কটি আর তেমন নেই। ১৯৯৭ এর শেষে, ডনের বোন এবং আমার বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

দশ বছর পরে, ২০০৪ সালে, আমি ডন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করি। ১৯৯৯ সালে আমরা এই গ্রীষ্মে যে আলোচনা করেছি সেগুলো নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করি। আমি স্বপ্নে এমন কিছু পেতে থাকলাম যা আমি জানতাম না। কীভাবে নিজের কণ্ঠ ব্যবহারে অন্যকে কাজ করানো যায়, কারো মন বোঝা যায় ইত্যাদি জানলাম। ততক্ষণে আমি একজন ভৌতিক লেখক এবং কপিএডিটরও হয়ে গিয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম যে এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে উপস্থাপন করে একটি দুর্দান্ত বই লিখব। সেই সময়ে বাজারে আত্মন্নোয়ন মূলক বইয়ের অভাব ছিল। আমি ভেবেছিলাম যদি কোনও বই লোককে তাদের নিজের মন, আচরণ এবং অন্যের আচরণ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন করে তোলে তবে এটি সব বদলে দিতে পারে। তবে আমি যদি সেই বইটি লিখতে যাই, আমার আরও তথ্যের প্রয়োজন ছিল।

আমি ডনকে সন্ধানের জন্য বছরের অনেকটা সময় ব্যয় করেছি। দেখা গেল যে তিনি মেক্সিকোয় বসবাস করছেন, বেশ কয়েকবার পরিবারকে সরিয়ে নিয়েছেন। যখন আমি তাকে একটি ইমেইল প্রেরণ করি তখন তিনি একটুও অবাক হননি। ডন বলেছিলেন যে গ্রীষ্মে আমার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু শেখানোর জন্য তার সময় ছিল না। মোটামুটি দীর্ঘ আলোচনার পরে, তিনি আমাকে নিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর বইটি লেখা উচিত, যা আমি সম্পাদনা করব।

আমাদের একটি ভালো পাণ্ডুলিপি না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করেছি। এটি ২০05 এর ঘটনা। আমাদের লেখা চূড়ান্ত বইটি বেশ জোরালো ছিল। কারণ এটি মূলত আত্মা, মানুষের মনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন উপায় এবং সেই পথটি সাফ করার জন্য অগণিত উপায় নিয়ে আলোচনা করেছিল।

ততদিনে ডন তার দিনের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে আমাদের বইটি পাঠ্যক্রম হিসাবে ব্যবহার করে তাঁর ক্লাস নেওয়া উচিত। আমি নিওশায়ানিজমে ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলাম, তাই আমি বেশ কিছু লোককে জানতাম যারা এই বিষয়ে আগ্রহী। আমি আমার নিজের ব্যয়ে বইটি প্রকাশ করেছি, মেক্সিকোয় তাঁর ক্লাসের জন্য আটজনকে অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং সীমান্তের দক্ষিণে যাত্রা করেছি।

মেক্সিকো যাওয়ার পর, ডন আমার এবং ক্লাসের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে ক্রমশ প্রভাবশালী আচরণ শুরু করলেন। তিনি অত্যন্ত তীব্র মুখোমুখি কৌশলগুলো, মনস্তাত্ত্বিক চাল, অনিদ্রা এবং বিভ্রান্তি ব্যবহার করে সম্মোহনীয় এক ধরনের ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। যা আমি বইয়ে উল্লেখ করেছি। প্রথম ১০ দিনের কর্মশালার শেষে, তিনি সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আমরা তাকে খুশি করার জন্য তার প্রয়োজন, চাহিদা সব পূরণ করেছি।

আমি ২০১২ এর বসন্ত জুড়ে নতুন শিক্ষার্থীদের সাথে আমি মেক্সিকোতে ক্লাস করেছি। এই সাত বছর ধরে আমি তাঁর কাজের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠি। তবে এরপরে আমি বুঝতে পারি যে তার পদ্ধতিগুলো আসলে কাজের না। শিক্ষার্থীরা তারা ডনের উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে উঠছিল। সময় পার হওয়ার সাথে সাথে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে তিনি তার শিক্ষার্থীদের "উদ্দেশ্য" পূরণের আড়ালে অর্থ উপার্জন করছেন। প্রায় তখনই তিনি একটি বিবাহিত দম্পতি এবং

একজন বিধবা নারীকে পান যারা তার শিক্ষার আরও প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক। দম্পতি বছরের পর বছর ধরে নিঃসন্তান ছিল। তারপরে ডনের ক্লাসের পরে তাদের একটি সুন্দর বাচ্চা ছেলে হলো। ডন তাদের বোঝায় যে এটি তাদের সাথে তাঁর চুক্তির শক্তি। এ কারণেই তিনি গর্ভবতী হয়েছেন। অথচ তারা তাদের বাচ্চার জন্য একটি ক্লিনিকে সেবা নিচ্ছিলেন। সাথে সাথে তিনি নিয়মিত একটি বিরক্তিকর কাজ করেছিলেন। তিনি তার শিক্ষার্থীদের বোঝালেন যে তারা শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছিল। যদিও এমনকি তাদের তা মনে নেই। অনেক ক্ষেত্রে তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের মনে ভুল স্মৃতি রোপণ করতেন।

আমার মেক্সিকো ভ্রমণটি একটি দুঃস্বপ্ন ছিল। ততক্ষণে, ডন চাইছিল যে ক্লাসে আসা প্রতিটি ব্যক্তি বা তাঁর সাথে যারা কাজ করেছেন তাদের "প্রোগ্রামিং পুনর্লিখন" করতে। ফলে তার এজেন্ডাটি আরও এগিয়ে যাবে। যারা তাকে সহায়তা করেননি তিনি তাদের উপেক্ষা করেছেন। কেবল যারা তাঁর উপকার করেছেন তাদের প্রতি তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। তারপরেই তিনি আমাকে বললেন যে তিনি আমাকে তার এজেন্ডাটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাসমান ট্যাঙ্ক অফিসের একটি চেইন স্থাপনের জন্য আমাকে ব্যবহার করা। তিনি বলেছিলেন গ্রাহকরা আসবেন এবং ভেসে থাকবেন। তারপর যখন তারা একটি মানসিকভাবে নমনীয় অবস্থার মধ্যে আবির্ভূত হবেন, তখন তার প্রশিক্ষিত কর্মীরা তাদের প্রোগ্রামিং পুনর্লিখন করে তাদেরকে "সংশোধন" করে দেবেন। তিনি কখনই তাঁর ছাত্রদের তাদের নিজস্ব চিন্তা খুঁজে পেতে উৎসাহিত করেননি। তারা হয় তার এজেন্ডার জন্য কাজ করেছে অথবা তিনি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমি মেক্সিকো ছেড়ে চলে গেলাম এবং কখনই ফিরে যাইনি, ডন এবং তার গ্রুপকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি আর তাদের সংস্থার অংশ নই। প্রতিক্রিয়াটি তাৎক্ষণিক এবং তীব্র ছিল। তারা আমাকে চিৎকার করে হুমকি দিয়েছিল। তাদের এমন অনেক মেইল আমার কাছে এখনও আছে। আজ ডন এবং তার দল যুক্তরাষ্ট্রে ছয়টি ভাসমান কেন্দ্র পরিচালনা করছে। সামনে আরো করবে।

ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞের অস্ত্র: মিডিয়া, বিজ্ঞাপন এবং সামাজিক মাধ্যম

বিজ্ঞাপন হল প্ররোচনা। প্ররোচনা বিজ্ঞান নয় বরং একটি আর্ট।

- উইলিয়াম বার্নবেজ।

যে মিডিয়া চালায়, সে রাষ্ট্র চালায়।

- জিম মরিসন।

মিডিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। তারা নির্দোষকে অপরাধী এবং অপরাধীকে নির্দোষ বানায়। এটাই সত্যি। এভাবেই তারা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

-ম্যালকম এক্স।

২০১২ সালের নিলসন সমীক্ষা অনুসারে, মানুষ প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩৪ ঘন্টা টিভি দেখে। আপনি যদি ট্যাব, স্মার্টফোন ও অনলাইনে কাটানো সময় হিসেব করেন তাহলে নিঃসন্দেহে টিভির দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আপনি যদি এসব নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তাহলে আপনি আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ করবেন। গণমাধ্যম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি। আর আমরাও বোকা বাক্সের সাথে বোকা হয়ে যাচ্ছি। আমাদের চিন্তা ও আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার আমরা সামাজিক ভাবে মেনে নিয়েছি। আমরা টিভি, ট্যাব, ইউটিউব, অনলাইনে যে তথ্যই পাই তার সাথে সাথে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হই। আমরা খবর পড়ি এবং বাহুল্যকে বাস্তবতা বলে মেনে নিই। আমরা সত্যতা যাচাই করি না। এ অর্ধসত্য তথ্য আমরা অন্যকে জানাই। এভাবে মিথ্যা খবর বিস্তার পেতে থাকে।

তাই আপনি যদি সত্যি জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, তাহলে মিডিয়ার চেয়ে ভালো প্রযুক্তি আর কি আছে? সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করে আমরা কীভাবে কোন ব্যক্তিকে, জীবনকে, দলকে এবং বিশ্বকে দেখব।

চ্যানেল পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হোন। কারণ আপনার টিভির নিয়ন্ত্রণ আর আপনার রিমোটে নেই।

মিডিয়ার প্রভাব

সবই দুঃসংবাদ, প্রতিটি খবরই যেন দুঃসংবাদ। রেডিও, টেলিভিশন এমনকি সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলোয় যেসব গল্প শুনে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়, সেগুলো প্রায়ই ভয়ঙ্কর, হতাশাজনক এবং উদ্বেগ জাগানিয়া হয়ে থাকে এবং এগুলো দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি এই পৃথিবীতে ভালো ঘটনাও ঘটে। তবে কেন মিডিয়া শুধুমাত্র রক্ত আর সহিংসতার দিকে ফোকাস করতেই ভালোবাসে? কারণ আমরা এসবে সাড়া দেই, তাই।

নেতিবাচক সংবাদগুলো সাধারণ সংবাদগুলোর উপর প্রাধান্য পায় কারণ সাধারণ সংবাদগুলোতে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা খুবই কঠোর। এতো সাধারণ ব্রেন-সায়েন্স যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই দিনগুলোর কথা যখন আমাদের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা পেতে এমন প্রতিটি টুকরো খবরের প্রয়োজন ছিল। এবং এই খবরের বেশিরভাগই আতঙ্কের। শিকারী, খাবার ও পানির অভাব, খারাপ আবহাওয়া, অন্যান্য বাজে মানুষ—আমাদের আদিম মস্তিস্ক নেতিবাচক সংবাদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল কারণ একসময় আমাদের সমস্ত কিছু জানা দরকার ছিল। যখন প্রতিটি কোণে মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল তখন কে ভালোর তোয়াক্কা করত?

আজকাল আমরা ভিন্ন ধরনের হুমকির মুখোমুখি হই, কিন্তু তবুও আমরা লালায়িত হয়ে রয়েছি এবং ভয় ছড়িয়ে দিচ্ছি। তবুও কিছু লোক ভাবছেন যে মিডিয়া হয়তো উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটি করছে—মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণের একটি ধরণ হিসেবে জনগণের মধ্যে ভয় ও উদ্বেগ প্রচার করছে। যদিও সম্ভব (possible), এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সম্ভাব্য (probable), সত্য বলতে এসব করার জন্য মিডিয়ার সত্যিই এত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে না। আমরা তো কোনো কথা ছাড়াই এসব গ্রহণ করে নিই।

Secret Societies and Psychological Warfare—বইতে লেখক মাইকেল এ. হফম্যান (Michael A. Hoffman) মিডিয়ার ভণ্ডামি সম্পর্কে একটি শক্তিশালী বক্তব্য তুলে ধরেছেন,

আপনি কি কখনও খেয়াল করেছেন কীভাবে টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়াগুলো নিউজ ডকুমেন্টারি, সম্পাদকীয় এবং ভারী বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধে ক্রমবর্ধমান পর্নোগ্রাফি, অপরাধ, সহিংসতা, বন্দুকযুদ্ধ (gunplay) ইত্যাদি

সম্পর্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে? আবার সেই একই টিভি গাইডে "আমেরিকায় যৌনতা ও সহিংসতার সংকট" শীর্ষক সর্বশেষ ঘোষণার পরে মায়ামি ভাইস (Miami Vice)-এর একটি বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হবে, "সেই শো যা এমন অ্যাকশান এবং উত্তেজনা নিয়ে আসে যা আপনি প্রত্যাশা করেছিলেন," ইত্যাদি ইত্যাদি। অথবা আপনার খবরের পত্রিকাটি যৌনতা ও সহিংসতার কঠোর নিন্দা করবে, আবার সেই পত্রিকার বিনোদন বিভাগেই একটি নতুন "অ্যাকশান" চলচ্চিত্রের একটি অর্ধ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন থাকবে। তাতে থাকবে স্ট্রিং বিকিনি এবং হাইহিল পরিহিতা মহিলাদের ছবি যারা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল এবং মেশিনগান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হফম্যান একে গণমাধ্যমের "ডাবল-মাইন্ড" বলে অভিহিত করেছেন। এদের এমন প্রমোশনের জন্য আমরা সকলেই দোষী। অনুভূতি পরিবর্তনের জন্য চিত্রের ব্যবহার একটি প্রাচীন পদ্ধতি। আর মিডিয়া সেই সকল চিত্রই ছড়িয়ে যায় যা আমাদের ধাক্কা দেয়, আতঙ্কিত করে এবং উদ্দীপ্ত করে।

যারা গণমাধ্যমের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করেন তাদের জন্য এর বিশদ প্রমাণ খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ। যখন ব্রেকিং নিউজে সর্বশেষ সন্ত্রাসী হামলার সংবাদ প্রচার করা হয় তখন কেবল টেলিভিশনটিকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকা লোকদের দেখুন। তাদের ফাঁকা চাহনিগুলোর দিকে তাকান যারা কমার্শিয়ালের পর কমার্শিয়াল দেখেই যাচ্ছে কেবলমাত্র তাদের পছন্দের অনুষ্ঠানটিতে ফিরবার জন্য, যেটিতে তারা আসক্ত। আঞ্চলিক এবং জাতীয় সংবাদানুষ্ঠানগুলো তারা তাদের ইচ্ছেমতো সংবাদ বলে এবং আমরা সংবাদগুলোর সত্যতা নিশ্চিত না করেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবটা গলাধঃকরণ করে নিই। আমরা মিডিয়াকে বিশ্বাস করি। মিডিয়া আমাদের কখনোই মিথ্যা বলবে না, বলবে কি? এ কাজ তো শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতারা করে থাকে! FOX, CNN এবং MSNBC-র গুরুরা তো এ কাজ করে না!

তথ্যের ভ্রান্তি

বিভিন্ন মিডিয়া উৎসের যেসব তথ্য আমাদের চোখ কপালে উঠিয়ে দেয় সেগুলোর বেশিরভাগেরই সত্যতা নির্ণয় এবং ফ্যাক্ট-চেক করা হয় না। যেসকল নিউজ আউটলেট থেকে লোকেরা সংবাদ পেয়ে থাকে সেগুলো প্রায়ই স্যাটায়ার সাইট বা ব্লগ বা ওয়েবসাইট; যেখানে কেউ কোনো প্রমাণ বা উৎস উল্লেখ করা ছাড়াই

গল্প পোস্ট করতে পারে। বাজে রিপোর্টিং ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভাইরাল করা এখন আদর্শ ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা প্রথাগত সাংবাদিকতার সাথে সাংঘর্ষিক। এমনকি এতে কে ঘটনার অর্থায়ন করল, ঘটনাটি প্রথম যে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল তা কার, তথ্যের উৎস কী, একই ঘটনা অন্য কোনো সংবাদ উৎসে প্রকাশিত হয়েছে কিনা—এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ধার ধারতে হয় না।

ঘটনা যদি পত্রিকা বা ইন্টারনেট বা টেলিভিশনে প্রচারিত হয়, তবে আমরা একে বিশ্বাস করে নেবোই। ঘটনা সত্য কী মিথ্যা তা খোঁজার সময় কার আছে?

আজকাল মিসইনফরমেশানের বা ভুল তথ্যের অভাব নেই। এ হলো এমন তথ্য যার মূলত কোনো ভিত্তি নেই অথবা এ হলো অদক্ষ সাংবাদিকতা বা বাজে প্রতিবেদনের ফল। ভুলবশত এসব তথ্যকে শতভাগ সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং যখন কেউ এর কিছুটা ফ্যাক্ট-চেক করার সিদ্ধান্ত নেয় ততক্ষণে এই তথ্য জনে জনে, নেটওয়ার্ক থেকে নেটওয়ার্কে, এবং অনেক সময়তো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে যায় কারণ জনগণ তো একে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। এমনকি পরবর্তীতে যদি সত্যটা প্রকাশও করা হয় তবুও তাদের এই সত্য-মিথ্যার দোলাচল থেকে বের করে আনা কঠিন হয়ে পরে; বিশেষ করে মিথ্যেটা যখন তাদের ধ্যান-ধারণা এবং জগত দর্শনের সাথে মিলে যায়।

ইচ্ছাকৃতভাবে ডিসইনফরমেশনকে রোপণ করা হয় বীজের মতো। পরবর্তীতে তা পরিণত হয় গ্রহণযোগ্য সত্যতে। প্রপাগ্যান্ডা, গুজব, ঘোঁট, সংবাদ এবং ভয়-উদ্দীপক সবকিছুরই ছড়িয়ে পড়ার পেছনে একটি এজেন্ডা থাকে, সাধারণত যা হয়ে থাকে ভয় ও বিড়ম্বনা প্ররোচিত করা এবং লোককে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া দেখাতে প্রভাবিত করা। এক রাতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে একজন ফেডারেল অফিসারকে এক অবৈধ অভিবাসী গুলি করে হত্যা করেছে। "বেনামী উৎস" অনুসারে অভিবাসী ছিল এমন একজন মুসলিম উগ্রবাদী যে জিহাদ সম্পর্কে চিৎকার করে করে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছিলেন। খুব শীঘ্রই মুখে-মুখে, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বিরোধী চিন্তাচেতনা। তিনদিন পরে "সত্য" আবির্ভূত হয়: অফিসার একজন অবৈধ অভিবাসী শিশুকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন, যে তার বাবা-মায়ের সাথে স্বাধীনতার সন্ধানে সীমান্ত পেরিয়েছিল।

এতো বিরোধী তথ্য কীভাবে সমন্বয় করা হলো? তবে এমনটা প্রতিদিনই ঘটে। কখনও কখনও এটি ঘটে কারণ আমরা এসব সংবাদ ছড়িয়ে দিই এমনি যখনও এটি সংবাদ হয়ে ওঠেনি—যখন এটি কেবলই একটি অভিযোগ মাত্র। কখনও কখনও এটি ঘটে কারণ "তারা" একটি ঘটনার অবতারণা করে, একটি কারণ যা একটি পছন্দসই প্রভাব তৈরি করবে।

কখনও কখনও মিসইনফরমেশন এবং ডিসইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই ম্যানিপুলেশন এমন সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে এবং অবচেতন স্তরে ঘটে যে একে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিহ্নিত করা আরও কঠিন হয়ে যায়। Media Mind Control: A Brief Introduction বইয়ের লেখক এবং How to Decode Media Manipulation শীর্ষক ১৪ ঘন্টার এক ভিডিও সিরিজের পরিচালক লেনন অনার তার ওয়েবসাইটে উল্লেখ করেছেন, এটি পছন্দ এবং একটি পছন্দ করার মধ্যে পার্থক্যের স্তরে নেমে আসে। আমরা কোনো কিছু বিশ্বাস করি কারণ আমরা এটা বিশ্বাস করতে চাই। যদিও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক থাবার মধ্যে থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারবে না যে তারা অবচেতনভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। মিডিয়ার মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণের কৌশলগুলো পরোক্ষ, গুপ্ত।

যখন আমরা এই থাবায় নিমগ্ন থাকি এবং সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নির্বিশেষে আমরা সকলেই হয়তো বিশ্বাস করতে পারি। অনার বলেছেন, আমরা এমনসব কাজ করছি যা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ফেলবে। কিন্তু আসলে আমরা হয়তো আমাদের অবচেতন প্রোগ্রামিংয়ের ভিত্তিতেই বেছে নিচ্ছি, যা দ্বারা আমাদেরকে জীবনকালব্যাপী প্রভাবিত করা হচ্ছে। এমনকি আমরা হয়তো জানিও না যে আমরা প্রভাবের আওতায় আছি।

অনার বলছেন, কেন আমরা এটিকে অনুমতি দিই তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আমাদের কী জানা উচিত তা সম্পর্কে মিডিয়ার ধারণা নিয়ে আমরা স্বেচ্ছায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা বরং আমাদের নিজের সত্যের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে এই বিভ্রান্তিগুলোতে আমাদের সময় এবং শক্তি ব্যয় করি। তিনি লিখেছেন, "এই অবচেতন স্বীকৃতি বাস্তবে ব্যক্তিকে তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত করে দেয়, কারণ আপনার মধ্যে যে মানসিকতা

রয়েছে তার সাথে মোকাবিলা করার চেয়ে আপনার বাইরে থাকা বিভ্রান্তির দিকে মনোনিবেশ করা বেশি সহজ।"

সহজেই বোঝা যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শক্তি কতটা। আরও অনেক লোক এমন সাইটে আরও বেশি সময় ব্যয় করে যা বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।

ফেসবুক এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং

প্রত্যেকেই সামাজিক যোগাযোগের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে। ভাইরাল তথ্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করা, কারচুপি করা এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কাজগুলো আর কোথাও এতটা হয় না—এমনকি তথ্যগুলো মিথ্যে হলেও। লোকেরা পোস্টগুলো ছড়িয়ে দেয়, তাদের লোকজনের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার চেষ্টা করে, মর্মান্তিক খবরের শিরোনামগুলো ছাড়িয়ে দেয়, এমনকি সংযুক্ত নিবন্ধগুলো পড়েও দেখে না। ছবি, ভিডিও, আত্মপ্রশংসা-Complete Package! তারা সিআইএ বা কোনো সশস্ত্র দল সম্পর্কে এমন তথ্য বের করে ফেলে যা কিনা সেসব দলের কেউই জানে না!

২০১২ সালে ফেসবুক নামে পরিচিত এই মেগালিথ তার ব্যবহারকারীদের অনেক ক্ষতি করেছে। ৭,০০,০০০ অনবহিত ব্যবহারকারীকে মূলত একটি সামাজিক পরীক্ষায় গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ফেসবুক এভাবে অনুভূতি এবং আবেগকে ম্যানিপুলেট করার নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছে। এবং একাজ করা হয়েছিল কাউকে না জানিয়েই। ফেসবুক ডেটা বিজ্ঞানীরা দেখতে চেয়েছিলেন তারা সাইট ব্যবহারকারীদের আবেগকে প্রভাবিত করতে পারেন কিনা এবং আরও ইতিবাচক বা আরও নেতিবাচক কন্টেন্ট পোস্ট করতে প্ররোচিত করতে পারেন কিনা। একাজে একটি অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়েছিল, ফেসবুক গবেষকরা এক সপ্তাহের জন্য ব্যবহারকারীদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন, পরবর্তীতে Proceedings of the National Academy of Sciences-এর মার্চ সংখ্যায় তাদের তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। তবে একবার গোপন পরীক্ষার কথাটি বেরিয়ে যাওয়ার পরে লোকেরা গোপনীয়তার উপর আক্রমণ এবং ধাক্কাবাজি, পরীক্ষার কপটচারী কৌশলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিল। এমনকি গবেষণার পিছনে থাকা কিছু নিচু মানসিকতার বিজ্ঞানীকে

ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিল। গোপনীয়তার নিরাপত্তার ক্ষেত্রের আইনজীবি এবং সংগঠনগুলো এগিয়ে আসে।

সমস্যাটি হলো, ফেসবুক বহু বছর ধরে এই ধরনের কাজ করে যাচ্ছিল। তারা ব্যবহারকারীদের আরও ভালোভাবে সেবা দেওয়ার জন্য সাইটের ফাংশন এবং চেহারা পরিবর্তন করেছিল এবং একই সাথে তাদের ব্যক্তিগত তথ্যে আরও এক্সেস নিয়ে নেয়। এই নির্দিষ্ট গবেষণা সামনে আসার আগ পর্যন্ত ব্যবহারকারীরা জানত না যে তাদের প্রভাবিত করা হচ্ছে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিল যে খুব সহজেই, খুব সামান্য কাজ করেই ব্যবহারকারীদের আবেগকে প্রভাবিত করা যায় এবং এ সবকিছু হয় ব্যবহারকারীর রাডারের নিচেই। এ তালিকায় টুইটার, গুগল এবং বিজ্ঞাপনের রাজস্ব দ্বারা চালিত অন্যান্য সাইটগুলোও আছে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই অনেক কারসাজি হচ্ছে, এবং সবই হচ্ছে বিক্রির খাতিরে। [সহজে বোঝার জন্য The Social Dilemma ডকুমেন্টারিটি দেখে নিন।]

সোশ্যাল প্রোগ্রামিং

আমরা কি সেভাবেই প্রোগ্রামড হচ্ছি যেভাবে আমরা আমাদের পছন্দসই অনুষ্ঠানগুলো রেকর্ড করতে DVR-গুলোকে প্রোগ্রাম করি? Social Engineering নামেও পরিচিত এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনীতি, ধর্ম এবং কর্পোরেট ভোক্তাবাদ এমনকি শিক্ষা এবং একাডেমিয়া মানুষের বিশাল দলের আচরণ, মনোভাব এবং আকাঙ্ক্ষাকে পরিচালনা করা হয়। প্রকৃত সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে করা হয় অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সোশ্যাল প্রোগ্রামিং প্রতিদিন এমনভাবে চলছে যেগুলো বৃহত্তর মানবতাকে বোঝার জন্য প্রয়োজন নেই। সমাজে সোশ্যাল প্রোগ্রামিংয়ের শিল্প সম্পর্কে আমরা ParanoiaTV-র নির্বাহী পরিচালক এবং সান ডিয়েগোতে Paranioa Store এর মালিক রন প্যাটনের (Ron Patton) সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম।

সোশ্যাল প্রোগ্রামিং আসলে কী?

সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হলো ধীরে ধীরে এবং সূক্ষ্মভাবে জনসংখ্যার একটি অংশকে বাধ্য করা বা প্রভাবিত করার একটি উপায়। অবচেতন স্তরে এটি

সবচেয়ে কার্যকরভাবে অর্জিত হয়। একে গণ-মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামিংয়ের রূপ হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে।

এর পেছনে কোন সত্ত্বা রয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্যই বা কী?

বিজ্ঞাপদাতা, মিডিয়া, রাজনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক এবং বিক্রয়কর্মীরা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি এবং কৌশলগুলোর পেছনের প্রাথমিক সত্ত্বা। তাদের উদ্দেশ্য হলো একটি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা, যার মাধ্যমে স্বতন্ত্র বা সমষ্টিগত গোষ্ঠীর মতামত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সত্ত্বার সুবিধার জন্য পরিবর্তিত হয়। মিডিয়াগুলো আমাদের চিন্তাকে পুনর্নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে, যেহেতু টেলিভিশন আমাদের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমরা সাধারণত মিডিয়াতে প্রচারিত সেই তথ্যগুলোকে তাদের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার কারণে সত্য হিসেবেই দেখি।

কাজের জায়গায় এই ধরনের প্রোগ্রামিংয়ের কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারেন যা বেশিরভাগ লোকেরা চিনতে পারবে?

সর্বাধিক প্রভাবশালী উদাহরণ হবে মগ্নচৈন্যগত (subliminal) মাধ্যমে টেলিভিশন। কোনো স্ক্রিনে অভিক্ষিপ্ত কিছু বা কম্পিউটার মনিটর থেকে বিচ্ছুরিত কোনোকিছু একই প্রভাব ফেলবে। সূক্ষ্ম উদ্দীপনার এই ধরন অবচেতন স্তরে কাজ করে। যেহেতু সমাজের বেশিরভাগ মানুষই টেলিভিশন দেখে, তাই মস্তিষ্ককে সম্মোহনীয় অবস্থাতে প্ররোচিত করার জন্য এর জুড়ি নেই। কোনো স্ক্রিনে অভিক্ষিপ্ত কিছু, যেমন কোনো সিনেমা, বা কম্পিউটার মনিটরে প্রদর্শিত কিছু একই আবেগী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট সময়কালব্যাপী এটি একটি কৃত্রিম বাস্তবতা তৈরি করতে পারে এবং এভাবে সমাজের উদ্দেশ্যমূলকভাবে যুক্তি দর্শানোর ক্ষমতায় গভীর প্রভাব ফেলে।

এর আরও একটি উদাহরণ হলো নিউরো-লিংগুইস্টিক প্রোগ্রামিং (neuro-linguistic programming)। এটি NLP হিসাবেও পরিচিত। এটি একটি স্নায়বিক মডেল যা মূলত ভাষা বা ভাষাতত্ত্ব এবং আচরণগত প্যাটার্নগুলো দিয়ে কাজ করে। এই প্রক্রিয়াটি যখন কোনো দক্ষ NLP অনুশীলনকারী দ্বারা দর্শকের উপর ব্যবহার করা হয়, তখন এটি একাধিক উদ্দীপনা গ্রহণকারীদের এমন বিষয় চিন্তা করাতে এবং এমন কাজ করতে পারে যা তারা সচেতন পর্যায়ে সাধারণত করেন না।

সোশ্যাল প্রোগ্রামিং কী কখনও ইতিবাচক ঘটনা হতে পারে?

হ্যাঁ, বিশেষ করে NLP যদি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যার মাধ্যমে আমরা ইতিবাচক লক্ষ্য অর্জন করতে এবং নেতিবাচক আসক্তিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি। এর মূল উদ্দেশ্যটি ছিল মস্তিষ্ককে পুনরায় প্রোগ্রাম করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে ব্যক্তিকে শক্তিশালী করা।

কীভাবে আমরা এই জাতীয় প্রোগ্রামিং দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়াতে পারি?

আমাদের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সম্ভাব্য বিধিবিধান সম্পর্কে জানা দরকার, তবেই এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর সম্ভাব্য ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো কীভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি সে সম্পর্কে আমরা আরও সহজে জানতে পারব। অবশ্য কিছু লোক প্রোগ্রামিংয়ের এই ধরনের প্রতি বেশি সংবেদনশীল এবং তাদের অবশ্যই উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা (Counter Measures) গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে আমাদের শক্তিশালী হতে হবে; মানসিকভাবে, আমাদের ক্রিটিকাল থিংকিং এবং মানসিক প্রক্রিয়াজাতকরণ উন্নত করার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর এবং ভারসাম্যময় জীবনযাত্রার বিকাশ ঘটাতে হবে।

এছাড়াও, আমরা যদি টেলিভিশন কম দেখি বা কম্পিউটারে কম সময় ব্যয় করি তবে আমরা সম্ভবত মগ্নচৈন্যগত (Subliminal) নেতিবাচক প্রভাবগুলোর বাইরে থাকতে পারব, হোক তা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত।

জনসাধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ হলো সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ। একটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাও জনগণের সমর্থন লাভ করতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক সরকার যেমন "মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"—এর জনপ্রিয় স্লোগান তুলে বা একটি সত্যিকার যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন যোগাড় করে। আমরা হয়তো ক্রুসেড এবং বিচারবিভাগীয় তদন্তকে সফল সোশ্যাল প্রোগ্রামিং ক্যাম্পেইন বলতে পারি। এমনকি হিটলারের সেই লোকদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকেও। এটি প্রোগ্রামিংয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কার্যকর রূপ।

প্রোপাগাণ্ডার অনুরূপ সোশ্যাল প্রোগ্রামিংও এমন এক ধরনের জনসম্পর্ক যা বৃহৎ গোষ্ঠীগুলোকে গ্রহণ, অস্বীকার, সমর্থন, প্রতিরোধ বা এর মধ্যে যে কোনো কিছুকে গ্রহণ করতে প্রভাবিত করে। গণ প্রোপাগাণ্ডার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এক অস্ট্রিয়ান-আমেরিকান ভাতিজা, এডওয়ার্ড বার্নেস,

যিনি "গণসম্পর্কের জনক" হিসেবে পরিচিত। কৃষিতে তার ডিগ্রি থাকলেও যুদ্ধকালীন সময়ে প্রোপাগাণ্ডার ব্যবহার দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে শান্তির সময়েও একই নিয়ম ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে কিনা। তিনি মনোবিজ্ঞান এবং গণসংযোগের জগতে মাথা পট্টি বেধে ডুব দিয়েছিলেন, এবং গণ-প্ররোচনার নিজস্ব ধারণাগুলো ডিজাইন করার জন্য এ পদ্ধতিগুলোর সমন্বয় করেছিলেন এবং যাকে তিনি Engineering of Consent বলেছিলেন।

"গ্রুপ মাইন্ড" কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে গবেষণা করেন বার্নেস। তার মতে, জনগণকে অবহিত না করেই নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত করা যায়। জনসাধারণের উপলব্ধি পরিবর্তন করতে এবং সুনির্দিষ্ট আচরণগুলোকে প্রোমোট করার অভিযানে তিনি তাঁর বিখ্যাত আঙ্কেলের তত্ত্বগুলো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছিলেন, একই সাথে উপকরণের ব্যাপক উৎপাদনকে কোনো সংস্থা যেভাবে ব্যবহার করবে ঠিক সেভাবেই ধারণার ব্যাপক বন্টনকে ব্যবহার করে বড় ব্যবসাতে প্রয়োগ করেছেন।

বার্নেসকে কেউ কেউ একজন প্রতিভাবান হিসাবে বিবেচনা করেন এবং অনেকেই তাকে মুক্তচিন্তার জন্য হুমকি মনে করেন। তাঁর পদ্ধতিগুলো মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগাণ্ডা এবং মুষ্টিমেয় লোকের সুবিধার্থে বৃহৎ জনসাধারণের প্রভাব ফেলে। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বই "Propaganda"—তার কাজ এবং তার আগে যারা এসেছিল তাদের কাজের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী পরীক্ষা হিসাবে রয়ে গেছে। তিনি তাদেরকে বলতেন "অদৃশ্য সরকার, দেশের সত্যিকারের শাসন শক্তি"। বার্নেস বিশৃঙ্খল জনগণের উপর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এসবকিছুকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন।

প্রোপাগাণ্ডা হলো ভীষণ শক্তিশালী একটি মাধ্যম। এটি করার জন্য অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিই রয়েছে। অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সামাজিকীকরণ, সাংস্কৃতিক মানদণ্ড এবং গ্রহণযোগ্য আচরণের পছন্দগুলো প্রচার করা। আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলো আরও একধাপ এগিয়ে যায়, এ পদ্ধতিতে সরকারি নিষেধাজ্ঞার মতো বাহ্যিক শক্তি ব্যবহার করে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক

পদ্ধতিগুলো নির্যাতনকেও লোকেদের নিয়মানুবর্তী করা, সম্মতি প্রদানে বাধ্য করা এবং শান্ত করার উপায় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

মিডিয়ার নিয়ম

সামষ্টিক বিবেক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মিডিয়া কিছু নিয়ম ও পদ্ধতির অনুসরণ করে। এদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য হলো বেশিরভাগ মানুষের কাছে পৌছে যাওয়া, অনেকক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা। তারা জানে যে তারা মানুষের জীবনযাপন, চলাফেরা, শপিং নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, তাই তারা মানুষের উপর নীরব পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

Framing মানে হলো তথ্যের ভিত্তিতেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে ফেলা। তখন তথ্য একই থাকবে, কিন্তু মানুষ তাকে বিশ্লেষণ করবে মিডিয়ার মনমতো। একটি চিত্রকর্মের কথাই ভাবুন। হতে পারে তা খুব পরিষ্কার বার্তা দিচ্ছে। কিন্তু কিছু আউটলাইন বা ফ্রেম ছবিটার প্রতি আপনার চিন্তা পাল্টে দেয়। অন্য ফ্রেম হলে ছবিটাকে আপনি হয়তো সেভাবে দেখতেন না।

সবসময় Mind Control-ই হতে হবে না, চিন্তা প্রভাবিত করার অনেক পদ্ধতিই আছে। দুই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেকোনো তথ্যকেই আবেগ বা যেভাবে আরো আবেদনময়ী করা যায় সেভাবে উপস্থাপন করে মধ্যপন্থীদের প্রভাবিত করতেই পারে। এ কনসেপ্ট চরমপন্থী হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

Paradigm-building অনেকটা এমনই। এটিও মানুষের চিন্তা, আচরণ এমনকি ঐতিহ্যের অনুসরণ পর্যন্ত বদলে দেয়। যখন Paradigm কাজ করে না, তখন আসে Framing। যদিও আজকে আগের মতো Paradigm হয় না, কিন্তু ইতিহাসে দেখবেন যে মানুষ খুব সহজেই এর সাথে মিশে যায়। মানুষ কোনো কারণে সতর্ক হয়ে গেলে নতুন নতুন প্রযুক্তি আসে। সমস্যা হলো, সমাজের এলিট অংশটিই ছিল Paradigm এর পেছনে আর তারাই আজকে Framing এর পেছনে আছে। 'কে বা কারা' বিপ্লব ঘটানো পর্যন্ত তারাই থাকবে হর্তাকর্তা।

ভাষাও বিবেক নিয়ন্ত্রণের ভালো অস্ত্র। নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ও রেটরিক পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে দেয়। সমাজ ধর্ম ও রাজনীতিকে নতুনভাবে দেখা শুরু করে এনং পুঁজিপতিদের দমন পীড়ন স্ব-প্রমাণিত বিষয় হিসেবে মেনে নেয়। মিডিয়ার প্রতিদিনের নিউজ দেখুন। পুরোটাই "আমেরিকা বনাম অন্য সবাই" ডকট্রিন। 'কালো', 'অভিবাসী', 'নারীবাদি', 'সন্ত্রাসী মুসলিম', 'গৃহহীন মানুষজন',

'গরীব কমিউনিস্ট'—এদের সবার বিরুদ্ধে কী পরিমাণ ঘৃণা ছড়ানো হয়। মানুষ একসময় এদের প্রতি যেকোনো আগ্রাসন, জুলুম, হত্যা মেনে নেয়। তারা দেশের সমস্যার জন্য অন্যদের দায়ী করে, তাদের উপর জুলুম করার বৈধতা দাঁড় করায়।

সবচেয়ে সম্মোহনী বিষয় হলো ভাষা। মানুষ রেটরিক ও শব্দের ভিড়ে হারিয়ে যায়। "আমাদেরকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তারা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চায়", "স্বাধীনতা সস্তা নয়", "সীমান্ত বন্ধ করো", "তারা আমাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে চায়", "ইলুমিনাতি বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে" এমন অনেক আবেদনময়ী কথা প্রতিদিন পত্রিকা, খবরে আমাদের সামনে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। মানুষ ভয় পায়, নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে তারা ঘৃণা করতে শেখে ও তাদের প্রতি অত্যাচারের সমর্থন জোগায়।

মিথ্যা পরিসংখ্যান হলো উদ্দেশ্য পূরণ ও মুনাফা বাড়ানোর আরেক পন্থা। "বৈজ্ঞানিক গবেষণা" বা "১১ জনের মধ্যে ১০ জন ডাক্তারই" বলে বিজ্ঞাপনগুলো অধিকাংশ মানুষকেই অন্ধভাবে তাদের প্রোডাক্টের ক্রেতা বানিয়ে ফেলে। তারা এমনও প্রচার করে যে, "অমুক বিজ্ঞানী বলেন সিগারেট ক্যান্সার ঘটায় না।" এ কথাগুলো মানুষকে সম্মোহিত করে। কেননা মানুষের তো এক গ্লাস পানি নিয়ে খাওয়ারও ইচ্ছা বা সময় নেই, গবেষণা খুঁজে দেখা তো পরের ব্যাপার!

বোকা জনগোষ্ঠী

মিডিয়ার জন্য নিউজ বা বিনোদনের মাধ্যমে কারো স্বার্থসিদ্ধি করা সহজ। মিডিয়ার জন্য কোনো সন্ত্রাসী হামলা প্রচার করে তার জন্য যুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করাও সহজ, যদিও বা সে হামলার সাথে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া জনগোষ্ঠীর কোনো সম্পর্ক নাও থাকে। পশ্চিমে এভাবে তারা মরণঘাতি ড্রাগ পর্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে। তারা এমন নেতার পক্ষে জনমত গঠন করে যে মানুষের উন্নতি নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নয়।

মানুষ বোকার মতো বিশ্বাস করে। ঘটনা হিসেবে কল্পনাকে হাজির করলেও তারা তা মেনে নেয়। কোনো আপত্তি ছাড়াই বিজ্ঞানকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে। যদিও দ্বিতীয় চিন্তা খুব জটিল, তাও আমাদের এছাড়া উপায় নেই। কেননা আমরা শতবার বোকা হচ্ছি, প্রতারণার শিকার হচ্ছি।

Mass Mind Control Through Network Television এ লেখক ও গবেষক আলেক্স আনসারি দেখিয়েছেন যে নতুন বিশ্বে প্রথমত টিভি, দ্বিতীয়ত রেডিও কীভাবে জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। আলেক্স আনসারি লিখেছেন,

তার মানে এই না যে টিভির সবকিছুই আমাদেরকে প্রভাবিত করার জন্যই বানানো। না, তা নয়। কিন্তু বেশিরভাগ টিভি কর্পোরেশনের সাথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যোগ আছে কিংবা তাদের নিজস্ব স্বার্থ আছে। যেমন Weslinghouse (CBS), General Electric (NBC)। বোঝাই যাচ্ছে, আজ আমাদের নিউজগুলো এতো প্রোপাগাণ্ডায় ভরাট কেন!

স্বার্থের দ্বন্দ্ব এখন চলে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। রক্ষণশীল ও উদারপন্থীরা ক্যাবল চ্যানেলের মালিক হচ্ছে, মিডিয়া চালাচ্ছে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে।

আজকালকার টকশোগুলো শুনেছেন? তখন যেন আমাদের মস্তিষ্ক পুরো খালি থাকে এবং তারা যা বলে আমরা তাই নিতে থাকি। আমাদের চিন্তাভাবনা আসলেই বদলে যায়। আমরা মানুষের সাথে আচরণ বদলে ফেলি। আমরা চ্যানেলটির প্রতি আকৃষ্ট হই ও সব মিথ্যা তথ্য, প্রোপাগাণ্ডাকে সত্য হিসেবে মেনে নিতে থাকি। আনসারি আরো বলেন, "সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তিগুলো উন্নত হচ্ছে। দালাল মনোবিজ্ঞানীরা সরকারকে মানুষের আচরণ, চিন্তা, কাজ পরিবর্তনে নতুন নতুন গবেষণা উপহার দিচ্ছে। মানুষ মস্তিষ্ক সম্পর্কে যত জানবে, বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া তত উন্নত হবে।...স্ক্রিন, রেডিওবার্তা ও কলমের মাধ্যমে আমরা ঘটনা জানি। সত্য কেবল চোখ দিয়েই বোঝা যায়।"

সমস্যা হলো, আমরা কি দেখার জন্য যথেষ্ট আগ্রহী কিনা!

হারাতে পারছেন না? সরিয়ে দিন!

মনোযোগই আসল কথা। অনেক উপায়েই জনগোষ্ঠীর মনোযোগ সরিয়ে দেওয়া যায়। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে কর্পোরেশনগুলো পর্যন্ত এগুলো ব্যবহার করে। যেমন:

- **জাতীয়তাবাদ প্রচার:** সরকারে বিরুদ্ধে কিছু হলেই তাকে 'দেশের হুমকি' বলে সম্বোধন করা। যার ফলে মানুষ এমন লোকদের সমর্থন করা শুরু করে যারা একেবারেই অসহিষ্ণু, এমন যুদ্ধ সমর্থন করে যা চালানোর সামর্থ্য তাদের নেই।

- **দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া:** কোনো ঘটনা থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি সরাতে চাইলে আরেকটি ঘটনা সামনে নিয়ে আসুন। কোনো রাজনৈতিক স্ক্যান্ডাল? বা কোনো ডিভোর্স? ময়লা কাপড়চোপড় এনে দৃষ্টি সরিয়ে দিন!
- **Scapegoating:** সবচেয়ে দূর্বল শত্রু খুঁজে বের করুন ও তার দিকে মনোযোগ দিন। চেইনের দূর্বল অংশ ধ্বংস করাই পুরো চেইন ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। চেইন থেকে মানুষের দৃষ্টি সরানোর এটা একটা ভালো পদ্ধতি।
- **মিথ্যা তথ্য ও মিথ্যা পদচিহ্ন:** আপনি যখন সত্য লুকিয়ে রাখতে চাইবেন তখন আপনাকে সত্যের সাথে কিছু মিথ্যা জুড়ে দিতে হবে। তারপর এতো বেশি তা প্রচার করতে হবে যেন মানুষের মনে তা স্থায়ীভাবে সেঁটে যায়।
- **অন্যকে খারাপভাবে চিত্রায়ণ:** আমাদের ভুলকে যদি মানুষের চোখ থেকে সরিয়ে ফেলতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো অন্য কাউকে দোষারোপ করা। MCCarthyism এর কথা মনে আছে? সেখানে কত প্রতিবাদী মানুষকে তারা "কমিউনিস্ট", "আমেরিকাকে ঘৃণা করে" ট্যাগ দেওয়া হয়েছিল!
- **ভীতি সঞ্চরণ:** মানুষের বিবেক ও চিন্তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ভয়ের চেয়ে বড় কোনো অস্ত্র আছে? যেটা কিনা আবার হিস্টারিয়ার ভয়? আমরা দেখেছি, আমেরিকায় ইবোলার কয়েকটি কেইসকে কেন্দ্র করে মিডিয়া কীভাবে আতংক ও আফ্রিকাবিরোধী মনোভাব প্রচার করছিল! অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যেই এটাই একমাত্র প্রক্রিয়া যেখানে আমরা স্বেচ্ছায় বিচার বিবেচনা বিসর্জন দিই।

অচেতন ও বৈধ বিবেক নিয়ন্ত্রণ

Subliminal বা অল্প সময়ের, বিক্ষিপ্ত কিছু শব্দ বা চিত্র যা আমরা অবচেতনভাবেই গ্রহণ করে নিই সেগুলো যে কেউই বানিয়ে মিম আকারে বা অন্য যে কোনো উপায়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা মিডিয়ায় ছাড়তে পারে। এখন মৃত রকস্টারের হলোগ্রাফিক ছবি, কণ্ঠ পরিবর্তন, ভুয়া ভিডিও-

এগুলো আমাদের সচেতন মন গিলে যাচ্ছে। অনেক কিছুরই বাস্তবতা নেই কিন্তু এগুলো নিউজ হয়ে চলে আসে।

১৯৫৭ সালে বাণিজ্য গবেষক জেমস ভিকারি মোশন ছবিতে এসব শব্দ ও চিত্রের ব্যবহার দেখতে চেয়েছিলেন। "পপকর্ন খাও" বা "কোক পান করো" ধরনের কিছু শব্দ কেবল মুভির মাঝে বসিয়ে দিয়েছেন। দেখা গেল, তাদের বিক্রি বেড়ে গিয়েছে। ফলাফল নিয়ে যদিও খুব একটা মাথা ঘামানো হয়নি, কিন্তু ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে যায়। আমাদের অবচেতন মনে বিক্ষিপ্ত শব্দ ও চিত্রের প্রভাবের উপর ১৯৯৯ সালে হার্ভার্ডে একটি গবেষণা হয়। ব্যাপারটা কেমন হয় যদি কেবল একটা শব্দ দিয়েই, বা একটি অর্ধনগ্ন মহিলাকে পণ্যটি হাতে ধরিয়ে দিয়েই আপনার পণ্যের কাটতি বাড়িয়ে দেওয়া যায়? মানুষ তা কিনবে, এমনকি প্রয়োজন না থাকলেও। এতো সহজে আপনি আইডিয়াটা মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারেন?

যদিও বিষয়টি বিভ্রান্তিকর, কিন্তু সত্য। এ ধারণাটি টিভি শো, বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে রাজনীতিতেও ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ই মিডিয়াগুলো দাবি করে এসব ভুলবশত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এসব পারদর্শী মিডিয়া ভালো করেই জানে এসবের প্রভাব কতটা।

The Exorcist মুভিতে অসাধারণভাবে এ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন হাউডি নামের এক সাদা চেহারার ভূত প্রায়ই দেখা যেত। অবশ্য লেখক উইলিয়াম পিটার ব্লেটি এর প্রতিবাদ করেন। তারপর তা বাদ দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালের Warner Bros. এর Wise Quacking Duck মুভিতেও এমন চিত্রায়ণ দেখা যায়। ফ্রেমে 'Buy Bonds' কথাটি দেখাচ্ছিলো। টিভি শো Prak & Recreation এ 'Community' শিরোনামে মাইক্রোসফটের লোগো এবং স্টিকার দেখানো হয়। মাইক্রোসফট সেই নির্দিষ্ট এপিসোড স্পন্সর করেছিল তাদের Bing সার্চ সাইটের প্রচারণার জন্য।

মানুষ এখন মেনেই নিয়েছে যে তাদের ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনে একটা নগ্ন নারী থাকবেই। তারা তাদের বান্ধবীর সাথে দেখা মুভির বিজ্ঞাপনে দেখা হট ডগটাই অর্ডার করে খাবে। আমাদের মস্তিষ্কে এসব প্রভাব ফেলবেই। কিন্তু সমস্যা হলো, এসব ছবি ও শব্দ যারা প্রয়োগ করে তাদের উদ্দেশ্য।

প্রযুক্তিটি সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। আমেরিকার প্যাটেন্টের মধ্যে ৬,৫০৬,১৪৮ তম প্যাটেন্টটি ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল Nervous System Manipulation by Electromagnetic Fields From Monitors। সেখানে বিবেক নিয়ন্ত্রণের এ প্রযুক্তির পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, "কাছাকাছি রাখা কোনো কম্পিউটারের স্ক্রিনের ছবি দিয়েই মানুষের মানসিকতাকে প্রভাবিত করা সম্ভব। এটা হতে পারে মুভির অংশ। বা নাও হতে পারে। যেকোনো প্রোগ্রামে কোনো প্রোডাক্টের গায়ে এ ছবি বসানো থাকতে পারে।"

তারা কেবল বিক্ষিপ্তভাবে বসিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না। তারা আপনার পর্যন্ত জিনিসটা যেন পৌছায় তা নিশ্চিত করে। সেটা আপনার ফোনের মাধ্যমেই হোক বা কম্পিউটার, ডিভিডি বা যেকোনো কিছু। জাতীয় পর্যায়ে এ প্রভাব বজায় থাকে। "টিভি মনিটরে ছবিটি ভিডিওর মাঝে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। আবার সামঞ্জস্যপূর্ণ করেও দেওয়া যায়। সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে এসব বিক্ষিপ্ত ছবি স্থাপন কিছুটা কঠিন। কিন্তু আজকাল সরাসরি সম্প্রচারকেই এ কাজের মূল অস্ত্র বানাচ্ছে অনেকে। মুভি তৈরি, গান রেকর্ডিংয়েও এ প্রক্রিয়ায় কাজ করা যায়।"

যদিও প্যাটেন্ট একটিই, কিন্তু বলাই বাহুল্য যে আজকের প্রযুক্তি ২০০৩ সাল থেকে অনেক বেশি উন্নত। ভেবে দেখুন, আপনি গ্রামাঞ্চলে বসে আপনার পরিবারের সাথে বসে টিভি দেখছেন, আর ওদিকে কেউ এর মাধ্যমেই আপনাকে প্রভাবিত করে আপনাকে দিয়ে কিছু গ্রহণ করাতে চাচ্ছে, কিছু বিশ্বাস করাতে চাচ্ছে। নতুন বিশ্বে বিবেক নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্যাস চেম্বার বা ইলেক্ট্রিক চেয়ারের দরকার নেই। আপনার অগোচরেই তা করা যাবে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রে ব্যবহার করে। খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে আপনি জানবেনও না কী ঘটছে।

অনুভূতিহীন জনগণ

এভাবে হত্যা, ঘৃণা ও অস্থিতিশীলতা সম্পর্কে মানুষের অনুভূতি নষ্ট করে দেওয়া যায়। মানুষকে বোঝানো হয়, "আশেপাশের বিশ্বে কী ঘটে যাচ্ছে তাতে প্রভাব ফেলার কোনো কথা, শক্তি বা সম্পদ তোমার নাই!" বিনোদন বা সংবাদে ক্রমাগত সহিংসতা, নারী অবমাননা, বর্ণবাদ দেখাতে থাকলে একসময় মানুষের কাছে এসব স্বাভাবিক মনে হয়। Desensitization একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া।

এগুলো খারাপের প্রতি অনুভূতি নষ্ট করে দেয়। আমাদের সংযম ধ্বংস করে দেওয়া হয়, আমাদের মানসিকতায় ক্রমাগত এসব নাড়া দিতে থাকে। আপনি আপাতদৃষ্টিতে ভালো নাগরিক। কিন্তু ক্ষতি, বিদ্রোহ, পাপ, অপরাধের প্রতি আপনার কোনো বিকার নেই।

স্টিভেন জ্যাকবসন তার Mind Control in America বইতে লিখেন, "সাইকোথেরাপির টেকনিকগুলো মানুষকে ট্রমা বা নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে আনতে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ পরিবর্তনেও এগুলো কাজে লাগানো যায়। সিস্টেমিক বিভিন্ন ডিসেনসেটাইজেশন মানুষকে হতাশা থেকে বের করে আনে। একসময় খারাপের প্রতিও সে আর ঘৃণা বোধ করে না।" জ্যাকবসন দেখিয়েছেন যে সত্যিকার চিত্রায়ন ফুটিয়ে তোলা গেলে ব্যক্তি বা সমাজ একসময় তাই গ্রহণ করে নেয় যা তারা একসময় ঘৃণা করত।

সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জিগনিউ ব্রাজেজিন্সকি Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era তে লিখেন, "বর্তমান সমাজের মেধাবী মানুষরা পুরো জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন মানুষগুলো কিছু সাধারণ ও স্বতন্ত্র কিছু তথ্য যোগাড় করে এবং সেগুলোকেই গবেষণা করে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ ও আগ্রাসন চালায়।"

কে আপনার মালিক?

যদি মিডিয়া নিজেই একটা প্রভাবশালী মাধ্যম হয়, তাহলে নাটের গুরু কে?

সময় পাল্টায়, কর্পোরেশনের উত্থান-পতন হয়। আমরা কিছু কর্পোরেশনের নাম দিচ্ছি যারা আপনার মনে স্থান গেড়েছে—আপনার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

মূল নাটের গুরু ৬টি কর্পোরেশন। তারা ৯০% মিডিয়া দখল করে রেখেছে।

- **NBC/Universal:** NBC News/Sports, CNBC, MSNBC, Oxygen, SyFy Channel, Telemundo, USA Network, Weather Channel, Focus Features, Universal Pictures, Universal Parks and Resorts, Trio, Paxson, Bravo
- **News Corp:** Fox News, Dow Jones and Company, The New York Post, BeliefNet, Fox Business, Fox News, Speed Channel, FX, MySpace, Star World, Star TV India,

Star TV Taiwan, DirecTV, 20th Century Fox Entertainment, ReganBooks, Star, Zondervan Publishing, HarperCollins Publishing, National Geographic Channel, News Outdood, Radio Veronica, The Wall Street Journal

- **Time Warner:** HBO, Time INC, TBS, Warner Bros. Entertainment, TMZ, New Line Cinema, America Online, Cinemax, Cartoon Network, TNT, Fortune, Marie Claire, Sports Illustrated, Castle Rock Films, Moviefone, Mapquest, People magazine, Time Warner Cable
- **Walt Disney:** ABC Television Network, ESPN, Disney Publishing, SoapNet, A&E, Lifetime, Buena Vista Home Entertainment, Buena Vista Records, Disney Records, Hollywood Records, Miramax, Touchstone Films, Hyperion Books, PIXAR
- **Viacom:** Paramount Pictures, BET, MTV Canada, Comedy Central, CMT, LOGO, Nick at Nite, Nick magazine, TV Land, VH1, Spike TV, Noggin
- **CBS Corporation:** CBS Network, CBS News, CBS Sports, Showtime, TV.com, CBS Radio, CBS Outdoor, CBS Consumer, CW Network, Infinity Broadcasting, Simon and Schuster, Westwood One Radio Network, iHeart Radio, Clear Channel.

Google, Amazon.com, Facebook, Yahoo!, and Microsoft নামে আমাদের কাছে বিরাট বিরাট শক্তিঘর আছে। AdAge.com এর মতে জুলাই ২০১৩ এর সমীক্ষা অনুসারে, সেরা ১০টি বিজ্ঞাপন কোম্পানির আয় নিম্নরূপ:

- AT&T—$1.59 billion
- Verizon—$1.43 billion
- Chevrolet—$958 million

- McDonalds—$957 million
- Geico—$921 million
- Toyota—$879 million
- Ford—$857 million
- T-Mobile—$773 million
- Macy's—$762 million
- Walmart—$690 million

প্রভাবের ব্যাপকতা বুঝতে পারছেন? তারা কি শুধু মেয়ে নাচায়? তারা চাইলে আপনার মানসিকতা শতভাগ পরিবর্তন করে দিতে পারে। FiercePharma.com, অনুসারে ২০১৩ সালের সমীক্ষায় বলা হয়েছে সেরা পাঁচটি মাদক বিজ্ঞাপন কোম্পানির আয় নিম্নরূপ:

- Pfizer—$435 million (Celebrex, Viagra, Lyrica)
- Eli Lilly—$239 million (Cymbalta, Cialis)
- Abbvie—$180 million (Humira, Androgel)
- Merck—$141 million (Nasonex, Gardasil)
- Amgen—$128 million (Embrel, Prolia)

টাকার এ পরিমাণ তো প্রতি কোম্পানির বিলিয়ন ডলারের আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যবসার কোন প্রতিনিধিত্বই করে না।

এ পুরো টাকা ও প্রভাব অল্প কিছু মানুষের হাতে থাকে। একনায়কতান্ত্রিক মনে হচ্ছে? আমাদের টু ডু লিস্ট, দর্শন এবং শ্রবণ পুরোপুরি তাদের হাতে। যদিও টাকা অনেক বড় বিষয়, কিন্তু ক্ষমতাটা আরো উপর থেকে আসে। হ্যাঁ, আমরা চ্যানেল পাল্টাতে পারি। আমরা অন্য খবর ও বিনোদনও নিতে পারি। এমনকি টিভিও বন্ধ করে দিতে পারি। এগুলো সব বন্ধ করে আমরা কি আসলেই টিকে থাকতে পারব?

এবার বলুন, আমাদের মালিক কে? অনেকেই এই মিডিয়াগুলোর বিকল্প সত্য মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করছেন। আমরা চাইলে আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমরা তথ্য যাচাই করতে পারি। আমাদের অসচেতনতাই তাদের আসল শক্তি।

আমরা যদি একবার জেগে উঠি, আমাদের জীবনের রিমোটকে নিজের হাতে নিতে পারি এবং আমাদের বিবেক, নৈতিকতা ও লক্ষ্য অনুসারে চলতে পারি তাহলে আমাদের মস্তিষ্কে বাসা বাঁধা যে কারো জন্য কঠিন হবে।

বিবেকের শক্তি সক্রিয় হোক!

বিবেক নিয়ন্ত্রণের ইতিবাচক দিক

মনই সব। আপনি যা ভাবেন আপনি তাই।

- বুদ্ধ

- *"ইতিবাচক ভাবুন"।*
- *"দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টান, জীবন বদলে যাবে"।*
- *"বাস্তবতাকে নতুন করে ভাবার শক্তি অর্জন করুন"।*
- *"সারাদিন আপনি যা ভাবেন আপনি তাই হয়ে ওঠেন"।*

আমরা প্রায়ই এসব কথাগুলো শুনি। জীবনের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সবাই আমাদের মানসিকতাকে বদলাতে বলে, মানসিকতার উপর ক্ষমতা অর্জন করতে বলে। মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ আমাদের ব্যক্তিজীবনের জন্য সবসময় খারাপ না। আমরা এভাবে আমাদের বিবেককে কাজেও লাগাতে পারি। বিবেক বিক্রি খুবই জঘন্য একটা কাজ। সন্ত্রাসী নেতা, রাষ্ট্র, সামরিক বাহিনী, ধর্মীয় নেতাদের দাস না হয়ে একে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা উচিত।

অন্তরের স্বাধীনতাই সত্যিকার স্বাধীনতা।

Hypnosis and The Alpha State

মানুষের বদ অভ্যাস ছাড়ানো, আতঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়া, ওজন কমানো, ধূমপান ত্যাগ—এসব কারণে হিপনোসিস ব্যবহার করা হয়। হিপনোসিসের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কের নেতিবাচক প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে আমাদের বদভ্যাস পরিবর্তন করা হয়। জীবনে পরিবর্তন আনতে নিজে নিজেও হিপনোসিস করা যায়।

নিজে নিজে হিপনোসিসের এ ধারণাকে Silva Method বলে। আগে বলা হতো Silva Mind Control Method। বিষয়টি অনেক মোটিভেটর ও ডাক্তারের মাধ্যমে ১৯৬০-১৯৯০ মধ্যকার সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালের দিকে Silva Method প্রক্রিয়াটি জোস সিলভা নামের একজন ইলেক্ট্রিশিয়ানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। সিলভা নিজে নিজে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের কিছু প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা করেন। তিনি Split-brain theory অনেক পছন্দ

করতেন। পরবর্তীতে অবশ্য এ থিওরি আরো ভালো প্রজেক্টে ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু সিলভা মনে করতেন, থিওরিটির একটি তথ্য সঠিক। তা হলো, আপনি আপনার অন্তরকে একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে সাজাতে পারবেন।

হিপনোসিস, মানসিক প্রশিক্ষণসহ অনেক কিছু করে সিলভা বিশ্বাস করা শুরু করেন তিনি যে কাউকে তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারবেন। তিনি তাদের মেধা, স্মৃতিশক্তি, শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবেন। তিনি এর জন্য মানুষের মস্তিষ্কের Alpha wave state (7.5Hz-12.5Hz) ব্যবহার করতেন। এ অবস্থায় মানুষ সাধারণ ধ্যান করে বা দিবাস্বপ্ন দেখে। Alpha State এ মানুষ সচেতনতার গভীরে চলে যায়, নিজের মানসিক প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে পারে। সিলভা মনে করতেন, মানুষের পুরোনো মানসিকতা, নেতিবাচক চিন্তা ও অভ্যাস পরিবর্তনে এ অবস্থাই যথার্থ।

যদিও সিলভার তত্ত্বে কিছু ভুল ও অনেক সমালোচনা আছে, তারপরও তার অনেক অনুসারি নিজের বদভ্যাস ছাড়া, ওজন কমানো, সুস্বাস্থ্য অর্জনে এ প্রক্রিয়া অনেক কার্যকর ছিল বলে দাবি করেছেন। আসলে নাম বা প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ না, গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি কীভাবে নিজের মানসিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করবেন। Hypnosis, Visualization, Affirmations ও ইতিবাচক চিন্তার ক্ষমতা আমাদের মানসিকতাকে অন্যমাত্রায় পরিবর্তন করে দেয় এবং আমাদের দেহ মনে এক অটুট বন্ধন তৈরি করে দেয়। পুরো বইটিই যেহেতু এসব বিষয় নিয়েই লেখা হয়েছে, তাই আমরা এখানে সব ধরে ধরে ব্যাখ্যা করব না। কেবল সুবিধেই মাথাই রাখুন।

হিপনোথেরাপি হিপনোসিস এবং সাইকোথেরাপির সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের ঘুমের সমস্যা, হতাশা, PTSD-সহ অনেক মানসিক সমস্যা দূর করে। অনেক ধরনের হিপনোথেরাপি আছে। অনেকগুলো বেশ বেদনাদায়ক। বাকিগুলো আসক্তি, খেলার পারদর্শীতা, অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ, আতঙ্কজনক অপারেশনের আগে, পরীক্ষায় ভালো করানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ডেইরডি ব্যারেট The Psychology Of Hypnosis এ বলেন, "থেরাপি নিজেই একমাত্র সমাধান না। এটা আসলে কোনো মূল বিষয়ই না। মূল বিষয় হলো যে পরামর্শ ও ছবি আমাদেরকে মানসিক ডাক্তাররা দেন। তারা যদি

বারবার এটি চেষ্টা করতে থাকে, নতুনভাবে নতুন উপায়ে, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের কাজকর্মে এর পরিবর্তন দেখা যাবে।"

যদিও কাজটি অন্য কেউ করে দিলে বেশি ভালো, তারপরও নিজে নিজে করাও খারাপ না। এতে তৃপ্তি আছে। আসলে আপনি নিজেকে আলফা স্টেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিউজিক বা ছবি ব্যবহার করেন। আলফা স্টেট আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে ও নিজের মতো মস্তিষ্ককে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। জেইন মাস্টাররা কীভাবে ধ্যানের সময় আলফা স্টেট আরো গভীর করা যায় তা শেখান। আলফা ওয়েভ আপনাকে EEG তে যেতে সাহায্য করবে। এ স্টেটে পৌঁছে গেলে আপনার পরবর্তী কাজ হলো নতুন চিন্তা ও আইডিয়া কল্পনা করা, অন্তরে প্রবেশ করানো। মজার ব্যাপার হলো, সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও আটক বিদ্রোহীদেরকে স্বৈরশাসকের প্রতি অনুগত করতে এ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।

Brain Entertainment

নিজের Brain Wave-কে ভিন্ন একটি অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হওয়াকেই Brain Entertainment বলে। অভ্যাস পরিবর্তন কিংবা নিজের মানসিকতা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে এটি খুবই জনপ্রিয়। প্রক্রিয়াটিতে কিছু অস্বাভাবিক জিনিস ব্যবহৃত হয়। যেমন, Binautal beats, Monaural beats বা Isochronic tones। বিষয়গুলো আলফা স্টেটে যেতে আসলেই সহজ, দ্রুত ও কার্যকরী। এগুলো Brain wave-কে 4-7 Hz-তেও নামিয়ে আনতে পারে। এভাবে স্মৃতি, ধ্যান ও মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। অনেক মানুষ Delta (0-4 Hz) পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে—ঘুমন্ত ও অজ্ঞান অবস্থা। একে Hemispheric Synchronization-ও বলে। সমস্যা হলো এ প্রক্রিয়ায় মানুষের দেহ ও মনকে আসলেই হিপনোটাইজ করা হয়। ফলে মস্তিষ্ক নতুন করে প্রোগ্রামিং এর জন্য আরো খুলে যায়।

Brain Entertainment প্রক্রিয়ায় Binautal beats খুবই কার্যকরী। দুটো অডিও সিগন্যালের পার্থক্যে একটি বিট ব্যবহার করা হয়। হেডফোন ব্যবহার করলে এ বিট দুটো সিগন্যালের মধ্যে সমন্বয় করে। ফলে আমরা কানে কেবল একটিই স্থির শুনব। আমাদের মস্তিষ্কে একটি অন্য ধরনের অনুভূতি দেবে। আমাদের আনন্দ লাগবে, ক্রমান্বয়ে তারা আমাদেরকে অন্য একটি

অবস্থায়, অন্য কোনো ওয়েবে নিয়ে যাবে। কম খরচেই এ বিটের যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায়।

Monaural beats একই ধরনের দুটি সুরের সমন্বয় বা পৃথকীকরণ করে। ফলে নীরবতার কাছাকাছি কিংবা উঁচু শব্দের সুর শোনা যায়। সুরগুলো আমাদের কানে প্রবেশ করে আমাদের থ্যালামাসকে উত্তেজিত করে ও আনন্দের অনুভূতি দেয়। Binautral এর সাথে এর পার্থক্য হলো, Binautral এ সমন্বয় মস্তিষ্কে হয়, কিন্তু এখানে কানে যাওয়ার আগেই সমন্বয় হয়ে যায়। Isochronic tones নির্দিষ্ট গতি সৃষ্টি করে বা বন্ধ করে। এ দুটো সুরের জন্য হেডফোন দরকার হয় না।

পুরোটাই ফ্রিকুয়েন্সির খেলা। সঠিক মাত্রায়, সঠিক পরিবেশে ও সঠিক সময়ে এর প্রয়োগ মস্তিষ্কের মতো জটিল অংশে পরিবর্তন সাধন করে দেয়। Rave Dance Party-র কথাই ভাবুন না কেন! সেখানের লাইট ও মিউজিকগুলো মানুষকে অন্য এক অবস্থায় নিয়ে যায়। যাই হোক, সম্প্রতি Stonehenge এর একটি রিসার্চে দেখা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষরা Rave Dance Party-র এই পরিবেশকে নিজেদের ধ্যানেও ব্যবহার করতেন।

যদি Brainwave নিয়ন্ত্রণই বিবেক নিয়ন্ত্রণ হয়, তাহলে একবার যদি তা নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, তাহলে কী করবেন আপনি, হুম?

চিন্তাশক্তি

মানসিকতা পরিবর্তন করে আপনি কি আসলেই আপনার জীবন বদলে দিতে পারবেন? নিজস্ব শত কোটি টাকার গবেষণা অনুসারে বলা যায়, আপনি অবশ্যই পারবেন! কিন্তু বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। কেননা আপনার ভুল পদক্ষেপ আপনার মস্তিষ্কে অপূরণীয় ক্ষতি করে দিতে পারে। Garbage in, garbage out, so the saying goes!

আপনি যখন স্থানীয় কোন হিপনোটিস্ট বা কোন মেশিনকে নিজের বিনোদনের জন্য ব্যবহার করেন তাহলে কিছুই হবে না যদি আপনি আপনার মনের উপর সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেন। আমরা যদি আমাদের সরকার, মিডিয়া, ধর্মীয় নেতা, নারসিসিস্ট ও সাইকোপ্যাথদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে যাই তারা ততটুকুই আমাদের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে যতটুকু আমরা অসচেতন রেখেছি।

কোন গবেষণা বলে না ইতিবাচক চিন্তা আপনার মন পরিবর্তন করবে। কিন্তু বই, টিভি শো, মুভি এবং মোটিভেশনাল স্পীকাররা আমাদেরকে ইতিবাচক চিন্তার ক্ষমতার কথা বলেন। যখন আপনার মন যেকোন কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে, তখন ভালো বীজ বপণ করাই শ্রেয়-কারণ ভালো বীজ থেকে তো ভালো গাছই হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে সুচিন্তার মাধ্যমে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনাচরণে যৌক্তিক পরিবর্তন আনতে পারি। এটি একাই আমাদের চিন্তার রাজ্যে আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

বিষয়টি জিমের মত। আপনি সেখানে গিয়ে কোন উপকার ছাড়া বসে থাকতে পারেন, অথবা আপনি চাইলে মেশিন দিয়ে বা খালি হাতে ব্যায়াম করে স্বাস্থ্যবান আর শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন। একই জিম কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্নরকম ফলাফল আসলে পারে। র‍্যামেজ সেসন তার The Power Of Positive Thinking প্রবন্ধে উৎফুল্ল মনের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের অন্তরও সুখী থাকে। এটা আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দেয়, মানসিক শক্তি ও শান্তি দেয়। মানসিকভাবে পীড়াদায়ক বিষয়গুলোকে ও আমরা ইতিবাচক ভাবে নিতে শিখি। এভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, বক্তব্য আরো জোরালো হয়, অনেক দূর চলতে পারি এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়ে দেয় আমরা আসলে কেমন আছি।

আমাদের চিন্তা ও শক্তি দিয়ে আমাদের আশেপাশের মানুষরা প্রভাবিত হন। এগুলো হলো অবচেতন মনের কাজ। মূল বিষয় হলো আমরা আমাদের পাশে কেমন মানুষ চাই। তাদের চিন্তা আমাদের প্রতি কেমন হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি? আমরা ও অন্যরা- প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করছে। প্রত্যেকেই যদি ইতিবাচকতা প্রচার করে তাহলে সমাজটা কেমন হতো!

সমস্যা হলো আমাদের মন যেমন প্রচার করে তেমন গ্রহণও করে। আমাদের মন কী গ্রহণ করছে তথ্য ও প্রভাবের এই যুগে এসে তা নিয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয়। সরকার ও কর্পোরেশনগুলো ব্যক্তি হিসেবে পলিসি নির্ধারণ করে। ছবি বা ভিডিও খুবই জঘন্য। কেননা আমরা তা অবচেতন মনে গ্রহণ করে বসি। ছবির সাথে সাথে বার্তাটাও। বার্তাটা যদি নেতিবাচক হয় তাহলে তা আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের উপর প্রভাব ফেলে। যেহেতু আমরা সরাসরি অবচেতন মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, তাই আমাদের কিছুটা কষ্ট করতে হয়।

ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আমাদের এখানেও সাহায্য করে। আমরা আমাদের শক্তিঘরে সুচিন্তা, সুধারণা জমা রাখব যেন দুশ্চিন্তা, ভয় ও সন্দেহ তাতে দানা বাঁধতে না পারে। আমাদের উচিত আত্মোন্নয়নে মনোযোগী হওয়া, সমাজকে সাহায্য করা। তবে কিছু আবেগী অনুভূতি আমাদের সচেতন মনে সরাসরি প্রভাব ফেলে এবং অবচেতন মনেও রেখাপাত করে। তবে আমাদের সে সুযোগ দেয়া উচিত হবে না। বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠা মস্তিষ্কের নেতিবাচক কাঠামো থেকে বের হতে আমাদের কষ্ট হয়।

ইতিবাচক মানসিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা কিছু বৈজ্ঞানিক পন্থা গ্রহণ করতে পারি।

- পুনরাবৃত্তি মস্তিষ্কে নিরপেক্ষ পথ তৈরি করে।
- অবচেতন মন সত্য ও কল্পনার পার্থক্য করতে পারে না।
- শক্তিশালী আবেগযুক্ত চিন্তা শক্তিশালী নিরপেক্ষ পথ তৈরী করে।
- Brain plasticity মস্তিষ্কে স্থায়ী পরিবর্তন তৈরি করে।
- কোন কাজের পুনরাবৃত্তি ২১ দিন পর অভ্যাসে পরিণত হয়।
- কোন কিছু দর্শন আমাদের মস্তিষ্কে তুলনামূলক গভীর আবেদন সৃষ্টি করে।
- ইতিবাচক চিন্তা মানসিক চিন্তা দূরীকরণে সাহায্য করে।

দীপক চোপড়া নামের এক ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ডাক্তার তার কোয়ান্টাম ফিজিক্স, চিকিৎসা, আধ্যাত্মিকতা নিয়ে লিখা বিখ্যাত বই 5 Steps to Harness the Power of Intention-এ বলেন, "উপনিষদের একটি শ্লোক বলে, আপনার গভীরতম চাহিদাই আপনার পরিচয়। আপনার চাহিদাই আপনার আকাঙ্ক্ষা। আপনার আকাঙ্ক্ষাই আপনার ইচ্ছা। আপনার ইচ্ছাই আপনার কাজ। আর আপনার কাজই আপনার ভাগ্য।" বাস্তবতা হলো আমাদের কাজ, চিন্তা, ইচ্ছা আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। আর এভাবেই আমরা মানুষ। চিন্তা ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা পরিণত হয়ে উঠতে থাকি। আমাদের নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে এবং আমাদের কী হয়ে উঠা উচিত তা সঠিক উৎস থেকে জানতে হবে।

কেবল ও কেবলমাত্র ইতিবাচক চিন্তা দিয়েই আমাদের ঘুম, অনুভূতির আনন্দ উপভোগ করা ও নিজের মানসিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব।

বাইরের প্রভাব প্রবেশ করতে না দিলে আমাদের মন তো আমাদেরই। সমস্যা হলো, জন্ম থেকেই আমরা এগুলো সাথে নিয়েই বড় হই। আমাদের ক্ষমতা আছে এসব থেকে বেরিয়ে আসার। প্রশ্ন উঠে আসে, যদি ইতিবাচক চিন্তা এতো গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে যদি মিলিয়ন মানুষ ইতিবাচক করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে কী হবে। কোয়ান্টাম ফিজিক্স ও তার তত্ত্ব অনুসারে, সবাই সবার সাথে যুক্ত। তাই সামষ্টিক ইচ্ছার খুব একটা গুরুত্ব হয়তো নেই। The Grid: Exploring the Hidden Infrastructure of Reality বইয়ে আমরা বিষয়টি নিয়ে লিখেছি। আমরা এমন একটা অস্তিত্বের কথা লিখেছি যা অনেক ধরনের বাস্তবতা তৈরি করতে পারে। গ্রিডের কেবল একটি স্তরেই আমরা ভ্রমণ করতে পারি। Akasha, the Zero Point Field, the collective unconscious, the kingdom of Heaven, the Source, the Force, the Universal Field ইত্যাদি নামে অনেকেই এ অবস্থানকে আখ্যায়িত করেছেন। তবে নাম ব্যাপার না।

যদি আমরা নিজেদেরকে নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে একটি সামষ্টিক শক্তি দাঁড়িয়ে যাবে। বিষয়টি ভালো-মন্দ যেকোনোটাই হতে পারে। ব্যক্তির উপর তা নির্ভর করবে। অনেক মানুষ একইরকম ভেবে যুদ্ধ বা শান্তি-যেকোনোটাই করতে পারে। রাতের সংবাদ দেখুন। অনেক ক্ষেত্রেই সামষ্টিক এ শক্তি কেবলই প্রভাব ও ক্ষমতার দম্ভ।

Neuro-Linguistic Programing (NLP)

Neuro-Linguistic Programing (NLP) পদ্ধতিটি সাধারণত মানুষের ক্ষতির জন্যই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দু-ফলা ছুরির মতো এটিও আমাদের মস্তিষ্ক রি-প্রোগ্রামিং এ কাজে লাগানো যায়। অনেকেই একে 'ভূয়া বিজ্ঞান' বলে সমালোচনাও করলেও, অনেকেই NLP-এর ফ্যান! হিপনোসিসের মতোই এটি আমাদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নের সাথে সমন্বয় করে রি-প্রোগ্রামিংয়ের পরিবেশ তৈরি করে। ১৯৭০ এর মাঝামাঝি সময়ে রিচার্ড ব্যান্ডলার ও জন গ্রিনডার সাইকোথেরাপি ও ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য এ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। গণিতের ছাত্র ব্যান্ডলার ও ভাষাতাত্ত্বিক গ্রিনডার কম্পিউটারের মতোই মস্তিষ্কের প্রোগ্রাম কল্পনা করতেন, সেভাবেই তারা NLP এর বিভিন্ন ধারা উদ্ভাবন করেন।

NLP মূলত তিনটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে—

- আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা।

- আমাদের সচেতন ও অবচেতন অবস্থায় আমাদের মানসিক ক্রিয়া।
- নিজস্ব প্রয়োজনানুসারে কথাবার্তা ও বিভিন্ন ইতিবাচক আচরণ আয়ত্ত্ব করা।

প্রচুর সমালোচনা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা NLP-কে এমন এক অবস্থানে নিয়ে গিয়েছেন যার ফলে আমরা নিজে নিজেই এ পদ্ধতিতে উপকৃত হতে পারি।

মজার বিষয় হলো, প্রায় কাছাকাছি সময়েই ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্রুজে NLPএর আরেক ধারার উন্নয়ন ঘটতে থাকে। Esalen Institute, Big sur, California তে ওয়ার্নার আরহার্ডের নেতৃত্বে Gestalt therapy ও EST (Erhard Seminars Training) এর সমন্বয়ে এক কাজ করা হয়। এই ট্রেনিংটি আরহার্ড NLP নিয়ে কাজ শুরু কয়েকবছর আগেই শুরু করেছিলেন। অবশ্য তার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। মনোবিজ্ঞান, দর্শন, স্নায়ূবিদ্যা ও আচরণের সমন্বয়ে মানুষের জীবন, রোজগার ও আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার স্লোগান তুলেছিল EST। এভাবে EST ধর্মনেতাদের মতোই অনেক উপরে উঠে যায়।

NLP-এর একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভাষা ও অনুভূতি ব্যবহার করে রি-প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা। তারা ব্যক্তির যোগাযোগ পরিপূর্ণভাবে জেনে নেয় ও এ কাজে ব্যবহার করে। কর্মপদ্ধতির কিছু এদিক ওদিক ছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য ব্যান্ডলার ও গ্রিনডারের কাজের সাথে তাদের নেই। এখানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে মানুষকে বুঝতে পারার উপায়ও শেখাবে। বিষয়টি সাংকেতিক আলোচনা কিংবা ব্যবসায়িক বিভিন্ন সাক্ষাৎকারেও প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

১৯৮০ সালের দিকে NLP-কে নিয়ে একটি রিসার্চের আয়োজন করা হয়। সেখানে US National Research Councilও কাজ করেছে। তারা সেখানে NLP-এর সত্যিকার কোনো কার্যকরিতা খুঁজে পাননি। তারা উপসংহারে আসেন, যদিও NLP-এর খুব একটা কার্যকরিতা নেই, তবুও এখানে ব্যবহৃত অনেক কিছুই ব্যক্তি উন্নয়নে কাজে আসে। ব্যাপারগুলো কমিটির ভালো লেগেছিল।

পৃথিবীর অনেক মানুষই NLP-এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। NLP প্রশিক্ষকরা দাবি করে যে তারা হিপনোসিস বা নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে মানুষের অবচেতন মনও পড়তে পারেন। অনেকেই বলেন যে NLP আসলে ফালতু

মনোবিজ্ঞান। আসলে বাস্তবিকভাবেই যারা উপকৃত হয়েছেন তাদের অবস্থানকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

আমরা সব বিষয়ই বিস্তারিত লিখছি না। আমাদের লক্ষ্য হলো, যে ঘূর্ণিঝড় আপনাদের দিকে এগিয়ে আসছে তা সম্পর্কে আপনাদেরকে সচেতন করা, সাথে সাথে তা মোকাবেলার জন্য কিছু অস্ত্রের সন্ধান দেওয়া। আমরা আপনাদেরকে আরো কিছু বইয়ের সাজেশন দেব। আপনারা বিবেক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার স্বীকার না হয়ে বরং নিজের জীবন পরিচালনা করুন, সতর্ক হোন—এটাই আমাদের মূল সাফল্য।

আমাদের নিজেদের উপরও কারো না কারো নিয়ন্ত্রণ আছে। পুরোপুরি না হলেও, আছে। বিষয়টি আসলে আমাদের গুরুত্বারোপের উপর নির্ভর করে। মানুষ খুব সুন্দর জীবনের দিকে এগোতে পারে কিংবা সে অন্যের দাসে পরিণত হতে পারে। আমরা চাই মানুষ নিজেই সিদ্ধান্ত নিক সে কোনদিকে যাবে।

আমার মন থেকে বেরিয়ে যাও: V2K, ইলেক্ট্রনিক হয়রানি, এনার্জি অস্ত্র ও ব্যক্তি আক্রমণ

খুলি থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত কাজ করার জন্য ডিভাইস আছে। প্রাণঘাতি নয় এমন অস্ত্র ১. একটি হলো মানুষের মাথার খুলি বরাবর মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ সঞ্চার করা। এর ফলে পালস নিয়ন্ত্রণে আসে। ২. নীরব শব্দের ডিভাইস যেটা মানুষের খুলিতে শব্দ পৌঁছে দিতে পারে। নোট: এ শব্দ কণ্ঠ বা অডিও যেকোনো কিছুই হতে পারে। এটি একটি নির্দিষ্ট বার্তা বহন করে।

-আমেরিকান আর্মির 'সামরিক অভিধান'।

"যেন মাথায় একটি পেরেককে আঘাত করে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। যতক্ষণ না আপনি আর সহ্য করতে না পারেন। আপনার মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে ধ্বংস করা হচ্ছে। আপনার কানে আওয়াজ মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। সেসব ইমপ্ল্যান্টের মতো যা মাইক্রোওয়েভের প্রতি সাড়া দেয়। আপনার মস্তিষ্কের আরএনএ কাঠামোকে মাইক্রোওয়েভ দ্বারা পরিবর্তন করা হচ্ছে, ধীরে ধীরে তবে নিশ্চিতরূপে। ধূর্ত হিপনোটিস্ট ওয়াশরুমের মতো আপনাকে নিজের আয়ত্তে করে নিয়েছে। আপনার কাজ শেষ না হওয়া অবধি সে আপনাকে বের করবে না! নরকে স্বাগতম।"

"আমি আমার মাথার ভেতরে এবং বাইরে মানুষের কণ্ঠ শুনতে শুরু করি, যা আমি ১৯৭৪ এর আগে কখনোই শুনিনি। কণ্ঠগুলো আমাকে খুন, চুরি, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা এমনকি আত্মহত্যা করার মতো খারাপ কাজ করতে বলত। আমার কানের ভোঁ ভোঁ শব্দটাও একই সময় শুরু হয়েছিল এবং তা কোনো মানুষের পাগল করার জন্য যথেষ্ট তীব্র ছিল। আমি পাগল নই, কিন্তু তবুও সেসব বন্ধুরা যারা এমন কিছুর কথা শোনেওনি বা দেখেওনি যেমন একই সময়ে কয়েক ডজন কণ্ঠ আপনাকে আক্রমণ করছে, বা একেবারে কয়েকমাস টানা মাথাব্যথা সহ্য করা (আমার মস্তিষ্কে কোনো টিউমার নেই), ঝাপসা দৃষ্টি, কথা বলায় অক্ষমতা (আমি একজন স্পষ্টভাষী, ধর্মীয় দর্শন, বিশ্ব সভ্যতা এবং সমাজ ইত্যাদি নিয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষিত আজীবন অপেশাদার লেখক) এবং মাঝেমাঝে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার দরুন আমাকে পাশদিকে চলতে বাধ্য করে। এই

মাইক্রোওয়েভ আক্রমণগুলো গত পাঁচ বছর তীব্রতায় বৃদ্ধি পেয়েছে (আমার বয়স এখন প্রায় ৭০ বছর)..."

"২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি অর্গানাইজড স্টকিংয়ের শিকার হচ্ছি এবং বেশিরভাগ ভুক্তভোগীর মতোই, কেন হচ্ছি তা নিয়ে নিশ্চিত নই। আমি কেবল অনুমান করতে পারি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনি যখন এই অসুস্থ প্রোগ্রামটির পরবর্তী পর্যায়ে যাবেন তখন 'তারা' আপনাকে জানিয়ে দেয়। আমার জন্য এটি শুরু হয়েছিল হয়রানিমূলক ফোন কল দিয়ে। তারপরে 'তারা' আমাকে জানিয়ে দেয় যে আমাকে ফলো করা হচ্ছে। সেই সময় আমি 'স্ট্রিট থিয়েটার'-এর অভিজ্ঞতাও লাভ করতে শুরু করি। তখন আমি লক্ষ্য করি যে বন্ধু এবং প্রতিবেশীরা আমার প্রতি কেমন যেন আরও শীতল হয়ে উঠছে। আমার পরিবারে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল কারণ আমি সবাইকে এটি সম্পর্কে বলার চেষ্টা করছিলাম এবং তারা ভেবেছিল আমার মতিভ্রম হয়েছে (প্রোগ্রাম ডিজাইনের অংশ)। আমার কী ঘটছে তা নিয়ে শুরুতে আমি খুব বিভ্রান্ত ছিলাম। শীঘ্রই আমি ইন্টারনেটে অর্গানাইজড স্টকিং সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম, এই উন্মাদ কার্যকলাপের যে একটি নাম আছে তা আবিষ্কার করে খুশি হয়ে গবেষণা শুরু করি। এটি আমার সম্বিৎ বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। 'তারা' জানে যে তারা মানসিক দৃঢ়তাকে ভেঙে ফেলতে পারে না। আর এটাই বৈদ্যুতিক হয়রানি শুরু করার অন্যতম কারণ। ২০০১ সালে আমি আমার প্রথম V2K ট্রান্সমিশনের শিকার হই এবং তখন থেকেই আমাকে বিভিন্ন রকমের "অ-প্রাণঘাতী" প্রযুক্তি দিয়ে হয়রানি করা শুরু হয়। TI-দের উচিত এই বার্তা ছড়িয়ে দেয়া যাতে প্রত্যেকে বুঝতে পারে যে এগুলো সত্যিই ঘটে।"

এই ব্যক্তিরা একা নন। তারা শত শত, সম্ভবত হাজার হাজার TI (Targeted Individuals বা ভিক্টিম)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করেন যারা বৈদ্যুতিকভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে, তাদের বিম করা হচ্ছে সরাসরি শক্তির অস্ত্র দ্বারা যেম মাইক্রোওয়েভ বিস্ফোরণ, গ্যাং স্টকের শিকার হচ্ছে, এবং V2K (Voice to Skull) নামক একটি প্রযুক্তির ভুক্তভোগী হচ্ছে, যা আক্ষরিক অর্থেই তাদের মাথায় কিছুজিনিস শুনতে বাধ্য করে। এবং ভীতিকর বিষয়টি হলো প্রতিটি দাবির পেছনেই একটি পেটেন্টযুক্ত প্রযুক্তি রয়েছে।

অ-প্রাণঘাতী (non-lethal) অস্ত্রশস্ত্রের জগৎ এমন সব প্রযুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে যা দ্বারা শব্দ, তাপ এবং আলোর ব্যবহারের মাধ্যমে দূর থেকে কারও মন, চিন্তা, ক্রিয়া এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ করে দেয়। তড়িৎ চৌম্বকীয় বর্ণালী পালস হাইফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোওয়েভ বিস্ফোরণ, বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিশন এবং শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করার সুযোগ সরবরাহ করে যা সাধারণ ইনহিবিটরগুলো কপ বাইপাস করতে পারে এবং প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মানুষের দেহ এবং মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে—এবং ব্যক্তিটিকে যে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে তা তাঁর কাছে অজানাই থাকে, যতক্ষণ না তারা এর ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে শুরু করে।

এবং এগুলো কয়েক দশক ধরে চলে আসছে।

কণ্ঠ থেকে খুলি

১৯৭৩ সাল, Walter Read Institution of Research এর ডা. জোসেফ শার্প সফলভাবে কৃত্রিম মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে "voice to skull transmission" প্রদর্শন করেন, এ কাজে একটি কম্পিউটার ব্যবহার করে একটি রাডার ট্রান্সমিটার নিয়ন্ত্রণ করেন যা একটি সিগনাল পালস প্রেরণ করে ভিক্টিমের মাথার ভেতরে একটি "ক্লিক" হিসেবে শোনা যাবে। এই পালসগুলো এবং পরিশেষে ক্লিকগুলো প্রকৃতপক্ষে মানব ভয়েস ওয়েভফর্মের সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, যার ফলস্বরূপ ক্রম ক্লিকের পরিবর্তে সরাসরি মাথার ভিতরে একটি কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়। তাঁর এই চৌকস, অমানবিক গবেষণা American Psychologist-এর মার্চ ১৯৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। মাইক্রোওয়েভ এবং আচরণ পরিবর্তন সম্পর্কে অবিচ্ছিন্ন গবেষণা ১৯৭৫ সালে একাডেমিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে যখন ডা. ডন আর. জাস্টেসেন American Psychologist-এর মার্চ ভলিউমে "Microwaves and Behavior" শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি পালসড মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন ব্যবহার করে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের (যুদ্ধকালীন বা দাঙ্গা পরিস্থিতিতে) কৌশল বর্ণনা করেন। জাস্টেসেন লিখেছেন যে শ্রুত শব্দগুলো কৃত্রিম ভয়েস বক্স (ইলেক্ট্রো ল্যারিক্স) ব্যবহারকারী ব্যক্তি কর্তৃক নির্গত শব্দের চেয়ে আলাদা নয়। তিনি আরও লিখেছেন যে যে শব্দগুলো শোনানো হয় সেগুলো সরল শব্দ, জটিল নয়। কারণ আরও জটিল শব্দ ট্রান্সমিট করতে আরও বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে

এবং সম্ভবত নিরাপদ এক্সপোজারের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। সহকর্মীদের সাথে মিলে তিনি ARPA (The Advanced Research Projects Agency)-র জন্য ট্রান্সমিটার বিহীন/বেতার ভয়েস ট্রান্সমিশন সিস্টেম ডেভেলপ করার কাজে লেগে পড়েন।

তবে এ ভাবনা নতুন কিছু ছিল না, কারণ ১৯৬২ সালের দিকে "মাইক্রোওয়েভ অডিটোরি ইফেক্ট" নামে পরিচিত বিষয়টিকে স্নায়ুবিজ্ঞানের জগতে অনুসন্ধান করা হয়েছিল এবং আলোচিত হয়েছিল, যা আমেরিকান স্নায়ুবিজ্ঞানী অ্যালান এইচ. ফ্রে তার প্রথম প্রকাশ করেছিলেন ১৯৬২ সালে The Journal of Applied Psychology (খন্ড ১৭)-তে। প্রকৃতপক্ষে, তার নামটি বিশেষ ফেনমেননের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল যা "ফ্রে প্রভাব" হিসাবে পরিচিত। ১৯৬৮ সালের দিকে, যেসকল ডিভাইসগুলো শব্দ, মাইক্রোওয়েভ এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি পালস ব্যবহার করে উত্তেজনাপূর্ণ মস্তিষ্কের তরঙ্গ এবং স্নায়ুতন্ত্রকে কাজে লাগায় সেগুলোর প্যাটেন্ট ফাইল করা হয়েছিল, সাথে ১৯৬৮ সালের জুলাইয়ে একটিকে মঞ্জুর করা হয় যা "নার্ভাস সিস্টেম এক্সাইটেশন ডিভাইস" নামে পরিচিত। স্পষ্টতই, এই প্রযুক্তির সামরিক প্রয়োগগুলোর সন্ধান পাওয়া কেবলই সময়ের ব্যাপার ছিল, এবং আগ্রহের জটিল সমস্যার ফলে নন-লিথাল এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র হিসেবে মাইক্রোওয়েভ অডিটোরি ইফেক্টের ব্যবহার নিয়ে পরবর্তী কয়েক দশক যাবৎ ধারাবাহিক পরীক্ষা এবং গোপন প্রকল্প পরিচালনা করা হয়েছিল।

অ-প্রাণঘাতি অস্ত্র

২০০৬ সালের ডিসেম্বরে তথ্য স্বাধীনতার আইনের এক অনুরোধের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এরকম একটি প্রোগ্রামের তথ্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। "Bioeffects of Selected Non-Lethal Weaponry" প্রমাণ করেছে যে আমেরিকান সরকার এবং আমাদের (আমেরিকার) সামরিক বাহিনী আচরণ পরিবর্তনের নন-লিথাল পদ্ধতি হিসেবে মাইক্রোওয়েভ অডিটোরি ইফেক্ট ব্যবহারের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে জানত। এমনকি ভুক্তভোগী জানতেও পারবে না তাকে কী আঘাত করেছে বা কোথা থেকে করেছে। যুদ্ধের প্রথম সারির লোকেরা এবং আইন প্রয়োগকারী ক্ষেত্রে যারা প্রথম সারিতে রয়েছে তাদের কাছে এই ধরনের অস্ত্র ছিল অমূল্য। কেউ অপরাধী বা শত্রু যোদ্ধাদের বাস্তবে হত্যা না করেই অক্ষম করে দিতে

পারে। FOIA নথিতে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল: "মাইক্রোওয়েভ শ্রবণটি প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন নয় এমন ব্যক্তিকে একটি বিঘ্নিত অবস্থা সরবরাহ করতে কার্যকর হতে পারে। শ্রবণশক্তি কেবল বিঘ্নিত করতে পারে তা নয়, যদি হঠাৎ করেই একজনের মাথায় 'একজনের কণ্ঠস্বর' শোনা যায় তবে তা মানসিকভাবে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক।"

কল্পনা করুন আপনি আপনার মাথার ভেতরে কণ্ঠ, ক্লিক বা শব্দ শুনতে পান বলে দাবি করছেন এবং কাউকে এ ব্যাপারে বলার চেষ্টা করছেন। সবাই বলবে হয় আপনি মানসিকভাবে অসুস্থ অথবা ড্রাগস নিচ্ছেন। কাউকে ধীরে ধীরে উন্মাদ করে তোলার বা তাকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম করে তোলার মোক্ষম পন্থা এটি। কখনো জানাও যাবে না এর পেছনে কে রয়েছে।

এটি অবশ্যই সামরিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অস্ত্র, যা এমনসব সিস্টেমের উপর আরও গবেষণাকে উদ্দীপিত করে যেগুলো দূর থেকেই লোকজনকে অক্ষম করে দিতে পারে, যদিও তা ক্ষণস্থায়ী হয়। ২০০৩ সালে মার্কিন নৌবাহিনী MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio) নামক একটি সিস্টেম নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে এবং মোডিফাইড মাইক্রোওয়েভ পালসের উপর গুরুত্বারোপ করে যাতে করে একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা সুরক্ষিত পরিসীমার মধ্যে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে প্রচন্ড অস্বস্তি বোধ করানো যায়।

Stalked and Harassed

টার্গেট ব্যক্তি বা TI-দের মতে, বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি এমনকি অস্ত্র ব্যবহার করে দূর থেকে শরীর এবং মস্তিষ্কের ম্যানিপুলেশনের ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। এই ব্যক্তিদের দাবি তারা ইলেকট্রনিক এবং ডাইরেক্টেড এনার্জি হয়রানির শিকার, তারা যেসকল লক্ষণে ভোগে তার একটি লিস্ট:

- চামড়া বা শরীরের অভ্যন্তরে জ্বালা অনুভূতি।
- চামড়ার উপরে এবং পায়ে খোঁচার অনুভূতি।
- তীব্র মাথাব্যথা।
- তীব্র অবসাদ যা হঠাৎ পেয়ে বসে।
- ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন।
- রহস্যময় চর্মরোগ।
- অনিয়ন্ত্রণযোগ্য নড়াচড়া; ঝাঁকি (twitches)

- মাথার ভেতরে মানুষের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া (V2K, or voice to skull) যখন অন্য কেউ উপস্থিত থাকে না; প্রাণীর আওয়াজও হতে পারে।
- বাড়ির ভেতরে, বাইরে বা ছাঁদের উপর মানুষের হাঁটার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যখন সেখানে কেউ নেই।
- অচেনা শব্দ যা প্রকৃতিতে পরবাস্তব।

হয়রানি হচ্ছেন এমন টার্গেট ব্যক্তিদের অন্যতম কমন একটি দাবি হলো তারা "Gang Stalked" হচ্ছেন বা "Organized Stalking"-এর শিকার হচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য হলো ভিকটিমের মধ্যে ভয়, হুমকি এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো:

- **Brighting:** আপনি যেখানেই যান লোকে আপনার দিকেই হেডলাইট তাক করবে।
- **Stalking:** গাড়ি এবং পথচারীদের দ্বারা ফলো হবেন; এমনকি অনেকে তো বলেন যে প্যাটার্নে বিরতি নিয়ে উপর দিয়ে প্লেন উড়ে যায়।
- **Mobbing:** হাঁটতে বা আপনার গাড়িতে থাকা অবস্থায় হঠাৎই লোকজন আপনাকে ঘিরে ধরবে।
- **Noise Harassment:** প্রতিবেশী হঠাৎই সারাদিন উচ্চশব্দকারী হয়ে ওঠে।
- **Objects:** আপনার উঠোন, কাজের জায়গা বা অটোমোবাইল গ্যারাজে অদ্ভুত জিনিস রাখে যাবে, আপনার ব্যক্তিগত জিনিস নষ্ট করে ফেলবে।
- **Privacy:** কম্পিউটার হ্যাক হয়ে যাবে এবং অন্যান্য প্রাইভেসিতে ফাটলের উপদ্রব।
- **Discrediting:** হঠাৎ লোকে আপনাকে স্মিয়ার ক্যাম্পেইন করা শুরু করবে, অপবাদ, পরনিন্দা এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আক্রমণ করবে, এমনকি আপনাকে চাইল্ড মোলেস্টেশন এবং অন্যান্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে।

গ্যাং স্টকড হওয়ার লক্ষণগুলোর অন্তর্ভুক্ত:

- পরিলক্ষিত এবং ফলো হওয়ার অনুভূতি।
- অচেনা লোক আপনার সাথে রূঢ় আচরণ করবে।

- আপনার গোপন কথোপকথনের কিছুটা অচেনা লোকেদের মুখে শুনতে পাওয়া।
- ভ্যানডালিজম এবং আপনার বাড়ি বা অফিসে বারংবার অনধিকার প্রবেশের চেষ্টার চিহ্ন।
- বন্ধু, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং সহকর্মীদের সাথে হঠাৎ আন্তরিকতা শূণ্য সম্পর্ক।
- ঘন ঘন স্বয়ংক্রিয় দূর্ঘটনা এবং অস্বাভাবিক মেরামত।
- বাড়ির আশপাশের জিনিসপত্রের জায়গা পরিবর্তন।

এই ধরনের পদ্ধতিকে নাজি, কেজিবি এবং কাল্টগুলো কর্তৃক ব্যবহৃত সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের সাথে তুলনা করা হয়। এর মাধ্যমে ভিকটিমের মধ্যে চূড়ান্ত ভয় ঢুকিয়ে দেয়া হয় যাতে তাঁর কাছে কুকর্মকারীর বিষয়ে কোনো গোপন তথ্য থাকলেও তা ফাঁস করতে না পারে। যদিও কিছু টার্গেট ব্যক্তিরা জানেনও না যে কেন তাদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে, তার মানে এই দাঁড়ায় যে তারা বিবেক নিয়ন্ত্রণ এক্সপেরিমেন্ট এবং আচরণ পরিবর্তনের দূর্ভাগা গিনিপিগ।

সামরিক বাহিনী অ-প্রাণঘাতি অস্ত্র দেশীয় সংঘাত দমনে অনেক বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে। এদের মধ্যে দূরপাল্লার একসটিক ডিভাইসও আছে যাকে LRAD বলে। এর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ বাহিত করে মানুষকে কথা শুনতে বাধ্য করা হয়। এসবকিছু সামরিক বাহিনীকে তাদের কাজে খুব ভালো ফল দিলেও এর অন্য ব্যবহারও আছে। অনেক ভিক্টিম বলেছেন, তারা যখন বিভিন্ন অনলাইন ফোরাম থেকে ফিরে আসেন কিংবা বিবেক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোনো মুভি বা বই পড়ে আসেন তখন V2K তাদের পালস নিয়ে কাজ করে। প্রায়ই তারা জানে না এটা কেন হয়।

সাইকোলজিস্টরা তাদেরকে মানসিকভাবে অসুস্থ বা বিভ্রান্ত বললেও ভিক্টিমরা তা মেনে নিতে রাজি নন। অনেকেই V2K-কে তাদের জীবনের মূল সমস্যা দাবি করেন ও প্রমাণ করার জন্য সব দলিল তাদের কাছে আছে। V2K আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলেছেন:

- মাথায় ক্রমাগত ক্লিক ও সত্যিকার কণ্ঠ শোনা।
- মাসলে সমস্যা ও গুণগুণ করা।
- ভোঁ ভোঁ বা ঘড়ির কাটার মতো শব্দ শোনা।

- সাইনাস, এলার্জি, গলা ও শরীর ব্যথা।
- র‍্যাশ ও জ্বালাপোড়া
- ঝিমানো, দুশ্চিন্তা, বিভ্রান্তি।
- নিয়ন্ত্রণহীন মনে হওয়া।
- শরীরের রোগপ্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস হতে থাকা। একসময় ক্যান্সারও হয়।

যদিও এসব বৈশিষ্ট্য থাকলেই যে কেউ বিবেক নিয়ন্ত্রণের শিকার তা বলা যাচ্ছে না। তবে অনেক ভিক্টিমই মোবাইলে হয়রানি, অনুসরণ, গ্যাং স্টকিং বা রাস্তায় দলবেঁধে বিরক্ত করা, সাইবার হয়রানিসহ অনেক ধরনের সমস্যার কথা বর্ণনা করেছেন। অনেকে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যাদের ব্যাপারে কঠোরভাবে সন্দেহ করা যায় যে তারা নজরদারিতে আছে। এদের অধিকাংশই তথ্য ফাঁসকারী। ভিক্টিমরা জানে না তারা কার মাধ্যমে এমন হয়রানির শিকার হচ্ছে। তবে ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা বলেন, হয়তো সাধারণভাবেই গিনিপিগ হিসেবে মানুষকে কোনো একটি এক্সপেরিমেন্টের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

Mind Game

শুনতে কোনো সায়েন্স ফিকশন মুভির প্লট মনে হচ্ছে? এটা আসলেই বাস্তব। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ওয়াশিংটন পোস্ট Mind Games নামের একটি ফিচার করে। শ্যারন ওয়েইনবার্গ, হারলান গিরার্ড নামের একজন টিআইয়ের সাক্ষাৎকার নেন। তার বয়স ছিল ৭০ বছর। তিনি বলেন, তাকে এ ধরনের Mind Games ও মানসিক পরীক্ষা-নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। হতে পারে তার কাছে থাকা তথ্যগুলোই এর কারণ। তার মতে, সরকারের কাছে এমন অস্ত্র আছে তাতে সন্দেহ নেই। তিনি নিজেই এর সাক্ষী। অথচ আপনি যদি পুলিশকে গিয়ে বলেন আপনি কোনো কণ্ঠের কথা শুনছেন তাহলে তারা আপনাকে পাগলাগারদে নিয়ে যাবে।

গিরার্ডের সমস্যা শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। তখন তিনি লস এঞ্জেলসে রিয়েল ইস্টেট ডেভেলপার ছিলেন। তার মনে হচ্ছিলো, কিছু আজব ঘটনা ঘটছে। সবাই তাকে ফলো করছে। তার আরো মনে হচ্ছিলো, রাতে কেউ তার এপার্টমেন্টে অনুপ্রবেশ করে। তখন হয়রানি বন্ধ হয়। কিন্তু এক বছর পর আবার শুরু হয়। এবার ভিন্নভাবে। তিনি কিছু কণ্ঠ শুনতে থাকেন। বিভিন্ন পুরুষ কণ্ঠ। প্রবন্ধে

বলা হয়েছে, কণ্ঠগুলো অনেক শান্ত। তাকে মি. গিরার্ড বলে সম্বোধন করা হতো। সে কণ্ঠ তাকে অনেক ভীত করতে হতো। তার মাঝে মধ্যেই মনে হতো তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন। তাই তিনি তার সাইকোলজিস্ট প্রেমিকার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি বলেন যে গিরার্ড ভালোই আছেন।

শীঘ্রই কণ্ঠগুলো তার মাথায় প্রচণ্ড গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। একসময় তার পুরো শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা সঞ্চার হয়। এটি পুরোটাই এনার্জি বিমকে নির্দেশ করে।

TI হিসেবে তার কাছে স্মোকিং গানের তথ্য ছিল না, কিন্তু তার কাছে সরকার ও সামরিক বাহিনীর V2K বা বিবেক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র প্রমাণের মতো অনেক তথ্য ছিল। অনেক উঁচু মানের মানুষের ভিক্টিম হওয়া, অপ্রকৃতস্থ হওয়া কিংবা মারা যাওয়ার ঘটনাও ছিল তার কাছে।

তারা তাদের মাথায় আওয়াজ শুনতেন।

গিরার্ডের মতো অনেকেই তাদের গোপনাঙ্গে ইলেক্ট্রিক শকের বিষয় রিপোর্ট করেন। তাদের যৌনশক্তি হ্রাস পেয়েছে। গিরার্ডও প্রথমদিকে এমনই বলেছেন। সুসান সেইলার নামের একজন মহিলাও তার যৌনাঙ্গে এমন সমস্যা রিপোর্ট করেন। অথচ তিনি কোনো বিপরীত লিঙ্গের সংস্পর্শেও যাননি কিংবা নিজেও কোনোভাবে উত্তেজিত হননি।

Women of Brewster Place এর লেখক গ্লোরিয়া নেইলর ২০০৫ সালে '1996' নামে একটি বই লিখেন। বইটি আত্মজীবনী। তিনিও মাথায় আওয়াজ শোনা সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি ব্রুকলিন ব্রাউনস্টোনের বেডরুমে এমন শুনতেন। তার কাছে সেটা পথযাত্রা কিংবা গ্যাং ইভটিজিং এর মতো মনে হতো। তাকে কে বা কারা অনুসরণ করতো। তিনি তার জনবিচ্ছিন্ন বাড়িতেও গাড়ির আওয়াজ পেতেন। তার এমনও মনে হচ্ছিল কে যেন বিমানে তার কাজের ধারাভাষ্য শোনাচ্ছে। তিনি ডাক্তার দেখিয়েছেন, এন্টি সাইকোটিক ওষুধ খেয়েছেন। কোনো লাভ হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, নেইলর যখন অনলাইনে বিবেক নিয়ন্ত্রণ ফোরামের সাথে যুক্ত হন তখনই এসব আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর সেরা ঔপন্যাসিক ইভিলিন ওয়োগ তার বই The Ordeal of Gilbert Pinfold এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কয়েকবছর পর এক এপিসোডে তিনি সেটা তার মাদকাসক্তিজনিত সমস্যা ছিল। সাইকিয়াট্রিস্ট ও

থেরাপিস্টরা স্বীকার করেছেন যে টিআই ব্যক্তিরা এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান। আরো আছে, হ্যালুসিনেশন, স্কিজোফ্রেনিয়া, মানসিক অশান্তি, দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রবণতা ইত্যাদি। এদের বেশিরভাগ সমস্যা নিজস্ব কারণে হলেও কিছু বিষয় ফেলে দেওয়া যায় না। তাদের মানসিক কোনো সমস্যা ছিল না। প্যান স্টেট ইউনিভার্সিটির সাইকিয়াট্রির অধ্যাপক স্কট টেম্পলের মতে, এদের মধ্যে যারা হ্যালুসিনেশনে ভুগছে তারা তাদের সমস্যার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণেই এ অবস্থায় পতিত হয়েছে। তারা হীনমন্যতা ও একসময় বিভ্রান্তিতে উপনীত হন। হার্ভার্ডের সুজান ক্লানসির মতে, টিআইএর অনেকেই এমনসব অভিজ্ঞতার কথা বলেছে যে যেগুলো এলিয়েনের সাথে যাওয়া মানুষদের দাবির সাথে অনেকাংশেই মিলে যায়। তাদের মনে হয় যে তাদেরকে কেউ অনুসরণ করছে, বিরক্ত করছে, তারা টার্গেটেড মানুষ। তারা প্রচন্ড ব্যথাও অনুভব করে। তারা স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে না।

মানুষের অন্তরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার এ বিষয়টি ঠিক বিভিন্ন গোয়েন্দাবৃত্তি কিংবা সায়েন্স ফিকশন মুভির মতো না।

২০১১ সালের মে মাসে Fortean Times, “A Game of Tag” প্রকাশ করে। সেখানে ডেভিড হ্যামলিং এ বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেন। জেমস ওয়ালবার্ট নামে একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেন তিনি। জেমস দাবি করেন, তার কাঁধে একটি চিপ আছে যা কিনা তার প্রতি আচরণ কাউকে জানিয়ে দেয়। এটা তার পেশিতেও সমস্যা সৃষ্টি করে। ওয়ালবার্টের মতে, চিপটি তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ওয়ালবার্ট কানাসাসের উচিতার একজন ডাক্তার। তিনি সরকারি কেউ নন। এমনকি কোনো অপরাধেও জড়িত নন। উইলিয়াম জে টেইলর দুটো রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ডিভাইস দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। তার পিঠ থেকে ২৮৮ মেগাহার্টজের মতো সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছে। এ ফ্রিকুয়েন্সি টিভি, রেডিওর মতো ডিভাইসে ব্যবহার করা হয়।

অবশ্য এটা আমেরিকার সামরিক বাহিনীও ব্যবহার করে।

একটি এমআরআই স্ক্যানের আসল স্থান পর্যন্ত দেখিয়ে দেয়। অস্থি-তরুনাস্থির ডাক্তার ড. জন বিষয়টি দেখেছেন। প্রবন্ধে তিনি বলেন, তার ডানপাশে পরিষ্কারভাবেই একটি ক্যাপসুলের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে।

হলের মতে, তিনি এমন অনেক রোগীই দেখেছেন যারা মনে করেন তাদের সাথে এমন কিছুই হচ্ছে।

নির্দিষ্ট কাউকে অনুসরণ

অনেক ভিক্টিমই ট্রাকিং ও নিয়ন্ত্রনের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। Smartwater Index Spray নামের একটি প্রযুক্তি। Smartwater কোম্পানির নামানুসারে এটির নাম দেওয়া হয়েছে। কোম্পানির ওয়েবসাইট অনুসারে এটি মানুষের শরীরে পানির দ্রবণ স্প্রে করতে পারে। এর ভিন্ন ধরনের ফরেনসিক কোড আছে। এটি মূলত ক্রাইম সিনে অপরাধী খুঁজে পেতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটি আলট্রাভায়োলেট আলোকে চিহ্নিত করতে পারে। ফলে যে কেউ যে কোন উদ্দেশ্যে এটি মানুষের উপর প্রয়োগ করতে পারে।

আপনি যদি কাউকে অনুসরণ করেন এবং সে যদি তা জানে সেটি তার মধ্যে ভীতি, আতংক ও দূর্বলতার সৃষ্টি করে। মজার বিষয় হলো বিবেক নিয়ন্ত্রণ শুধু ব্রেইন ওয়াশিং নয়, বরং তাকে আতংকিত করে নির্দিষ্ট কোন আচরণ থেকে দূরে রাখাও এক প্রকার নিয়ন্ত্রণ। অনেকে তো পাগলই হয়ে যায়।

অবশ্য অনেকে এগুলোকে নিজের মানসিক সমস্যা মনে করে। কেউ কেউ তো নিজেকে সিজোফ্রেনিয়ার রোগী মনে করে। কিন্তু কেউ যদি আসলেই টার্গেটেড হয় তাহলে তার পার্থক্যটা বোঝার কথা। অনেকেই দাবি করেছেন, সে কণ্ঠ তাদেরকে হিপনোটাইজ করে এবং নির্দিষ্ট কিছু তথ্য তাদের মস্তিষ্কে ছেড়ে আসে। এগুলো অনেকটাই ঠান্ডা যুদ্ধের মত। আমরা আগেই এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। যদিও V2K আরো আধুনিক প্রযুক্তি কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য একই-তা হলো মানুষের চিন্তা, বিবেক ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। ইলিয়ানোর হোয়াইট প্রজেক্টিকে Psycho-electronic Mind Control বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটি শুধু সাইকোট্রনিকই নয় বরং ইলেকট্রিক শক এবং হয়রানি সহ একটি দুর্দান্ত প্যাকেজ। প্রজেক্টির আরেক নাম হলো সাইকোট্রনিক্স। এগুলো যে শুধু আমাদের স্বাধীনতাকে হরণ করে তা নয় বরং এটি আমাদেরকে তাদের দাস ও জম্বি বানিয়ে ফেলে। বিশ্বাস করুন, ছবি, ভিডিও, শব্দ, চেতনা—প্রতিটি জিনিস দিয়ে তারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। যেহেতু আমরা এমন অনেকগুলো কেস পেয়েছি, তাই বিষয়টি আমাদের গভীর পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত। দুঃখজনক

ভাবে শুধু আমাদের সরকারই নয় বরং বাইরের সরকারগুলো একই কাজ করে যাচ্ছে।

সোভিয়েতের কথাই ধরুন, তারা Radison নামে একটি প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে, যার মাধ্যমে তারা রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে যে কাউকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে। ভেবে দেখুন, আপনি হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়ছেন, কিন্তু আপনি জানেন না কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে। এমন অনেকগুলো আবিষ্কার আছে যেগুলো সরকার, সামরিক বাহিনী ও কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। এসব এক্সপেরিমেন্টে মানুষকে রীতিমতো গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকা তো সবসময় রাশিয়ার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকে।

কিন্তু ২০১২ সালের এপ্রিলে অনেক মিডিয়াতে দাবি করা হয় যে রাশিয়া ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন অস্ত্র আবিষ্কার করেছে যা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত করে এবং সাথে সাথে মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অনেকে এটাকে এপ্রিল ফুলের মজা ভেবেছিল। হেরাল্ড সানসহ অনেকেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই ওয়েভ মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মত। নিঃসন্দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে এটি খুব ভালো ফল দিবে। আশা করা হচ্ছে ২০২০ সালের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য অস্ত্র প্রস্তুত হয়ে যাবে।

রাশিয়ান লেখক ও এক্সপার্ট এন আই আনিসিমভ তার Psychotronic Golgotha বইয়ে লিখেছেন, "আগের কালের স্বৈরশাসক ও একনায়করা ভেবে দেখতেন কীভাবে নির্ঝঞ্ঝাট উপায়ে মানুষের আনুগত্য অর্জন করা যায়। এইজন্য তারা বিজ্ঞানী ও মেধাবী মানুষদের ব্যবহার করতেন। তারাও টার্গেট করত মানুষের মনস্তত্বকে। এভাবে যুগে যুগে স্নায়ুবিক শক্তি ব্যবহার করে তারা তাদের ক্ষমতা ও সম্পদের উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ করত। তারা ভয়াবহ সব আইডিয়া নিয়ে মগ্ন থাকত। এভাবে তারা একে একে রাজ্য জয় করে নিত ও বিশ্বের রাজা হয়ে উঠত। এটাই হয়তো অন্যতম কারণ যার জন্য পরাজিত জাতির বেশিরভাগ যোদ্ধাই বিজয়ী জাতির পক্ষে যোগ দিত। তারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও ব্যাপকভাবে মানুষকে দাস বানানোর অস্ত্র নিয়ে আসত। তাদের কাছেও রেডিও সেট থাকত ও বিভিন্ন উপায়ে তারা গোপন বার্তা প্রেরণ করত। কিন্তু গত শতকে যা সম্ভব ছিল না। বিংশ শতকে সেগুলো সম্ভব হয়ে উঠছে। এ যুগের রাজারাও এবার তাদের ক্ষমতার সাধ পূর্ণ করবে।"

আনিসিমভ এসব মানবাস্ত্রকে প্লেগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সন্দেহ নেই একবিংশ শতাব্দী আরো আঁধারে প্রবেশ করবে।

তাদের অদৃশ্য অস্ত্র যা যা পারে তা হলো:

- ক্রনিক রোগ সঞ্চার বা হত্যা। যত দূরেই হোক না কেন।
- তারা অপরাধীকে নির্দোষ বানায়, নির্দোষকে অপরাধী।
- সেকেন্ডের মধ্যে রোড এক্সিডেন্ট ঘটানো।
- মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করা।
- কোনো দূর্যোগ ধ্বংস, সৃষ্টি, প্রভাবিত করা।
- সর্বাধিক জটিল প্রযুক্তি ব্যবহার।
- যেকোনো জৈবিক সত্ত্বাকে নিয়ন্ত্রণ।
- বিশ্বের মানসিকতা বদলে দেওয়া।

ভয়ের বিষয়, অস্ত্রগুলো আছে এবং আমাদের অজ্ঞাতেই কাজ করে যাচ্ছে। কে বলতে পারে যে যুদ্ধের বাস্তবতার বাইরেও তারা নিজ দেশে বা অন্য দেশের বেসামরিক জনগণের উপর একাজ করছে না? কোনো সরকারই 'আমাদের' না। তারা আমাদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যদি গোপনে মানুষের ক্ষতি করা ষড়যন্ত্র না হয় তাহলে ষড়যন্ত্রের মানে কী?

Directed Energy Weapons

এ ধরনের ক্র্যানিয়াল হয়রানিকে ব্যাখ্যা করার আরেকটি পন্থা Directed Energy Weapons হয়রানি নামে পরিচিত। যেকোনো ধরনের পরিচালিত শক্তি এ অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, শক্তি আলো, শব্দ, তাপ, বৈদ্যুতিক, গতীয় যেকোনো রূপের হতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট টার্গেট বা ব্যক্তির দিকে তাক করা। এই ধরনের ডিভাইস নতুন নয়। রাশিয়ান LIDA মেশিন, যেটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস ব্যবহার করে কোনো টার্গেটকে ক্লান্ত করে ফেলতে পারে, বলা হয়ে থাকে এটা ১৯৮০-র দশক বা তারও আগে থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৮৫ সালে CNN ড. রস অ্যাডেকে নিয়ে এক বিশেষ প্রতিবেদন করে, যিনি LIDA মেশিন নিয়ে অধ্যায়ন করেছিলেন এবং শোতে উপস্থিত হয়েছিলেন। LIDA মেশিন কেবল শব্দকে নয় বরং আলো এবং এমনকি বিকিরিত তাপকেও স্পন্দিত করতে পারে। যাহোক, অ্যাডে এবং এক সহযোগী ড. এলডন বায়ার্ড মিলে LIDA নিয়ে অধ্যায়ন করেছিলেন অস্ত্র হিসেবে এর

সম্ভাব্যতা দেখার জন্য। অনেক TI পীড়াপীড়ি করেন যে এ ধরনের মেশিন তাদের ভোগা সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ—তীব্র অবসাদের কারণ হতে পারে।

এ অস্ত্র দিয়ে আক্রমণের কিছু লক্ষণ ও নির্দেশকের অন্তর্ভুক্ত হলো:

- প্রতিরাতে ঠিক একই সময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়া, যেন এটা বাহ্যিক কোনো শক্তি প্রণোদিত।
- মাংসের ভেতর গরম কাঁটা বা সূচ ফোটার মতো অনুভূতি হয়, বিশেষ করে যখন ঘুমাতে চেষ্টা করা হয়।
- পেশি বা শরীরের অঙ্গ বা নিকটবর্তী স্থির বস্তুর কম্পন।
- দ্রুত এবং নিষ্পেষিত হৃৎস্পন্দন এবং কানে ঝনঝন শব্দ।
- চারপাশের পরিবেশ ঠান্ডা এবং বাস্তব কোনো জ্বরের উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত উষ্ণ শারীরিক তাপ।
- হঠাৎ এবং তীব্র অবসাদ।
- বাসা এবং কাজের জায়গায় অননুমোদিত প্রবেশ এবং ভাঙচুরের প্রমাণ।
- ফোন বা বাসায় সম্ভাব্য বাগিং এবং ট্যাপিং।
- সিস্টেম্যাটিক ট্রাফিক ডাউন স্ট্রিট বা নিয়মিত এমন জায়গায় কার পার্ক করা যা সড়কের অংশ নয়।

যাদের এসব লক্ষণ বা প্রভাবের অভিজ্ঞতা নেই তারা হয়তো একে তীব্র মতিভ্রম বলবে, কিন্তু যারা পাজলের প্রতিটি টুকরো এক করতে চাচ্ছে তাদের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে তাদেরকে কোনো কারণে টার্গেট করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কুটিল ও পীড়াদায়ক উপায়ে নিয়মানুযায়ী তাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। একাধিক TI-র একটি প্রধান বিবৃতি হলো তাদের বাসায় প্রায়ই অননুমোদিত প্রবেশ ঘটে কিন্তু কিছু চুরি হয় না। অনেক রিপোর্টেই আছে বাসায় এসে তালা মারা দরজা খোলা পায় বা গ্যারাজের দরজা খোলা পায় কিন্তু কিছুই চুরি হয় না, যেন তারা শুধু TI-দের আতঙ্কিত এবং ডিস্টার্ব করে চায়, কোনো বাস্তব ক্ষতি করতে চায় না।

Pop, Click, Buzz, Talk!

ওয়েন বি ব্রুনকান ১৯৮৮ সালের জুলাইয়ে United States Patent #4,877,027 আবেদন করেন। একে ১৯৮৯ দালের অক্টোবরে অনুমোদন দেওয়া হয়।

কণ্ঠ থেকে খুলি পর্যন্ত পৌছানোর জন্য মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে এ প্যাটেন্ট করা হয়। ১০০-১০,০০০ মেগাহার্টজের শব্দ নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে মানুষের মস্তিষ্কে পৌছানো হয়। একে অবশ্যই সঠিক তরংগদৈর্ঘ্য ও ফ্রিকুয়েন্সি অনুসরণ করতে হয়। প্রতিটি শব্দের প্যাকেট ১০-২০টি পালস বা বিট শক্তভাবে ধারণ করে। প্রতিটির সময় ৫০০ ন্যানোসেকেন্ড থেকে ১০০ মাইক্রোসেকেন্ড। পালসের সীমা থেকে ১০ ন্যানোসেকেন্ড থেকে ১ মাইক্রোসেকেন্ড পর্যন্ত। এসবকিছু বিরক্ত একজন মানুষের মস্তিষ্কে অনুভূতি তৈরি করে।

এ প্যাটেন্টটিতে তৈরি ও আবিষ্কারের বিস্তারিত বর্ণনা আছে—গ্রাফ, ড্রয়িংসহ। অবশ্য এ প্যাটেন্টটিতে বলা হয়েছে ১০০০ মেগাহার্টজের মধ্যে সত্যিকার বুদ্ধিবৃত্তিক বার্তা দেওয়া যায়। আবিষ্কারক বলেন, বাতাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ব্যক্তির মাথায় প্রেরিত তরঙ্গের ফ্রিকুয়েন্সি নির্ধারিত হয়। আবিষ্কারকরা বলেন, এসব মাইক্রোওয়েভ ব্যক্তির মধ্যে আল্ট্রাসনিক অবস্থা শুরু করে। যত বেশি ওয়েব, তত বেশি অবচেতন অবস্থা। কিছু ওয়েব ব্যক্তির নিউরনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। এগুলো শব্দের অবস্থার কারণে হয়। প্যাটেন্টের মালিক নিজে এটা প্রয়োগ করে দেখেননি।

ড. আলান ফ্রে, ড. জোসেফ সি শার্প, মার্ক গ্লোব ১৯৭৪ সালে Walter Reed Army Institute এ প্রথম V2K এর সফল এক্সপেরিমেন্ট চালান। তারা দেখেন, ভিক্টিমের পালস আসলেই শোনা যায়, পরিবর্তন করা যায়। কোনো গ্রাহক ছাড়াই নতুন ছদ্মবেশী পালস ব্যবহার করা যায়। একে মাইক্রোওয়েভ শ্রবণ বলা হয়। সঠিক পালস, সঠিক ফ্রিকুয়েন্সি, সঠিক বার্তা নির্ধারণ করতে পারলেই কেল্লাফতে!

এনার্জি বিম আলো, রেডিও ওয়েবকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ২০০৫ সালের জুলাইয়ে Despite Promise, Energy Bean Weapons Still Missing From Action অনুসারে আমেরিকান আর্মি বিষয়টি নিয়ে যুগের পর

যুগ ধরে কাজ করছে। পালস অনেকটা স্টার টের্কের মতো আচরণ করে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধগুলোতে এ অস্ত্র ভয়াবহ, কার্যকর, যথার্থ, অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র হিসেবে আসবে। তবে সঠিকভাবে অস্ত্রকে বোঝার মানুষ লাগবে। Heritage Foundation,—এর সিনিয়র ফেলো জেমস জে ক্যারাফেনো একজন রক্ষণশীল থিংক ট্যাংক। তিনি বলেন, "এ অস্ত্র খুবই সম্ভাবনাময়। কিন্তু এত শক্তিশালী অস্ত্র ধারণ করার ক্ষমতা প্রকৃতির নেই।" তার মতে, এ অস্ত্রের পেছনে প্রয়োজনমতো শ্রম ও সময় দেওয়া হয়নি। তিনি একে খুব বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ অস্ত্রকে কোনোকিছুই আটকাতে পারে না। বিমটি আলোর বেগে যায়। নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে কোনো দেয়ালই ব্যাপার না। ক্ষমতা ও যথার্থতার দিক থেকে সামরিক বাহিনীর স্বপ্ন সত্য হলো। এখন এ প্রযুক্তি লেজার অস্ত্রের মতোই। সাময়িকভাবে কাউকে অন্ধও করে দেওয়া যায়, যেমন করা হয়েছে ইরাক যুদ্ধে। বিমানবাহিনীর আইডিয়া ও রেথন কোম্পানির প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি Active Denial System মিলিমিটার পর্যায়ে ওয়েব তৈরি করে। এটি মানবদেহের ১/৬৪ চামড়া ভেদ করতে সক্ষম। পানির অনুকে ভাঙ্গা, তাপ উৎপাদন করার মতো কাজ করা সম্ভব। এটি এমন অনুভূতি তৈরি করে তা রোধ করা ভিক্টিমের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এনার্জি অস্ত্র ভবিষ্যতে খুব কার্যকর হবে সত্য। কিন্তু সমস্যা হলো, শত্রুর অস্ত্র তারা নিজ দেশের নাগরিক, অন্য দেশের বেসামরিক নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করছে।

জিসাস মেন্ডোজা মেলডেন্ডোর গল্প

সবচেয়ে অবাক করা কেস আমাদের কাছে এসেছে টেক্সাস থেকে। জিসাস মেন্ডোজা মেলডেন্ডো ইলেক্ট্রনিক, মাইক্রোওয়েভ হয়রানি, গ্যাং স্টকিং ও নজরদারির শিকার হয়েছেন। এর কারণ ছিল তার তথ্য ফাঁস। যথার্থ দলিল, ইউটিউব ভিডিও সিরিজে তিনি তার গল্প বলেছেন। অবশ্য তিনি শারীরিকভাবে অনেক দূর্বল। তিনি সিআইএ থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চপর্যায়ে পর্যন্ত কথা বলেছেন যে তিনি ও তার পরিবারকে এসব কিছু থেকে রেহাই দেওয়া হয়। তার কেস সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছে।

মেলডেন্ডোর পক্ষে যে ফাইল তৈরি করা হয়েছিল, তার কিছু ধারা হলো:

- রেডিয়েশনের বিকিরণ শারীরিক অবস্থাকে দূর্বল করে তুলছে। বিষয়টি মহোদয়কে জানানো হয়েছে। তাই পূণর্বাসনের দাবি করা হচ্ছে।
- বাদি অন্যকে সমস্যাগুলো বলার পরপর ইলেক্ট্রনিক আগ্রাসন বেড়ে গিয়েছে।
- বাদির ৩ বছর বয়সী ছেলে ও ৪ বছর বয়সী মেয়ে বিভিন্ন রোগে ভুগছে। পরীক্ষায় উচ্চমাত্রার রেডিয়েশন ক্ষরণ প্রকাশ পেয়েছে।
- বাদির ৩ বছর বয়সী ছেলের মাথায় অনেক বীমের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে।
- বাদির ৩ বছর বয়সী ছেলের মাথায় পরীক্ষার সময় দেখা যায় অনেক মাইক্রোওয়েভ বীম চলছে। শিশুটি ব্যথায় কেঁদে দেয়।
- বাদি ইলেক্ট্রনিক আগ্রাসনের ভিডিও টেপ ধারণ করেছেন।
- একটি মাইক্রোওয়েভ মিটারে দেখা যায় বাদি ও বাদির বাচ্চাদের বেডে অনেক মাইক্রোওয়েভ বীম আছে।
- বাদির শিশুরা রেডিয়েশনের প্রবেশের পর প্রবল ব্যথা অনুভব করে।
- বাদির শিশুরা ঘুমন্ত অবস্থায় খিঁচুনির শিকার হয়।

মেলডেন্ডোর নিজস্ব ব্লগে তার গল্প (http://jesusmendozza.blogspot.com) সাইটে প্রকাশিত হয়েছে। তার কষ্ট নিয়ে আদালতে তিনি যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। বিচারক হলো তারাই, যারা পুরো দুর্ভোগের নাটের গুরু। তিনি লিখেছেন, "১৯৯৭ সালে আমি প্রথমবারের মতো রেডিয়েশন দ্বারা আক্রান্ত হই। আমি মিচিগানের ল্যান্সিং এ অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ ল স্কুল, Thomas M. Cooley Law School এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করি। এটাই আমার দূর্ভোগের কারণ। আমি তখন সে ল স্কুলে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।"

মেলডেন্ডো তারপর আবিষ্কার করেন তার শরীর দূর্বল হয়ে আসছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। যখন তিনি স্কুলকে নিয়ে সরকারের জোচ্চুরি, বর্ণবাদের প্রমাণ তুলে দেন তারপরই তার এ সমস্যা শুরু হয়। সরকারি কর্মকর্তারা তার ল ডিগ্রিও কেড়ে নেয়।

ডিনের লিস্টে থাকা অবস্থায় তিনি তার উপর মাইক্রোওয়েভ ও ইলেক্ট্রনিক আক্রমণ অনুভব করেন। পড়ালেখা শেষ করার আগেই তিনি টেক্সাস চলে যান। তিনি সরকারের তোয়াক্কা না করে, মাথা উঁচু করে ও ভালো ক্যারিয়ার নিয়ে স্কুল

ছেড়েছেন। তিনি তার পরিবারের উপর থেকে এ হয়রানি সরাতে না পেরে মামলা দায়ের করেন।

২০০৩ সালে মেলডেন্ডো তৎকালীন এটর্নি জেনারেল জন এশক্রফটের বিরুদ্ধে কোর্টে দাঁড়ান। তিনি হয়রানি, বাচ্চাদের উপর এর প্রভাব এবং তার বাসা সরিয়ে নিতে বাধ্য হওয়াসহ সব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি তার বাচ্চাদের ব্যাপার নিয়ে অভিযোগ করেন। তার বাচ্চারা অস্বাভাবিক, দূর্বল হয়ে যাচ্ছে ও কথায় জড়তা প্রকাশ পাচ্ছে। তার এক মেয়ের পায়েও টিউমার ধরা পড়েছে।

আজ পর্যন্ত মেলডেন্ডো কোনো সুবিচার পাননি।

২০০৮ থেকে তিনি ব্লগিং শুরু করেন। অনেক সাইকোলজিস্টই বিষয়গুলোকে মানসিক সমস্যা বলে উড়িয়ে দেন। সে দিন মনে হয় শেষ। মানুষ সত্যিকার অর্থেই তাদের মাথায় শব্দ শুনতে পায়।

প্রতিরক্ষা

কোনোভাবেই কী আমাদের মনের উপর আগ্রাসন বন্ধ করা যায় না? মাইক্রোওয়েভ, ইলেক্ট্রনিক ও V2K হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ফোরামে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

কিছু নিরাপত্তা কৌশল হলো:

- মাইক্রোওয়েভ আক্রমণ থেকে বাঁচতে চামড়ার কাপড় পরা।
- ইলেক্ট্রিক্যাল আক্রমণ থেকে বাঁচতে রাবার গ্লাভস, জুতো, ক্যাপ, বুট ব্যবহার।
- ইতিবাচক দোয়া বা শ্লোক আতঙ্ক থেকে বাঁচতে কার্যকরী।
- ভিক্টিমদের প্রতি উদার মানসিকতা লালন করেন এমন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া।
- ব্যস্ত থাকা ও নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- V2K এপিসোডের সময় টিভি বা রেডিওর আওয়াজ বাড়িয়ে দেওয়া। কিংবা বাইরে জনকোলাহলে চলে যাওয়া।
- থেরাপুটিক ম্যাগনেট ব্যবহার ও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তিকে রোধ করে এমন পোষাকাশাক পরিধান।
- গ্যাং ইভটিজিং ও যাত্রা হয় এমন স্থান এড়িয়ে চলা।

- বাইরের শব্দ রোধ করতে এয়ারপ্লাগ ব্যবহার।

আপনি অনেক কোম্পানিই পাবেন যারা এমন নিয়ন্ত্রণ বিরোধী পোষাক বানায়, বিক্রি করে। সত্যিকার অর্থে তাদের বেশিরভাগই আসলে সরকারেরই কাজ করে। তাদের চেয়ে এসব ফোরাম বেশি কার্যকরী। কেননা এসব ফোরাম সদস্যরা নিজেরা ভিক্টিম ছিলেন। তারাই জানেন কীভাবে লড়তে হবে।

দাবিকৃত সবাই কিন্তু ভিক্টিম ছিলেন না। অনেকেই বুঝে গিয়েছিলেন কেন তারা টার্গেটেড হয়েছিলেন। কোনো ঘটনা হয়তো কোনো সিন্ডিকেটকে হতাশ করেছে, কিংবা কেউ হয়তো কোনো তথ্য ফাঁস করবে বা হয়তো কেউ কোনো গোয়েন্দাবাহিনীতে যুক্ত। কিন্তু বেশিরভাগ ভিক্টিমই সাধারণ মানুষ, যাদের সাথে কোনো সমস্যার কোনো লেনদেন নেই। এটিই আতঙ্কের বিষয়। যদি এসব ভিক্টিমদের অল্প পরিমাণও নতুন প্রযুক্তিগুলো দ্বারা আক্রান্ত হয় তার মানে হলো আমরা যে কেউই হতে পারি পরবর্তী টার্গেট। কেবল শ্বাস নিতে জানি- এটাই একমাত্র কারণ আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণের।

Chemtrails, HAARP and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth-এর লেখক ইলানা ফ্রিল্যান্ড তার "This Covert Electromagnetic Era: Directed Energy Weapons (DEWs) for Political Control"-বইয়ে আমাদের উপর ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তি প্রয়োগ হওয়ার ইতিহাস নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

স্যাটেলাইট আপনার উপর নজরদারি করছেন—বিষয়টি বোঝার জন্য আপনাকে রকেট সায়েন্স পড়তে হবে না। নজরদারি কেবল সন্ত্রাসীরাই করে না। নির্যাতন, জবাবদিহি, নিউরোফোন জিজ্ঞাসাবাদ, ব্রেনওয়েব এনালাইজার দিয়ে তারা আমাদের ঘরেই যুদ্ধবন্দিদের মতো কনসান্ট্রেশন ক্যাম্প করছে। এর ভিক্টিম আমরাই। তারা আমাদেরকে মানসিকভাবে ধর্ষণ করছে ও আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি চুরি করছে। নীরব, অদৃশ্য ও শক্তিশালি অস্ত্র দিয়ে তারা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কাজে লাগাচ্ছে।

আমরা হলাম বুদ্ধিমান গিনিপিগ।

একটি দাবা, মানসিক স্বাস্থ্য হরণ—যে কাউকে টার্গেট করা, হয়রানি করা, নিয়ন্ত্রণ করা—পুরোটাই Mind Game। তারা আমাদেরকে মনকে চুরি করতে চায়। তারা আপনাকে জানাতে চায় তারা আপনার মালিক। তারা আপনার নিঃশর্ত আনুগত্য ও দাসত্ব চায়। সংক্ষেপে বলা যায়, তারা চায় আপনি জোম্বি ও বিভ্রান্ত হয়ে উঠুন। আপনার চেতনা থেকে তাদেরকে সরানো শিখতে হবে। তাদেরকে সুযোগ দেওয়া যাবে না।

\- *Targeted Individuals 101 Survival Guide থেকে।*

আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে: আমেরিকার নজরদারি

আমরা দ্রুত এমন বিশ্বে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে আমাদের সকল পণ্য আমাদের উপর নজরদারি, গোয়েন্দাবৃত্তি করবে।

- হাওয়ার্ড রেইনগোল্ড।

সচেতনভাবে আমি কখনোই আমেরিকার সরকারকে জনসাধারণের গোপনীয়তা, ইন্টারনেট স্বাধীনতা ও মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেব না। তারা গোপনে পুরো বিশ্বেই তাদের অবস্থান গড়ে তুলছে।

- এডওয়ার্ড স্নোডেন।

আমরা একা নই।

না! আমরা এলিয়েন বা ইউএফও নিয়ে শঙ্কিত না। আমরা সেসব চোখ ও কান নিয়ে শঙ্কিত যারা সবখানেই আমাদেরকে অনুসরণ করে। এ চোখ ও কানের মালিক মানুষ। তারা কোনো না কোনোভাবেই আমাদেরকে ২৪/৭ অনুসরণ করে।

গোপনীয়তা ও ছদ্মবেশের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা নতুন প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছি। আমরা আমাদের কেনা পণ্যগুলো দিয়ে আমরা কি করি, কোথায় আছি, কার সাথে আছি এগুলো তাদেরকে জানার সুযোগ করে দিই। আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারেও কোন নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি না। সবাই সবার সব তথ্যই জানতে পারবে, যদি সে জানে কোথায় যেতে হয়।

কারো ডেস্কের নিচে মাইক্রোফোন রেখে, ফোন টেপ করে, গাড়িকে অনুসরণ করে, বাইনোকুলার ব্যবহার করে, লিপ রিডিং দিয়ে গোয়েন্দাগিরির দিন শেষ। এখন ট্রাক করতে আর টেলিস্কোপেরও প্রয়োজন নেই।

এখন আমাদের স্যাটেলাইট, ড্রোন, সেলফোন ও কম্পিউটার আছে। ঘরে কিংবা বাইরে, রাস্তায় কিংবা বেডরুমে এগুলো দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করা যায়।

ইলেকট্রনিক নজরদারি

Amendment IV

প্রত্যেক মানুষের অপ্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বা আত্মসাৎ থেকে নিজের পরিবার, বাসা, দলিল এবং কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ রাখার অধিকার আছে। যথার্থ কারণ ও

ওয়ারেন্ট ছাড়া কোন প্রকার অনুসন্ধান করা যাবে না। ওয়ারেন্টে পরিষ্কারভাবে ব্যক্তি, স্থান এবং কারণ লিখা থাকতে হবে।

আমাদের সংবিধানের চতুর্থ আমেন্ডম্যান্ট হলো গোপনীয়তার অধিকার সংক্রান্ত। কর্ণেল ইউনিভার্সিটির Legal Information Institute-এর ওয়েবসাইট অনুসারে, "চতুর্থ আমেন্ডম্যান্ট মূলত প্রতিটি ঘরকে এক একটি দূর্গ বানিয়ে দিয়েছে। সরকারের অপ্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও আত্মসাৎ থেকে এটি নাগরিকদের রক্ষা করে। স্বল্প প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে ইস্যু করা ওয়ারেন্ট, ওয়্যারট্যাব, নজরদারির যেকোন ডিভাইস থেকে এটি জনসাধারণকে রক্ষা করে।"

অথচ আজ আমাদের গোপনীয়তার অধিকার হুমকির মুখে। আমাদের দুশ্চিন্তা হলো দুইপ্রকার ইলেকট্রনিক নজরদারি নিয়ে। একটি হল ওয়্যার কমিউনিকেশন (Wire Communication)। এগুলো আমাদের ফোনকল, ক্যাবল ইত্যাদিকে বোঝায়। যে ডাটা, তথ্য এবং শব্দ এক স্থান হতে অন্যস্থানে যায় তা পথিমধ্যে চুরি করে ফেলা সম্ভব। এবার ই-মেইল, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কথা ভেবে দেখুন। সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের নজরদারির জন্য চতুর্থ আমেন্ডম্যান অনুসারে যথার্থ ওয়ারেন্ট প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির, নির্দিষ্ট কোন সময়ের, নির্দিষ্ট কোন কথোপকথন শোনার জন্য যৌক্তিক ওয়ারেন্ট বের করার চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের কথা শোনা আরো সহজ। এজন্য কোন ওয়ারেন্টের প্রয়োজন হয় না।

৯/১১ এর পর জর্জ বুশ প্রশাসন Patriot Act পাশ করেন। যার ফলে এখন নজরদারি পানির মত সহজ হয়ে গিয়েছে। কোন ওয়ারেন্ট আর প্রয়োজন হয় না। কর্ণেল ইউনিভার্সিটির Legal Information Institute-এর মতে, জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং সাংগঠনিক কোন অপরাধের সন্দেহ থেকে নজরদারি করা যায়। Patriot Act মানুষের গোপনীয়তা অধিকারের সবধরনের আইনকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এই আইনটি দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পরেছে। প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশে কোন প্রকার ওয়ারেন্ট ছাড়াই সরকার যেকোন আমেরিকান নাগরিকের উপর ওয়ারট্যাপিং করতে পারে। এ আইনটি এতটাই হাস্যকর যে, কোন গোয়েন্দা শুধুমাত্র ইচ্ছে হলেই যে কারো উপর এভাবে নজরদারি করে।

এখন আপনি শুয়ে থাকতে পারেন আর ভাবতে পারেন যে এসব কোন কিছুই আপনার উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে না। কেউ হয়তো কখনও আপনার কিছু শোনেননি কিংবা দেখেনি। তাহলে আপনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। এই নজরদারির প্রক্রিয়া এত বেশি বিস্তৃত যে আপনি হয়তো দুষ্টুমি করে আপনার অপছন্দের কোন রাজনীতিবিদের মৃত্যু কামনা করলেন কিংবা দুষ্টুমি করে আপনার বন্ধুকে বললেন, "আমি ওই হেডকোয়ার্টারটি উড়িয়ে দিব!" তাহলে আপনার জন্য ওয়াটারবোর্ডিং (মুখে পানি ঢালতে থাকা। এতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় ব্যক্তি মারাও যায়।) অপেক্ষা করছে। কারণ আপনার সন্ত্রাসবাদের প্রমাণ আপনার ডিভাইসেই আছে।

স্নোডেন ও NSA

UK Guardian পত্রিকা ২০১৩ সালে প্রথম ইলেক্ট্রনিক নজরদারির বিষয়টি সবার সামনে নিয়ে আসে। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court) বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফোনকলের তথ্য জমা করা সংস্থা (Caller Information Center) Verizon এর কাছে তথ্য চেয়েছিল। NSA-এর ওয়াহু অফিসের কর্মকর্তা এডওয়ার্ড স্নোডেন এসব তথ্য বের করে আনেন। তিনি লক্ষ্য করেন, PRISM প্রোগ্রামটির আওতায় আমেরিকা তার জনগণের ফোনকল, নেট ব্যবহার ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে নজরদারি চালায়। Protect America Act-এর আওতায় ২০০৭ সালে NSA এ প্রোগ্রাম শুরু করে। জর্জ ওয়াকার বুশ এর অনুমোদন দেন। PRISM হয়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডাটাবেজ। এনক্রিপটেড তথ্যগুলোও এখানে উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়। যেকোনো তথ্য নিয়েই তারা কাজ করে। বিশেষ করে সেগুলো, যেগুলো FISC-র উদঘাটন করা প্রয়োজন মনে হয়।

স্নোডেন তথ্য যোগাড় করার সময় দুটো দিকে নজর রেখেছিলেন। প্রথমত, আমেরিকা যেভাবে নির্লজ্জভাবে তার নিজের দেশের নাগরিকদের উপর নজরদারি করছে সে তথ্য এবং দ্বিতীয়ত, যেগুলো মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তারপর স্নোডেন অসুস্থতা দেখিয়ে ছুটি নেন। চীনে চলে যান এবং ২০১৩ সালের জুনে UK Guardian তথ্যগুলো ফাঁস করা পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকেন। ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে The Washington Post আরো কিছু তথ্য যুক্ত করে প্রকাশ করে।

চীনের এক হোটেলে স্নোডেন সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সাথে সাথেই আমেরিকার সরকার তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ আনে, যার মধ্যে দুটিই ছিল Espionage Act বা গোয়েন্দাবৃত্তি।

স্নোডেনের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। তাকে অনেক দেশই তাদের দেশে থাকার অফার দেয়। কিন্তু তাও তিনি তার পরিচয় উন্মুক্ত রাখেন। কেননা ব্যক্তির পরিচয় জানলে তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। তিনি এ কাজ করার কারণ হিসেবে বলেন যে দেশে বিদেশে এভাবে আমেরিকানদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে।

AT&T ও অন্যদের মতোই Verizon মানুষের ক্রোধের মুখে পড়ে। প্রশ্ন হলো, কেন কোনো সন্ত্রাসী লিংক ছাড়াই তারা মানুষের তথ্য সংরক্ষণ করবে। CALEA বা Communication Assistance for Law Enforcement Act এর নির্দেশনা অনুসারে সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করার লক্ষ্যে ফোন কোম্পানিগুলো তথ্য সংরক্ষণ করে। তাই তাদের যুক্তি হলো, কাজটা অনৈতিক হলেও অবৈধ তো না! স্নোডেন CBS News এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন যে তিনি নিজেকে হিরো মনে করেন না। তিনি এমন বিশ্বে থাকতে চান না যেখানে কোনো প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা নেই। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে এটর্নি জেনারেলকে নজরদারির বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিয়ে মানুষের ক্রোধ দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মানুষ তাকে পাত্তা দেয়নি। মানুষের আশাভঙ্গ হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রটি কোনোভাবেই ওশেনিয়ার Big Brother এর চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

ল্যান্ডফোন বা সেলুলার ফোন- দুটোতেই দুই ধরনের নজরদারি আছে। একটি ব্যাপার হলো, আপনি কাকে কল দিচ্ছেন তা কেবল নজরদারিতে রাখা। আরেকটি হলো, আপনি কাকে কল দিচ্ছেন, কী কথা বলছেন, কোত্থেকে বলছেন তা নজরদারিতে রাখা, রেকর্ড করা ও নিয়ন্ত্রণ করা। প্রথমটা সরকার কারণ ছাড়াই, ওয়ারেন্ট ছাড়াই সহজেই করতে পারে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার যৌক্তিক কারণ প্রয়োজন। আমাদের বোঝা উচিত যে আমাদের সব তথ্যই কল সেন্টার জমা করে রাখে। যদি আমরা ধরেও নিই যে তারা এ কাজ আমাদের উপকারের জন্যই করে তাও কিন্তু এ তথ্যগুলো তুলনামূলক প্রভাবশালীদের জন্য উন্মুক্ত।

যখন আমাদের কথাবার্তাও রেকর্ডে এসে যায়, তখন বিষয়টি আরো জটিল, দুঃখজনক ও বিব্রতকর হয়ে যায়। আপনি আপনার মাকে যখন বলেন আপনার জুতোর দাম কতো সেটা CIA বা NSA র শোনা এক ব্যাপার, কিন্তু আপনি যখন আপনার স্ত্রী, গার্লফ্রেন্ড, কলিগের সাথে জরুরি বা রোমান্টিক কথা বলেন সেটা শোনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এনক্রিপশন আসার আগে ১৯৮০ বা ১৯৯০ এর দিকে, পুলিশ তাদের স্ক্যানার দিয়ে ল্যান্ডফোনে এ কাজ করত। কিন্তু সেটা বোঝা যেত। আজকে প্রযুক্তি উন্নত ও একে বুঝতে পারা আরো কঠিন।

যখন স্নোডেনের তথ্যগুলো সামনে আসে তখন অনেক আমেরিকান রাজনৈতিক ফোরাম বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলার চেষ্টা করে, "আমার উপর নজরদারি করলেও কিছু আসে যায় না। I have nothing to hide! আমি মুসলিম জঙ্গী না"। কিন্তু তারা বুঝতে পারলো না যে FBI, CIA এমন মানুষদের উপরও নজরদারি করছে যাদের সাথে সন্ত্রাসবাদ কিংবা ৯/১১ ধরনের আক্রমণের কোনো সম্পর্ক নেই। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে ACLU কিছু ঘরোয়া সন্ত্রাসবাদের তথ্য হাজির করে। নতুন এ তথ্য বলে, FBI প্রাণীসম্পদ সংরক্ষণকারি কিংবা পরিবেশবাদী গ্রুপগুলোকেও ঘরোয়া সন্ত্রাসের মতো চিহ্নিত ও আচরণ করছে। Greenpeace, PETA, University of Indiana প্রজেক্টেও FBI সন্ত্রাসীদের মতোই নজরদারি করছে, নাক গলাচ্ছে। যেন তারা 'Eco-Terrorist'। যেন এরাও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

ACLU-এর আন্না বিসন একজন Associate legal director। তিনি বলেন, "এ ধরনের গ্রুপগুলোকে ঘরোয়া সন্ত্রাসবাদী ট্যাগ দেওয়াটা কেবল দায়িত্বহীনতার পরিচয়ই নয়, বরং দেশীয় সুস্থ মানসিকতা ও রাজনীতির চর্চাকে এটি নষ্ট করে"।

বিসন আসল জায়গায় হাত দিয়েছেন। ৯/১১ এর পর থেকেই রাজনৈতিক বিরোধীতাকে যেন একেবারেই সহ্য করা হয় না। যেকোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও অহিংস নাগরিক প্রতিরোধকেও সন্ত্রাস হিসেবে দেখা হয়। PETA বা Greenpeace-এর কোনো অনুষ্ঠানে কখনো অংশগ্রহণকারী যে কাউকেই হুমকি মনে করা হয়। তারা এসব নিয়ে পরে আছে, অথচ দেশব্যাপীই অনেক ক্যাথলিক গ্রুপ সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে।

অহিংস CWG বা Catholic Workers Group-কেও সন্দেহের চোখে দেখা হয়। কারণ, তারা নাকি গোপনে কমিউনিস্ট! আসলে যখন CWG শান্তি, নিরাপত্তা ও সমতার কথা বলে তখন FBI এর কাছে এগুলো কমিউনিজম মনে হয়। ত্রাণসংস্থা, শ্রমিক সংঘ—সবাইকেই নজরদারি করা হয়। সন্ত্রাসবাদ ও অহিংস আন্দোলনের পার্থক্যটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল বুশ প্রশাসন।

৯/১১ এর পরে আমেরিকান জনগণ 'খারাপ লোকদের' আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য জোর দাবি জানায়। তাদের জানা ছিল না, একদিন তারাও এ 'খারাপ লোকদের' লিস্টে উঠে যাবে।

The Covert Electromagnetic Era-তে এলানা ফ্রিল্যান্ড লিখেন যে ৯/১১ বিশ্বকে অনেক দিক থেকেই পালটে দিয়েছে:

...বর্তমানে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক অস্ত্র ব্যবহার অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রেডিয়েটিং বা নন রেডিয়েটিং যন্ত্র, লেসার যন্ত্র—পৃথিবী বা মহাকাশে, স্মার্টফোন, ল্যান্ডফোন, আবেগ চিহ্নিত করার eXaudio সফটওয়্যার ইত্যাদি সব যন্ত্রেই নজরদারি করা হচ্ছে। এছাড়াও কম্পিউটার, প্যাটার্ন, কণ্ঠ, বায়োমেট্রিক বা রেটিনাল পরিচয়গুলো আমাদের গোপনীয়তা নষ্ট করছে। এগুলোর সাথে সাথে মস্তিষ্কের ওয়েভ চিহ্নিত করাও একটি বড় ব্যবসা (সামরিকভাবে টার্মটা হলো-Industrial Complex)। এ অদৃশ্য ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক যুগে সামরিক ও সাধারণ মানুষের পৃথকীকরণ রেখাটা উঠে যাচ্ছে। সবই যেন এখন যুদ্ধের ময়দান।

৯/১১ আক্রমণের পরে আমাদের সরকারই যেন আমাদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তাকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করছে। দেশেই এমন বন্ধু থাকলে বিদেশী শত্রুর দরকার কী?

সাইবার গোয়েন্দাবৃত্তি

ব্যতিক্রমী কলামিস্ট ক্লিভ থম্পসন ২০১৩ সালে আগস্টে Mother Jones Magazine এ "How To keep the NSA Out of your Computer" শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশ করেন। সেখানে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে কীভাবে ইন্টারনেটে নিজের জগৎ তৈরি করবেন, গোয়েন্দাদের নজরের বাইরে থাকবেন, বিনা পয়সায় নিরাপদ থাকবেন। Wi-Fi নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি নতুন নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়, যেখানে সাধারণ Wi-Fi এর চেয়ে অনেক দ্রুত

তথ্য যাতায়াত করে। একে Mesh বলা হয়। এ ধারণাটি গ্রিসের এথেন্স থেকে এসেছে। এ প্রক্রিয়ায় NSA-র স্যাটেলাইটের নিচেই আপনি আপনার জগৎ তৈরি করবেন। কিছু ফ্রি জিনিসপত্র থাকলেই কাজ হয়ে যায়। এথেন্সের ১০০০ এর বেশি মানুষ এ কাজ করেছে। যেকোনো জায়গায় একাজ করে ফেলা যায়।

থম্পসন বলেন, Mesh হলো সামাজিক খাবার দাবারের সহযোগীতার মতো। এখানে প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব যন্ত্রগুলো অন্যদের কাজে লাগাতে সাহায্য করে। এখানে প্রতিটি কম্পিউটার নিজেকে তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে ব্যবহার করে। এক সময়ে একটিই হাব। স্পেনে গুইফি ম্যাশ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যাশ। এতে ২১,০০০ সদস্য আছে। Free Network Foundation এর সহ প্রতিষ্ঠাতা আইজাক ওয়াইল্ডার এ ম্যাশ প্রতিষ্ঠা করেছেন যেন তার প্রতিবেশীরা কম খরচে ইন্টারনেট সুবিধা পান। তারা ব্যয়বহুল নেট ব্যবহার করতে পারেন না। ম্যাশ মূলত অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায়ই গড়ে উঠেছিল। এখানে রাজনৈতিক কর্মকান্ড আরো বেশি গোপনীয়তার সাথে করা যায়। আইপি সরবরাহকারী বা সরকারের দৃষ্টির আওতায় এসব থাকে না।

যদিও বিশ্বব্যাপী নিরাপদ ইন্টারনেট এখনও স্বপ্নই রয়ে গিয়েছে, তাও ম্যাশাররা চেষ্টা করছে। থম্পসন তাই মনে করেন।

আপনার মোবাইল হয়তো গোয়েন্দা কিন্তু সাইবার গোয়েন্দাও এর চেয়ে কম যায় না। ওয়েব টেপিং এর ফলে তারা ইউজার কোনো সাইটে যায় তা তার আইপির মাধ্যমে জেনে নেয়। আপনি যদি আপনার ব্রাউজিং হিস্টোরি প্রাইভেট করে রাখেন সেটা কেবল আপনার বাবা-মা থেকেই আপনাকে বাঁচাবে।

আপনাকে গোয়েন্দাদের হাত থেকে এটি বাঁচাবে না। আপনি ভুলেও গুগলে কোনো ভুল শব্দ বা তাদের দৃষ্টিতে সন্দেহজনক শব্দ সার্চ করে ফেলেন তাহলে আপনি সোজা সন্ত্রাসীদের ডাটাবেজে। এ কাজকে Patriot Act এর মাধ্যমে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। আপনি সন্ধ্যাকালীন বিনোদনের জন্য কোনো সাইটের কোনো লিংকে ভুলে ক্লিক পড়ে গেলে আপনাকে শিশু পর্নের জন্য জেলে যেতে হবে।

স্নোডেনের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, গুগলের মতো এনএসএর সার্চ ইঞ্জিন হলো ICREACH। এটি ৮৫০ বিলিয়নের অধিক কল, মেইল, লোকেশন, ফ্যাক্স, চ্যাট, পোস্ট ও ম্যাসেজ জমা রাখতে পারে। ICREACH বিদেশীদের তথ্যকে বিশেষ

গুরুত্ব দিয়ে দেখে। কিন্তু তারা আমেরিকার এতো মানুষকেও নজরদারিতে রাখছে যাদের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোনো লেনদেন নেই। "The Surveillance Engine: How the NSA Built Its Own Secret Google" শিরোনামে The Intercept-এ যে প্রবন্ধ ছাপা হয় তা অনুসারে, DEA, FBI, CIA, DIA-সহ বিভিন্ন গোয়েন্দাসংস্থার হাজারো গোয়েন্দা ICREACH-এ কাজ করে। এটি হলো আমেরিকার সবচেয়ে বড় ডাটাবেজ। এতে প্রতিদিন পাঁচ মিলিয়ন তথ্য জমা হয়।

অনেক এক্সপার্টও এমন ধারণক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। New York University School of Law-এর Liberty And National Security Programme-এর কো ডিরেক্টর এলিজাবেথ গইটেন বলেন, "আগে বলা হতো যে মেটাডাটা আসলে তথ্য না, বরং একটা সংকেত জমা রাখে। আজকে আর সেদিন নেই।"

সিকিউরিটি ও কাউন্টার টেররিজম অফিসের ডিরেক্টর জেনারেল চার্লস ফারের মতে, সরকার ফেসবুক, গুগল, টুইটার ইত্যাদি থেকে তথ্য গ্রহণ করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। তারা এগুলোকে বহির্মুখী মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে। আমাদের চ্যাট বা পোস্ট হ্যাক করে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা চলে যায়।

আপনার কোনো সার্চ হয়তো তাদের কোনো কিওয়ার্ডের সাথে মিলে গেল, তাহলে আপনাকে শিশুকাম, সন্ত্রাসবাদ, জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকিসহ অনেক কারণেই জেলে যেতে হতে পারে। এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো সার্চ হয়ই। সেগুলোকে Mindblogging এর আওতায় রাখা হয়। কম্পিউটারের নিজস্ব কিওয়ার্ড অনেক সময় ভুলভাল তথ্য দেয়। ইমেইলের জন্য এনএসএর একটি আলাদা ডাটাবেজ আছে—পিনওয়েল। আপনি কম্পিউটারে কোনো শব্দ লিখলেই তা খুঁজে বের করা সম্ভব। আপনি অনলাইনে নাকি অফলাইনে লিখছেন তা ব্যাপার না। আমাদের কম্পিউটারের হার্ডওয়ারেও এক্সেস করা সম্ভব। এফবিআই প্রায় সব কম্পিউটারেই নিজস্ব সফটওয়্যার ইন্সটল করে দেয়। ফলে সব তথ্য সেখানে চলে যায়।

এসবের কারণ হলো তথ্য ফাঁসকারী হুইসেল ব্লোয়ার, সন্ত্রাসী, বিদ্রোহী ও গোয়েন্দাদের পথ রুদ্ধ করা। আমাদের ডাটা থেকেই ট্রাফিক ম্যাপ তৈরি করা হয়। এ ডাটাগুলো থেকে হয়তো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বের করা সম্ভব। কিন্তু

আমেরিকা তাদের বিরোধী যে কোনো আদর্শকেই ধ্বংসযোগ্য মনে করে। আপনার পোস্ট নিয়ে সতর্ক থাকুন! সাইবার হয়রানি বা গালগাল দিয়ে খুব সহজেই ব্যক্তিকে বের করে ফেলা সম্ভব। তথ্যই শক্তি। তথ্য দিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অনেকসময় সামলাতে না পেরে মানুষ আত্মহত্যা করে। তথ্যের সমুদ্র থেকে সরকার হয়তো আসলেই কেবল সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের উপর আসা হুমকিগুলো আমরা ফেলে দিতে পারি না। এ মানুষগুলোকে বিশ্বাস করার সুযোগ নেই।

Salon.com এর রিপোর্টার ও Big Brother Is Coming এর লেখক ক্যাথারিন ক্রাম্প ও ম্যাথিউ হার্ডউড সন্দেহ করেন যে ২০২০ সালের মধ্যে আমরা আমাদের জীবন পুরোটাই অনলাইন কেন্দ্রিক করে ফেলব। অথচ ৩০ বিলিয়নের বেশি ডিভাইস 'Big Data'-য় সংযুক্ত আছে। আর আমাদের 'Big Brother' আমাদের কার, ঘরোয়া বিষয়াশয়, পার্কিং গ্যারেজের লাইট- সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। আমাদের সব কাজ নেট দিয়েই হবে। একজন লেখক বলেন, "ইন্টারনেটের অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অসুবিধাও ভয়াবহ। কোম্পানিগুলো আপনার ভেতর ও বাহিরে সবকিছু জানা শুরু করবে। আজকের স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট ও সাইবার স্পেসের যুগে সেদিন খুব বেশি দেরি নয় যখন কর্পোরেশনগুলো আমাদের বাসা, কার কিংবা অফিসের লাইট, এসি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আনবে। সেটা সরকারও হতে পারে"।

স্মার্ট হোমগুলোতে স্মোক ডিকেক্টর ও ফায়ার এলার্ম আছে—এগুলোও নেটের সাথে যুক্ত। টোস্টের বার-বি-কিউ ও সত্যিকার আগুনের পার্থক্য আছে। আমরা বাসায় ঢোকার আগেই স্মার্ট টিভি আমাদের পছন্দের চ্যানেল চালিয়ে দেয়। স্মার্ট ফ্রিজ বিয়ার প্রস্তুত করে ফেলে। স্মার্ট গ্যারেজ এক মাইল দূরে থাকতেই দরজা খুলে ফেলে। iBeacon ও Turnstyle-এর মতো অ্যাপগুলো আমাদেরকে রেস্টুরেন্টে যেমন সাহায্য করে, তেমন জিপিএস লোকেটর দিয়ে নজরদারিও করে। কানাডার টরোন্টতে Turnstyle বহুল ব্যবহৃত। তারা আপনার সব চলাফেরাই জানে। ফেসবুকে লগ ইন করা থেকে শুরু করে আপনার ওয়াইফাই পর্যন্ত তারা ইন্সটল করে দেয়। তারপর সব অ্যাপে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবাধ যাতায়াত তো আছেই!

Newark Liberty International Airport এর মতো শক্তি সঞ্চায়ক এলইডি দিয়ে রাস্তার স্মার্ট লাইট বানানো হয়। মজার বিষয় হলো, পোর্ট কর্তৃপক্ষ এ লাইটগুলোর এলইডিকে ক্যামেরা হিসেবেও ব্যবহার করে। তারা লম্বা লাইন, কারের লাইসেন্স প্লেট, সন্দেহজনক কাজকর্ম অবলোকন করার জন্য এসব ব্যবহার করে। কারের লাইসেন্স প্লেটের সাথে সাথে ড্রাইভারও চিহ্নিত হয়ে যায়, যেন ভবিষ্যতে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এসব কাজে লাগাতে পারে। হতেও পারে যে, আপনার কারের ছবিও পুলিশের ফটো অ্যালবামে আছে!

স্মার্ট প্রযুক্তি এগুলো সবই করতে পারে। কিন্তু আমরা কি এতোটা গর্দভ যে আমাদের সবকিছুই আমরা ইন্টারনেট ও তার পেছনের অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে খুলে বসবো?

বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপক নজরদারী

বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে বড় গোয়েন্দাবৃত্তি চালানো হয়। আমরা আমাদের টাকা দিয়েই যে ডিভাইস কিনি, যে আনন্দ করি, নিজেদের নেট খরচ করে যা কিছু শেয়ার করি, যেখানে যাই সবই তারা সংগ্রহ করে। আমাদের টাকায়ই আমরা তথ্য তুলে দিচ্ছি। আমাদেরকে যে Store Card দেওয়া হয়, তার জন্য গুগল থেকে লগ ইন করতে হয়। করার সাথে সাথেই কেল্লাফতে! আমাদের শপিং এর অভ্যাস ধারণ করা হয় ও বিশ্লেষণের জন্য রেখে দেওয়া হয়। এটা হয়তো অফার বা এ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোতে আমাদেরকে সাহায্য করে কিন্তু আমাদের সব তখন উন্মুক্ত হয়ে যায়।

Google AdSense, OpenSocial বা Facebook Ads এর মতোই ইন্টারনেটে বাণিজ্যিক কিছু সোশ্যাল প্রোগ্রামিং দিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের প্রোফাইল ও পরিচয় তারা ফলো করে এবং আমাদের থেকে যতটা সম্ভব সুবিধা আদায় করে নেয়। আমাদের লোকেশনও ট্র্যাক করা হয় এবং আমাদের শপিং, খাওয়া দাওয়া সবকিছু জমা রাখা হয়। তারা আমাদের গোপনীয়তা নিয়ে চিন্তিত না। এগুলোর মাধ্যমে আমরা যদি ক্লাব বা রেস্টুরেন্ট সার্চ করি তাহলে তো আরো সহজ। প্রত্যেকটা চেক ইনে আমরা নিজেরাই তথ্য দিয়ে দিচ্ছি।

আমরা প্রযুক্তিতে যতই এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা একাধিক চোখের সামনে আমাদের গোপনীয়তা হারাচ্ছি। আসলে আমরা যতই পুলিশি রাষ্ট্র কিংবা নজরদারির রাষ্ট্রের দিকে এগোচ্ছি ততটাই এটিই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়

হুমকি হয়ে উঠছে। একসময় হয়তো অধিকাংশ মানুষই নিজেদের ব্যবহার করা প্রযুক্তিই ছেড়ে দেবে।

যে চোখ আকাশে

যেকোনো শহরেই হেঁটে রাস্তার ক্যামেরাগুলো দেখে নিন। সকল স্থানেই ক্যামেরা আছে ও তাদের তথ্য যাচ্ছে নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে। আজকাল দেশের মাটিতেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে। সত্যিকার অপরাধীদের সাথে সাথে সাধারণ মানুষ এমনসব তথ্যের কারণে আটকে যাচ্ছে যার পেছনে আদৌ কোনো মানুষের হাত নেই। নজরদারি আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। আমরা আরো উন্মুক্ত হয়েছি।

যেমন রাস্তার কথাই ধরুন। যুদ্ধ, সংঘাত বা দাঙ্গার জন্য রাস্তার ক্যামেরা ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু সুক্ষ্ম কিছু ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনও আজকাল ভয়াবহ অপরাধ। DMV বা সরকারি অফিসে আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা মেনে নিতে পারি। কিন্তু আমাদের ফোনে, রাস্তায়, অফিসে, ক্যাফেতে সবখানে নজরদারি। মানে কী এসবের? Patriot Act-কে দোষ দেওয়া যায়। আমরা আরো নিরাপদ হতে চেয়েছিলাম আর এজন্য নাকি তারা এসকল কিছু করতে বাধ্য হয়েছে।

২০০০ সালের পর ৯/১১ যে হুমকি তৈরি করেছে তার কারণে শিকাগোর মেয়র রিচার্ড ডেলি তার অঞ্চলে Operation Virtual Shield (OVS) জারি করেন। তিনি ক্যামেরায় প্রায় ঢেকে দেন শহরকে। এগুলো ছিল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের সাথে সংযুক্ত। এতে ২০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হয় ও পুরো খরচ বহন করে দেশীয় নিরাপত্তা বিভাগ। বায়োলজিক্যাল, কেমিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল সেন্সর বসানো হয়। কেন্দ্রীয় অফিসে মনিটর বসানো হয় যেন অফিসের লোকরাই এসবে নজরদারি করতে পারে।

২০১৪ সালে সেইন্ট লুইস, মিসওরির সকল নজরদারি, মানুষের গোপনীয়তা হরণ ইত্যাদি নিয়ে আপত্তি তোলে ACLU। দুই বছরে অসংখ্য ক্যামেরা বাড়ানো হয়েছে সেইন্ট লুইসে। সেখানে চারটি নজরদারির নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। এগুলোকে যুক্ত করেছে সোলজার্স মেমোরিয়ালের কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জেফরি ফিডম্যানের নেতৃত্বে ACLU পুলিশি রাষ্ট্র হওয়ার সমূহ সম্ভাবনার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যদিও মেয়র এ ব্যবস্থার অনেক প্রশংসা করেছেন।

অন্যদিকে DARPA, CTS বা Combat Eyes That See নামের একটি প্রকল্প হাতে নেয়। পেন্টাগনের সহায়তায় তা সর্ববৃহৎ নজরদারির প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কোম্পানি ও বিশ্ববিদ্যালয় মিলে এ প্রকল্প গড়ে তোলে। যুদ্ধে বা গোপন স্থানে যোদ্ধাদের নিরাপত্তায় এটি কাজ করত। যখন জানা গেল সীমিত আকারে আমেরিকার মাটিতেও এটি ব্যবহৃত হবে তখন আপত্তি উঠেছে। প্রতি নাগরিকের কারের প্লেট ও চেহারা তাদের আওতায় থাকবে। Village Voice এ ৮ জুলাই, ২০০৩ এ Big Brother Gets A Brain নামের আর্টিকেল ছাপা হয়। সেখানে নোয়াহ সাচম্যান লিখেন, "আপনার যেকোনো সন্দেহজনক বা তাদের দৃষ্টিতে সন্দেহজনক কাজ আপনাকে কালো তালিকাভুক্ত করবে।"

যদিও পুরো প্রক্রিয়াই সন্ত্রাস দমনের নামে করা হয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই তা রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নে রূপ নিচ্ছে, যেমন হয়েছিল ওশেনিয়ার ইনার পার্টির শাসনামলে। সেদিন দূরে নয় যেদিন ছোটখাটো নিরীহ কাজও সন্দেহজনক হিসেবে গণ্য করা হবে।

ওহিও ভিত্তিক কোম্পানি Persistent Surveillance Systems (PSS) মনে করে, একদিন সব শহরই নজরদারিতে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করবে। PSS Hawk Eye II নামের একটি এয়ারক্রাফট ব্যবহার করেছিল। তাদের প্রেসিডেন্ট রোজ মেকনাট দাবি করেছেন যে ছয় ঘণ্টার ফ্লাইটে এটি প্রায় ৫০টি অপরাধ শনাক্ত করেছে। *Washington Post*'s Business and Technology এ ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। মেকনাট মনে করেন, এতে কেবল অপরাধই কমবে না বরং উন্নয়ন বাড়বে, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমবে, জেলগুলোতে চাপ কমবে।

এটি আইনের মানুষদের সাথে কোম্পানির যৌথ কার্যক্রমের সুন্দর উদাহরণ।

মহাশূন্য থেকে নজরদারি

আকাশের দিকে তাকান। স্যাটেলাইট আছে আকাশে। আকাশ থেকে তার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। স্যাটেলাইটের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নজরদারি—অপরাধী ও মৃতদেহ খুঁজে বের করে, সন্ত্রাসী ও তাদের আস্তানা খুঁজে বের করে ও অপরাধ দমন করতে সাহায্য করে। Big Brother এখন কেবল মাটিতেই না, আকাশেও তার রাজত্ব।

একটি পিনের মাথাও তারা লোকেট করতে পারে, আপনার কার, বাড়ির পিছের কদাকার বাগান তো বাদই দিলাম। চ্যাথাম হাউজের থিংক ট্যাংকের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার গবেষণা সম্পাদক প্যাট্রিসিয়া লুইস বলেন, মহাকাশ নজরদারি রিজলিউশন বা মানের ক্ষেত্রে অন্যমাত্রায় চলে গিয়েছে। তার মতে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় কাজ করা প্রত্যেকেই এসব তথ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে। লুইস CNNTech's Spy Satellites Fight Crime From Space-এ এক সাক্ষাৎকারে ক্যারেন মংকসকে বলেন, এদের মধ্যে মাদক ও অস্ত্র ব্যবসায়ীরাও আছে। এখন ছবি দেখেই মানুষকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে গোপনীয়তার অধিকার নিয়ে।

২০০৩ সালের ১৯ জুলাই "The Menace of Satellite Surveillance" শিরোনামে EducateYourself.org-তে জন ফ্লেমিং একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি সেখানে লিখেছেন, একটি গোয়েন্দা স্যাটেলাইট টার্গেটের যেকোনো কাজ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ব্যাপার না, সে ঘরে থাকুক বা হাইওয়েতে, পরিবেশ গরম হোক বা শীতল।

মাত্র তিনটি স্যাটেলাইট প্রয়োজন হয় পুরো কাজটি করার জন্য। সরকার বা সামরিক বা গোয়েন্দাবাহিনীর যে কেউ কেবল মূল অফিসে বসে তথ্যগুলো পর্যবেক্ষণ করবে, ব্যস! Lockheed বা Boeing এর মতো সংগঠনগুলোও এগুলো থেকে উপকৃত হয়। ১৯৮০ সালে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান যখন Star Wars প্রকল্প ঘোষণা করেন তখন থেকেই এসব কাজ কম বেশি মাত্রায় হয়ে আসছে। আজকে এ প্রযুক্তি তো অন্য মাত্রায় উঠে গিয়েছে। ফ্লেমিং আমাদের বিশেষত এসব নজরদারির সাথে আমাদের চিন্তা ও বিবেক নিয়ন্ত্রণের সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

আপনি জানতেও পারবেন না কখন তারা আপনাকে টার্গেট করেছে। আপনি হয়তো সন্ত্রাসী কিছুর সাথে জড়িতও না, হয়তো আপনার বন্ধুকে আপনি কেবল অস্ত্রের অঙ্গভঙ্গি দেখিয়েছেন। তারা যেকোনো সময়, যেকোনো অবস্থায় আপনাকে অনুসরণ করে। সামনে অবস্থা আরো খারাপ হবে। আপনার বাসার ভেতরের জানালা ভেদ করার ক্ষমতাও যখন তাদের চলে এসেছে সামনে তারা কী করবে তা তো বলাই বাহুল্য।

ড্রোনের যুগ

সরকার ও সামরিক বাহিনী, বাহিনী ছাড়াই রাষ্ট্রকে পুলিশি রাষ্ট্র বানানোর জন্য জনসাধারণের নিরাপত্তার নামে বিষয়টি নিয়ে আসে। সামরিক ও ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে ব্যাপকহারে আমাদের দেশে এসব ব্যবহৃত হয়। এগুলো ছোট, রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস। আমরা দেখি, জানি কিন্তু বিকার হয় না। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

দেশের প্রতি অঞ্চলেই অপরাধীদেরকে নজরে রাখার জন্য ড্রোন ব্যবহৃত হচ্ছে। FAA ২০২০ সাল থেকে প্রায় ৭০০০ ড্রোন মোতায়েন করবে। অথচ তাদের এসব করার কোনো সাংবিধানিক অধিকার নেই। এমনকি সামরিক বাহিনীরও না। কিন্তু এসব ঘটেই যাচ্ছে। National Conference of State Legislatures তাদের ৪০টি প্রদেশ থেকে ৭০টি রিপোর্ট পেশ করেছে।

নিজ দেশে এসব ব্যবহার মানুষকে আতঙ্কিত করে রাখে। বিদ্রোহও আছে। মানুষ পাখির মতো গুলি করে ড্রোন ভূপাতিত করে। বেশ কয়েকদিন পাখিকে নিয়ে রিপোর্ট করা হচ্ছে। মানুষের সাথে সাথে পাখিরা পর্যন্ত 'বিদেশী আধিপত্য' মনে করে তাদেরকে ঠুকড়ে নামিয়ে দিচ্ছে।

লুকানো ক্যামেরা বা স্যাটেলাইটের চেয়ে ড্রোন বেশি দেখা যায় বলেই হয়তো এমন প্রতিক্রিয়া। যদি কেউ এসবের ব্যাপারে বিস্তারিত জানত তবে ড্রোনকে খুব ছোট মনে হতো তার! আঞ্চলিক অপরাধ দমন বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এটা খুব কার্যকরী অস্ত্র। অস্ত্রসজ্জিত ড্রোন দেশের বাইরে অন্য এলাকায় যুদ্ধে পাঠানো হয়। তবে যাই হোক, যেকোনো শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রে ড্রোন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। প্রমাণ সংগ্রহ ও দমনে বিদ্রোহ বা খুব প্রয়োজনে ড্রোন ব্যবহার করা যেতে পারে। মজার বিষয় হলো, সন্ত্রাসীরাও ড্রোন ব্যবহার করে।

২০১৪ সালের অক্টোবরে অনেক সংবাদমাধ্যমই ফ্রান্সের আকাশে অজানা ড্রোন ঘুরতে দেখেছে। Creys-Malville Power Plant রাতে ও ভোরে কিছু ড্রোনের উপস্থিতি রিপোর্ট করেছে। একে ফ্রান্সের গোয়েন্দাবিভাগ একেবারেই পাত্তা দেয়নি। Greenpeace এর তীব্র বিরোধিতা করেছে। অজানা ড্রোন যে আমাদের হত্যার উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হবে না তার নিশ্চয়তা কী?

আফগানিস্তানে ওয়ার অন টেররে ২০০৭ সালে ব্যবহৃত MQ9 Reaper Drone. USAF Photographic Archive থেকে।

নিউ ইয়র্কে NYPD কঠোরভাবে সন্ত্রাসীদের ড্রোন নিয়ে আলোচনা করেছে। CBS News-এ তারা তাদের এ আপত্তি জানায়। জেফ পেগুসের মতে, তারা কোনো সত্যিকার প্রমাণ দেখাতে না পারলেও ভবিষ্যতের হামলা নিয়ে উদ্বিগ্ন। ডেপুটি পুলিশ চীফ স্যালভাতর ডিপ্যাস বলেন, "আমরা মনে করি এটি সন্ত্রাসীদের হতেও পারে।" এসব রিমোট কন্ট্রোল ড্রোনের মাধ্যমে রীতিমতো জীবাণু বোমা কিংবা বিষাক্ত গ্যাস ছড়ানো যায়! তারা কাজ করে লুকিয়েও যেতে পারে। অফিসার ড্যারিল মডসলি ও সার্জেন্ট এন্টনিও হার্নান্দেজ নামের দুজন এভিয়েশন ইউনিট সদস্য বিষয়টি সামনে আনার পর NYPD আসলেই চিন্তিত হয়ে পড়ে। হার্নান্দেজ বলেন, "আমরা রাতে নাইট ভিশন গগলস পড়ে হাঁটছিলাম, তখন আমরা এসব ড্রোন দেখি। তাদের চলাফেরা ছিল খুবই সতর্ক।"

তাদের কোনো ধারণা ছিল না যে এসব ড্রোনের মালিক কে। মডসলি বলেন, "আমাদের নিজেদেরকে জিম্মি মনে হচ্ছিল। আমরা জানি না কীভাবে এর মোকাবেলা করব।"

কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার ডলার দিয়েই আজকাল ড্রোন কেনা যায়। টিউটোরিয়াল দেখেও আজকাল ড্রোন বানানো যায়। ড্রোন খুবই সহজলভ্য একটি অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি কীভাবে নিশ্চিত হবেন, কোনটা সামরিক বাহিনীর ড্রোন আর কোনটা সন্ত্রাসীদের? কোন ধরনের চিহ্ন তা নিশ্চিত করবে? সামনে হয়তো ড্রোন ভূপাতিত করার ঘটনা খুব সাধারণ হয়ে যাবে।

২০১৫ সালে FAA একটি নিয়ম প্রস্তাবনা করে যা বাস্তবায়ন হলে আরো ৭০০০ কোম্পানি তাদের নিজস্ব ড্রোন মোতায়েন করার ক্ষমতা পাবে। এ প্রস্তাবনা ড্রোন ব্যবহারে কোম্পানীগুলো ও সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা বাড়িয়ে দেবে। এ প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন হলে সরকার, গোয়েন্দা বাহিনী, সামরিক বাহিনী উদারভাবে তাদের ড্রোন দিয়ে যাচ্ছেতাই করবে। কর্পোরেশনগুলোও নিজস্ব স্বার্থে ড্রোন বানিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ঢুকে পড়বে। এমনকি সন্ত্রাসীদেরও এতে সুবিধা হবে। আমরা হয়তো 'নিরাপদ' হবো। কিন্তু আমাদের মাথার উপর ঘুরবে সরকারের চোখ, কান...এমনকি অস্ত্রও!

আপনার জানালার বাইরে এমন কিছু দেখে আপনার নিশ্চয় তাকে স্বর্গের দূত মনে হবে না। মানুষ এতে আতংকিত হয়, উন্মুক্ত অনুভব করে। যারা নিজেদের রাষ্ট্রকে সার্বভৌম মনে করে ও নিজেদের গোপনীয়তার অধিকারে

বিশ্বাস করে তাদের অনুভূতি কেমন হবে? তারা যখন দেখবে তাদের ছবি নেওয়া হচ্ছে তখন তারা কি সন্ত্রাসীদের সাথে সরকারের পার্থক্য খুঁজে পাবে? রিমোট কন্ট্রোল প্লেন পূর্বেকার কথা। কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল ড্রোন এখন আপনার প্রতিবেশী।

ইলেক্ট্রনিক চিপ

আপনি কি জানেন, আপনার চামড়ার নিচ থেকেই আপনার উপর নজরদারি করা যায়? ষড়যন্ত্র তত্ত্বের প্রবক্তাদের অনেকেই প্রাণীর মতো মানুষের মধ্যেও চিপের মাধ্যমে কাজ করানোর কথা বলতেন। এসব মাইক্রোচিপ কেবল জেনেটিক কোডই ধারণ করবে না বরং সেগুলো মেডিকেল রিপোর্ট, ব্যাংকিং এর তথ্য, পেশাগত তথ্যও ধারণ করবে। আমাদের অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতে আমাদের সকল তথ্যসহ খুব ছোট একটা চিপ আমাদের চামড়ার নিচে জুড়ে দেওয়া হবে। আমাদেরকে এভাবে ট্র্যাকও করা যাবে।

Radio frequency identification (RFID) tags এর জগতে আপনাকে স্বাগতম। এটি খুব ছোট একটা চিপ। এর কাজ নিয়ে আগে কথা হয়েছে। অবাক লাগছে? RFDI গাড়ি, পোষাপ্রাণী, এলজেমারের রোগী ট্র্যাক করতেও ব্যবহৃত হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট রেডিও ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে। পণ্য শিপিং এর ক্ষেত্রে কোম্পানীর কাছে পণ্যের তথ্য এভাবে চলে আসে।

গোপনীয়তার প্রশ্ন যখন আসে তখন আমরা আমাদের তথ্য খারাপ হাতে পড়ার ব্যাপারে ছাড় দিতে পারি না। চিপগুলো অনেক প্রকার হতে পারে- সক্রিয়, রিমোট কন্ট্রোল, ব্যাটারিচালিত। এগুলো আইডি সিগনাল ট্রান্সমিট করে। তথ্যগুলোর দুই প্রকার পাঠক আছে।

- Active Reader Passive Tag systems, তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে, ট্যাগ পড়ে ও সত্যিকার উত্তর বের করে আনে।
- Active Reader Active Tags। এরা সক্রিয় চিপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সক্রিয় পাঠক। ব্যাটারিচালিত চিপেও মাঝেমধ্যে এরা কাজ করে।

মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে চিপের তথ্যগুলো কোম্পানির মর্জিমতো ব্যবহৃত হয়। তারা তাদের ইচ্ছেমতো তথ্য গ্রহণ করে। আসলে দ্বিমুখী রেডিওর মতো উভয় পক্ষ থেকে তথ্য আদান-প্রদান হয়, লোকেশন সরবরাহ হয়- স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

রেডিও তরঙ্গে সিগনাল নিয়ে কাজ করার জন্যই কেবল RFID ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ই পাঠকের এন্টেনার দূরত্বের সাথে এর সম্পর্ক থাকে না। আমাদের ক্রেডিট কার্ড, লাইসেন্স নিয়ে তথ্য এমন মানুষদের কাছে আছে যাদেরকে আপনি চেনেনই না। তারা আমাদের আচরণ পর্যন্ত দেখছে ও বিশ্লেষণ করছে! ক্রেতার ব্যবহারের সাথে চিপের কার্যকারিতা কিন্তু রদবদল হয় না। স্টোরকার্ড, ক্রেডিটকার্ডে এসব চিপ থাকে। হয়তো সেগুলোও নজরদারির হাতিয়ার। (অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে ঢেকে রাখলে এ আশংকা কমে যায়)

মানবদেহে এর ব্যবহার হলো জঘন্যতম অপরাধ। একটা সময় যে সরকার চিপ বসাতে মানুষকে বাধ্য করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? এখন তারা নজরদারি ছাড়া বৈধ পণ্য কেনার অধিকারও অস্বীকার করছে। একসময় নজরদারির আওতায় না থাকার ইচ্ছেই কি অপরাধ হয়ে যাবে? আপনি হাসপাতালে গেলে, এনেসথেশিয়ার জন্য বেরোলেন তো আপনার দূর্বলতা চিহ্নিত হয়ে গেল। ভাবতেই অবাক লাগে আমাদের উপর নজরদারিতার মাত্রা দেখলে!

কোনো লাইনে দাঁড়ানো লোকদের উপর নজরদারি করা এক কথা, কিন্তু আমাদের মেডিকেল রিপোর্ট, অর্থনৈতিক ও ক্যারিয়ারের উপর নজরদারি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রতেও চিপ আছে। তারা এখন মানুষের অনুভূতি ব্যতিরেকেই চিপ বসিয়ে দেওয়ার চিন্তা করছে।

Big Brother is watching you, সবসময়, সব অবস্থায়। নিরাপত্তা, আমাদের ক্রয়কৃত পণ্যের জন্য আমরা আমাদের গোপনীয়তাকে আর কতো বিসর্জন দেব? আমাদের টাকাতেই তারা আমাদের উপর গোয়েন্দাবৃত্তি করে। আমরা অনেক নজরদারির মধ্যে থাকতে পারি, কিন্তু এর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলে আমরা এগুলো এড়াতেও শিখে যাব। বাঁচতে হলে জানতে হবে। আমরা চিনে যাব আসল নাটের গুরু কে।

উপসংহার: আপনার বিবেকের মালিক কে?

মুক্তমন থাকার মূল সমস্যা হলো মানুষ বেশি বেশি একে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে।

- টেরি প্র্যাটচ্যাট।

গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সরকারের দারস্থ হওয়ার মানে হলো ভাইরাসকে উইন্ডোজ রক্ষা করতে বলা।

- জন পেরি বারলো।

অন্টারিও, কানাডা লরেন্টিয়ান ইউনিভার্সিটির ফিজিওলজি ও নিউরোসায়েন্সের প্রফেসর ড. মাইকেল পারসিঙ্গার সম্পর্কে আমরা আগের বইয়েও লিখেছি। তিনি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে কাজ করেছেন। মানুষের মস্তিষ্কের উপর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাব, নজরদারির ভূত সওয়ার করা, ছায়া দেখে ভীত হওয়া, কিংবা দুঃস্বপ্নের মাঝে থাকা নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। তিনি তার On the Possibility of Directly Accessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorithms আর্টিকেলে যা লিখেছেন তাতে বিশ্ব যেন ফেটে পড়েছে। ১৯৯৫ সালে Perceptual & Motor Skills-এ আর্টিকেলটি প্রকাশ হওয়ার পর বিশ্বের অনেক ম্যাগাজিন ও সাইটে এটি প্রকাশিত হয়।

তিনি তার আর্টিকেলে তার পরীক্ষালব্ধ তথ্যের কথা বলেন। তিনি Fundamental Algorithms-এর প্রয়োগের মাধ্যমে মস্তিষ্কে কীভাবে নতুন ধরনের কোড তৈরি করে দেওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করেছেন। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এসব ফিল্ড ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ করে দেওয়া যায়। এসব সংকেত সাম্প্রতিক সময়ের যোগাযোগ মাধ্যম ও জিওম্যাগনেটিক কার্যক্রমের মতোই। 10Hz এর চেয়ে 1.0Hz এদিক সেদিক করে মস্তিষ্কের তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মিউজিক ঠিক করে দিলে যেকোনো মানব মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করা সম্ভব।

পারসিঙ্গার বিগত কয়েক যুগ নিউরোসায়েন্স ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করে একটি বিষয় বুঝেছেন। তা হলো, মানুষের উপর কোনো প্রকার হিপনোটিজম বা

এ ধরনের কিছু প্রয়োগ করা ছাড়াই প্রায় ৬ বিলিয়ন ব্রেইনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বরং মানুষের মস্তিষ্কের তথ্যকে একটি মিডিয়ামে এনেই তা করা যায়।

ম্যাট্রিক্স, তাই না?

আপনি একবার না, শতবার পড়ুন। তাও আপনি যে সিদ্ধান্তে আসবেন তা হলো নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন না শিখলে আপনি নিয়ন্ত্রিত হবেন। প্রযুক্তি হোক, কৃষ্টি হোক, যেভাবেই হোক—এ নিয়ন্ত্রণ হবেই। সরকার, মিলিটারি, ধর্মগুরু—প্রতিনিয়তই চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের নিয়ন্ত্রণের নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কারের।

প্রশ্ন হলো, আমরা কি এসব এড়াতে পারব?

দুটো প্রবন্ধ আছে বিষয়টি নিয়ে।

এক. "Mind Control Scientists Claim Ability to Turn Off Consciousness," যা লিখেছেন নিক ওয়েস্ট। তিনি ২০১৪ সালে জুলাইয়ে The Sleuth Journal এ প্রবন্ধটা লিখেছিলেন। আমেরিকার cutting-edge BRAIN project, কিংবা ইউকের the HUMAN BRAIN PROJECT দেখুন। এগুলো মস্তিষ্কের তথ্য বের করা, বিভ্রান্ত করা, এমনকি সরাসরি মস্তিষ্কে তথ্য দিয়ে দেওয়ার আলোচনা চলছে। আরো অবাক করা তথ্য দিচ্ছে George Washington University-এর বিজ্ঞানীরা। published in the *Epilepsy and Behavior Journal* এ *New Scientist*-এর হেলেন থমসন জুলাই ২০১৪ তে তার প্রবন্ধ "Consciousness On-off Switch Discovered Deep in Brain." লিখেন। তার দিকনির্দেশনা দেন নিউরোসায়েন্টিস্ট মুহাম্মদ কুবেসি ও তার টিম। তারা একজন নারীর চেতনাকে তার ক্লস্ট্রাম (নিউরোকর্টেক্সের নিচে নিউরনের পাতলা শীট) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। তিনি এপিলেপ্সিতে ভুগতেন। তারা ইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে মস্তিষ্কে চেতনা সৃষ্টি করছিলেন। কাজটা ক্লস্ট্রামের কাছেই হয়েছে, যেখানে এর আগে কেউ কাজ করেনি।

উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে এ কাজের ফলাফল হলো- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। কাজ বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথেই জ্ঞান ফিরে পান এবং আগের সবকিছু ভুলে যান।

দুই. UK Guardian-এ ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত, "Neuroscience Could Mean Soldiers Controlling Weapons with Minds". কারো অস্ত্রের সাথে তার অন্তর জুড়ে দিতে পারলে তাকে অসাধারণ যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলা যায়। UK National Academy of Science's Royal Society Report-এ মূল রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। আরো বলা হয়, সামনে এমন প্রযুক্তিও আসবে যার ফলে যোদ্ধার শক্তি বাড়বে, যুদ্ধে শত্রুবাহিনী ঘুমিয়ে পড়বে, বন্দি কথা বলবে। transcranial direct current stimulation (tDCS) প্রযুক্তির সাহায্যে সহজেই এসব করা যায়।

V2K, তাই না?

আমাদের মন, আমাদের চেতনা, আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের নেই। হয়তো অনেক আগেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

১৯৭৫ সালে গণহত্যার অস্ত্র প্রতিরোধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি প্রস্তাবনা আনে। যার শিরোনাম ছিল , "Prohibition of the Development and Manufacture of New Types of Weapons of Mass Destruction and New Systems of Such Weapons." সেখানে উল্লেখিত কিছু অস্ত্র হলো:

- রেডিওলজিক্যাল অস্ত্র যা কিনা নিউক্লিয়ার অস্ত্রের মতোই ভয়াবহ।
- পার্টিক্যাল বীম অস্ত্র যা কিনা শারীরিকভাবে ব্যবহার এক ধরনের যুদ্ধাপরাধ।
- Infrasonic acoustic radiation weapons.
- নির্দিষ্ট রেডিও ফ্রিকুয়েন্সিতে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক অস্ত্র। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর এর প্রভাব ভয়াবহ।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পশ্চিমারা এ প্রস্তাবে কোনো পাত্তাই দেয়নি।

বায়োলজিক্যাল ও কেমিক্যাল অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে, নিষেধগুলোকে আরো কাটছাঁট করা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন মাইক্রোওয়েভ বা ইনফ্রাসাউন্ড ব্যবহার করে মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তারের অস্ত্র, নন-লিথাল অস্ত্র নিয়ে কেউ ভাবেনি। আরও মজার ব্যাপার হলো, যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে এ অস্ত্রগুলো ভদ্রভাবে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে ব্যবহৃত হয়। হয়তো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যাপারে তারা একমত হয়েছে, কিন্তু অপরের মন, বিবেক ও আচরণ

নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেউ একমত হয়নি। তারা তো আর কাউকে খুন করছে না, তাই না?!

Resonance: The Bioelectromagnetic Special Interest Group এর প্রকাশক জুডি ওয়াল তার প্রবন্ধ "Military Use of Silent Sound: Mind Control Weapons"-এ বলেন, গালফ যুদ্ধে সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করেই তারা এ কাজ করেছে। সাদ্দাম হোসাইনের সামরিক ও সরকারি সিস্টেম ধ্বংসে যে এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে তা ১৯৯১ সালের মার্চে সরাসরি স্বীকার করা হয়েছে। অপারেশন ডেজার্ট স্টোর্মে আঞ্চলিক রেডিও স্টেশনে ফ্রিকুয়েন্সির খেলা দেখিয়েছে পশ্চিমারা। হঠাৎ করেই ইসলামী গান ও দেশপ্রেমের আবৃত্তির সাথে সাথে আজব আজব সামরিক নির্দেশনা আসা শুরু করল। ঘোষণা করা হয়েছিল, মনস্তাত্বিক যুদ্ধের অভিজ্ঞরা ইরাকে পৌঁছে গিয়েছে। তারা এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে যেন সরাসরি শ্রবণকারীর অন্তরে কথা বলা যায়, তার মস্তিষ্কের কাজে লাগানো যায় ও কৃত্রিমভাবে সকল নেতিবাচক অনুভূতি প্রবেশ করানো হয়, যেমন ভয়, হতাশা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি।

ওয়ালের মতে, পরবর্তীতে যুদ্ধের আগেই ইরাকী বাহিনীর আত্মসমর্পণের এটি একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। নয় আর কী কারণ থাকতে পারে এমন একটি দলের এমন অসহায় আত্মসমর্পণের যারা বিশ্বাসের জন্য লড়ছিল, তারপরই ফিরে এল ও আত্মসমর্পণ করল?

জর্জিয়ার নরক্রসের ড. অলিভার লোয়ারি ১৯৯২ সালে "Silent Subliminal Presentation System"-অস্ত্র উদ্ভাবন করেন। তার মতে, সকল ধরনের সংকেত একই নয়। এগুলো অনেকসময় একই সময়ে অনেক সংকেত কাজ করে। আবার অনেকসময় এগুলো মেকানিক, ম্যাগনেটিক সংকেত হিসেবে জমা থাকে ও সময়ে সময়ে কাজ করে। জুডি ওয়াল তার Nexus Magazine এ বলেন, Silent Sounds, Inc. কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড টিলটন তার অস্ত্রকে S-quad বলেন। ১৯৯৬ সালের ১৩ ডিসেম্বরে তিনি বলেন, তিনি উন্নত মানের প্রযুক্তিতে EEG প্যাটার্নে মানুষের মস্তিষ্কে কাজ করেন, তাদের অনুভূতি ও তথ্য রেকর্ড করেন ও ধীরে ধীরে বদলে দেন। মজার ব্যাপার হলো, এ তথ্য

আমেরিকাই গোপন করেছে। আগে নাৎসি ও সোভিয়েত এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। টিলটনের মতে, ইরাকে এ প্রযুক্তি ভালোই ফল দিয়েছে।

আসুন মূল আলোচনায় ফিরে আসি। এসব প্রযুক্তি ১৯৯০এর দশক থেকেই আছে। তার মানে কী? অস্ত্রগুলো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে? তারা কি জিতে গিয়েছে? আমাদের কি কিছুই করার নেই? মাথায় রাখতে হবে, আমরাও ২৫ বছর এগিয়ে গিয়েছি। আমাদের হাতেও এমন কিছু আছে যা আগে কল্পনা করা যেত না।

আমরা এমন একটি সময়ে আছি যখন পিঁপড়া থেকে হাতির আকারের ড্রোন আছে, আমাদের মোবাইল, রাস্তার সিসিটিভি সবাই আমাদের উপর নজরদারি করছে। স্যাটেলাইট আমাদের অবস্থান, পরিচয়, নেটে ভ্রমণ সব ট্র্যাক করছে। আমরা অদৃশ্য হওয়ার সুযোগ নেই। আমাদেরকে তারা যেকোনো সময় যেকোনো কিছুই করতে পারে। আমাদেরকে বিরক্ত, অনুসরণ, প্রভাবিত, নির্যাতিত, পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ, বোকা বানানো, ধ্বংস- সব যেকোনো উপায়েই করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর আমরা ভাবি, "আরেহ! এসব তো পাগলের প্রলাপ!"

আমাদের মন, দেহ আমাদের নেই আর।

গান ভালোবাসেন? গানও আজকাল আপনার আচরণ নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগানো হয়। খেলার মূল কারিগররা বিকট আওয়াজের মিউজিককে খারাপ জোকের সাথে ব্যবহার করে মনকে প্রভাবিত করে। কিন্তু সবাই এর বলি হয় না। জাতিসংঘ ও ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস এ প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। আবু গারিব ও গুয়ান্তানামো কারাগারগুলোতে এ প্রক্রিয়ায় কাজ করা হয়েছিল। টেক্সাসের ওয়াকোতে ডেভিড কোরেশ এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকা পানামা আক্রমণের পর হলি সিস এম্বেসীতে এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়

মিউজিক শুধুমাত্র মনকে ভুলিয়ে রাখে না, নিয়ন্ত্রণও করে। ২০১২ সালের অক্টোবরে। Scientific American-এ একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম ছিল, "The Power of Music"। সেখানে বলা হয়, আমাদের মস্তিষ্ক একেক প্যাটার্নের সুরে একেক ধরনের সংকেত দেয়। বিটের ভূমিকাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। মিউজিক আমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেটা আমাদের

আচরণেও প্রভাব ফেলে। অনেক সময় দুটো বিষয়ই একসাথে নিয়ন্ত্রিত হয়। সাইকোলজিস্ট এনেট স্কির্মার নিউরোসায়েন্সের এক প্রোগ্রামে বলেন যে কেবল আবেগ নিয়ন্ত্রণই একমাত্র কাজ নয়। আসলে সমাজকে উপস্থাপন করে মিউজিক। মিউজিক আমাদের চিন্তাশক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। মিউজিকের মাধ্যমে কোনো বিষয় সাধারণ করে তোলা খুবই সহজ। বোঝাই যাচ্ছে, ধর্মগুরুরা কেন ট্রান্সে মিউজিক যুক্ত করেন। ট্রান্স নাচ, Rave আমাদের চেতনার উপর ড্রাগের মতো কাজ করে। ড্রাম বাজানো, সমন্বিত উচ্ছাস, বিভিন্ন মাত্রার বিট মানুষকে গভীর অনুভূতিতে নিয়ে যায়।

আরো বোঝা যায়, মানুষ কেন বিভিন্ন কনসার্টে গিয়ে সহিংস হয়ে যায়, পাংক বা হেভি মেটাল কনসার্টে মানুষের আগ্রাসনের তীব্রতা কেন বেড়ে যায়। মিউজিক আমাদেরকে পরিবর্তন করে, আমাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের চিন্তাশক্তি ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের সকল ডিভাইস থেকে আসা মিউজিকের দরুন সেদিন বেশি দূরে না যেদিন আমরা জীবন্মৃত ব্যক্তি, জোম্বির মতো ঘুরব। সবাই যদিও একে খারাপভাবে দেখেন না। স্কির্মার নিজেই তার আর্টিকেলের শেষদিকে বলেছেন, "বর্তমান পৃথিবীর এসকল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলে, বিষয়টি আমাদেরকে পরস্পর আরো কাছে নিয়ে আসবে।"

এসব ধারণা হলো ছুরির মতো—কাটবেন নয় কেটে ফেলবে।

যেহেতু আমরা আশাবাদি মানুষ, তাই এ বইটিকে আমরা এমন হতাশাজনক, অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাপ্তিতে ফেলে রাখতে চাই না। যদিও আমরা সব ধরনের বিবেক নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেছি, তাও আমাদের অনেক সুযোগ আছে। আমাদের সেই শক্তিও ভুলে গেলে চলবে না যা আমাদেরকে 'মানুষ' বানিয়েছে। মানব সভ্যতা, স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বের জায়গা থেকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে, অতীত নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করতে হবে। আমাদেরকে অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে, বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে হবে ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে। জ্ঞানই শক্তি। সচেতনতাই শক্তি। বোধদয়ই শক্তি।

মনে রাখবেন, লক্ষ্য পূরণে মন নিয়ন্ত্রণ কিন্তু ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। আমাদের নিজের এসব উন্নয়ন আমাদেরকে আনন্দ দেবে, ভয় নয়। স্নেহ, ফোকাস বৃদ্ধি, উদ্দেশ্য ঠিক করা, এমনকি হিপনোসিসও অনেককে ওজন কমাতে, ধূমপান ছাড়তে, স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে, জীবনে সফল হতে সাহায্য

করেছে। বিবেক, আচরণ, চিন্তা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া খারাপ না, যতক্ষণ সেটা আমরা করছি।

আমরা যা যা প্রযুক্তি আলোচনা করেছি, সুন্দর জীবনের জন্য যে প্রযুক্তিগুলো খুবই কার্যকর। ব্রেইন হ্যাকিং ও ব্রেইনে চিপ বসানো ইত্যাদি আমাদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজির প্রফেসর ও Future of the Brain: Essays by the World's Leading Neuroscientists-এর লেখক গ্যারি মার্কাস Business Insider-কে ২০১4 সালের আগস্টে বলেন, "আমরা মস্তিষ্ককে বুঝিতে চাচ্ছি। এমনকি তার সংকেতগুলোও ডিকোড করতে চাচ্ছি। আমরা ইতোমধ্যেই মস্তিষ্কে সংকেত পাঠানোর মাধ্যমে বধিরকে শোনানোর ব্যবস্থা করছি। আমরা পড়াশোনায় সাহায্য করছি এবং একদিন আমরা এভাবে হতাশার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারব।"

হয়তো আমাদের ব্রেনের চিপগুলো আমাদের মস্তিষ্কে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে, আমাদের ইলেক্ট্রিক চার্জগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

Brain Computing Interfacing নামে আরেকটি প্রকল্প আছে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এমন একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করেন যার নাম BrainGate। এখানে তারা এক প্যারালাইজড মহিলাকে নিয়ে কাজ করেছেন। মহিলা সেখানে কেবল চিন্তার মাধ্যমেই কার্সর নাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কম্পিউটারের সাথে আমাদের সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের নতুন ধারা উন্মোচন হলো! কোনো একদিন আমিরা কম্পিউটারের মাধ্যমে সব তথ্য আমাদের মস্তিষ্কে ধারণ করতে সক্ষম হবো। যদিও এটি খুবই চমৎকার আইডিয়া, কিন্তু ভুলভাবে ব্যবহারের আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কে চিপগুলো বানায়? আপনি কি নিশ্চিত যে এগুলোর মাধ্যমে তারা আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করবে না? কোন ধরনের তথ্যে আমরা হাবুডুবু খাই? তথ্যের সাগর কে নিয়ন্ত্রণ করে? আমাদের মস্তিষ্ক কীভাবে ভালো ডাটা পৃথক করতে সক্ষম হবে?

আমরা হয়তো এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি যার উত্তর আমাদের কাছে নেই। আমরা জানিনা আমাদের কী পছন্দ করা উচিত। আমরা হয় অজ্ঞ থেকে যাচ্ছি নয় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। তা উচিত নয়। এর সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করতে হবে। যেকোনো শক্তির চেয়ে শক্তিশালি হলো আমাদের মস্তিষ্ক। আপনার মস্তিষ্ক আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই তো কিছুই নেই।

এ বইটিতে বিবেক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক হয়রানি, নজরদারি, গোয়েন্দাগিরির ইতিহাসের কেবল একটি আউটলাইন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করি, বইটি আপনাদেরকে সতর্ক করবে ও আরো জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ সৃষ্টি করবে। ইঁদুরের গর্ত আরো গভীরে। পুরো বিষয় বুঝতে আপনাকে এতো গভীরে যেতে হবে যে আপনার মনে হবে ফিরে আসা অসম্ভব।

কী বাস্তব? কী ষড়যন্ত্র? এ দুটোর মধ্যে কোনটা সত্য? এসব প্রযুক্তি ও এজেন্ডার পেছনের পরাশক্তি কি আমাদেরকে অক্ষম বানিয়ে রাখতে সক্ষম?

শুধু যদি আমরা তাদেরকে সে সুযোগ দিই।

"আমেরিকায় সব সমস্যার মূল হলো মানুষকে মিথ্যা বিষয় বিশ্বাস করতে বাধ্য করা।"

- স্টিভেন জ্যাকবসন, লেখক ও পরিচালক, Mind Control in America and Wake-Up America

গ্রন্থপঞ্জি

1. ACLU. "New Documents Show FBI Targeting Environmental and Animal Rights Groups Activities as Domestic Terrorism." ACLU.org, December 20, 2005.
2. Adams, Jeanne. "I Am Many: Profiling the Ritual Abuse Survivor."
3. MKZine, Winter 2004.
4. Albergotti, Reed. "Furor Erupts Over Facebook Experiment on Users." The Wall Street Journal, June 29, 2014.
5. Albrecht, Katherine, and Liz McIntyre. SpyChips: How Major Coprorations and Government Plan to Track Your Every Purchase and Watch Your Every Move (New York: Plume, 2004).
6. American Psychiatric Association. "The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders."
7. Ansary, Alex. "Mass Mind Control Through Network Television." Outside the Box, May, 29, 2012.
8. Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New York: Penguin Classics, 2006).
9. Bailey, GmB. Closing the Gap: Gangstalking (CreateSpace Independent Publishing, 2010).
10. Barker, Dr. Allen. "Motives for Mind Control." MKZine, Spring/Summer 2003.
11. Barrett, Dierdre. "The Psychological Power of Hypnosis." Psychology Today, January 2001.
12. Bell, Catherine. Ritual: Perspectives and Dimensions (New York: Oxford University Press, 1997).
13. Ritual Theory, Ritual Practice (New York: Oxford University Press, 2009).
14. Bergstein, Brian. "Despite Promise, Energy Bean Weapons Still Missing From Action." MSNBC.com, July 9, 2005.

15. Birns, H.D. Hypnosis (Award Books, 1968).
16. "Bizarre Cults." Huffington Post, September 6, 2013.
17. Braiker, Harriet B. Who's Pulling Your Strings? How to Break the Cycle of Manipulation (New York: McGraw Hill, 2004).
18. Brick, Neil. "How Cues and Programming Work in Mind Control and Propaganda." The Ritual Abuse, Secretive Organization and Mind Control Conference, Connecticut, May 24, 2003.
19. "Survivor Tactics." MKZine, Summer 2005.
20. "Ritual Abuse and its Political Implications." MKZine, Summer 2005.
21. Brzezinski, Zbignew. Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era (Praeger Publishing, 1982).
22. Chase, Alton. "Harvard and the Making of the Unabomber." Atlantic Monthly, June 2000.
23. Childs, Joe. "Sara's Choice: Scientology Clergy Force a Mother to Choose: Son or Daughter." Tampa Bay Times, March 2014.
24. Chopra, Deepak. "5 Steps to Harness the Power of Intention."
25. MindBodyGreen.com, May 20, 2013. www.mindbodygreen.com/09603/5-steps-to-harness-the-power-of-intention.html.
26. Collins, Anne. In the Sleep Room: The Story of CIA Brainwashing Experiments in Canada, Reprint edition (Toronto, Canada: Key Porter Books, 1998).
27. Collins, Laura. "I Was a Queen of Scientology: President's Ex Wife Reveals the Church's Innermost Secrets and Why She Was Cast Into Darkness When She Finally Fled After 35 Years." UK Daily Mail Online, September 10–15, 2014.
28. Constantine, Alex. Virtual Government: CIA Mind Control Operations in America (Port Townsend, Wash.: Feral House, 1997).

29. Crump, Catherine, and Matthew Hardwood. "Big Brother Is Coming: Google, Mass Surveillance and the Rise of the Internet of Things." Salon.com, March 26, 2014.
30. Dober, Greg. "Experimentation on Prisoners: Persistent Dilemmas in Rights and Regulations." Prison Legal News, March 15, 2008.
31. Duncan, Robert. Operation Soulcatcher: Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Revealed (CreateSpace Independent Publishing, 2010). Emery, Carla. Secret, Don't Tell: The Encyclopedia of Hypnotism (Pigeon Forge, Tenn.: Acorn Hill Publishing, 1997).
32. "Experimental Evidence of Massive Scale Emotional Contagion Through Social Networks," Proceedings of the National Academy of Sciences, Volume 111, Number 24.
33. Fields, R. Douglas. "The Power of Music: Mind Control by Rhythmic Sound." Scientific American.com, October 19, 2012.
34. Flemming, John. "The Menace of Satellite Surveillance."
35. EducateYourself.org, June 19, 2003.
36. Freeland, Elana. "This Covert Electronic Era: Directed Energy Weapons for Political Control." Carnicorn Institute Webinar transcript, March 31, 2011.
37. Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth (Port Townsend, Wash.: Feral House, 2014).
38. Freeman, Jeremy, and Gary Marcus. The Future of the Brain: Essays by the World's Leading Neuroscientists (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2014).
39. Fulghum, David A. "Microwave Weapons May Be Ready for Iraq."
40. MKZine, Spring/Summer 2003.

41. Gallagher, Ryan. "The Surveillance Engine: How the NSA Built its Own Secret Google." FirstLook.org, The Intercept, August 25, 2104.
42. Goodwin, Karin. "Brainwash Victims Win Cash Claims. The Sunday Times, October 17, 2004.
43. Hambling, David. "A Game of Tag: Implants and Electronic Harassment." Fortean Times, May 2011.
44. Hammond, Dr. Corydon. "Cults, Ritual Abuse and Mind Control: Exploring the Role of Cults in Ritual Abuse and Mind Control."
45. Wanttoknow.info.
46. Hearst, Patricia Campbell, and Alvin Moscow. Every Secret Thing (New York: Doubleday, 1981).
47. Herrington, Boze. "The Seven Signs You're in a Cult." The Atlantic Online, June 18, 2014.
48. "High-Tech Psychological Warfare Arrives in the Middle East." ITV News Bureau Ltd. (London) news brief, March 23, 1991.
49. Hoffman, Michael A. Secret Societies and Psychological Warfare (Dresden, N.Y.: Wiswell Ruffin House, 1992).
50. Honor, Lenon. Website. www.lenonhonor.com.
51. Hunter, Edward. Brainwashing (New York: Pyramid Books, 1956).
52. "Hypnosis." New definition. Society of Psychological Hypnosis, Division 30, American Psychological Association.
53. Jacobsen, Annie. Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program That Brought Nazi Scientists to America (New York: Little, Brown and Company, 2014).
54. Jacobson, Steven. Mind Control in America. CD audio program, MCiA Media, 2004–2014.
55. Janis, Irving. Victims of Groupthink (New York: Houghton Mifflin, 1972).

56. Johnson-Davis, Anne. Hell Minus One: My Story of Deliverance From Satanic Ritual Abuse and My Journey to Freedom (Transcript Bulletin Publishing, 2008).
57. Jones, Marie D., and Larry Flaxman. The Grid: Exploring the Hidden Infrastructure of Reality (San Antonio, Tex.: Hierophant Publishing, 2013).
58. Justesen, Dr. Don R. "Microwaves and Behavior." American Psychologist 392 (March 1975): 391–401.
59. Karriker, W. "Torture-Based Mind Control as a Global Phenomenon," 13th International Conference on Violence, Abuse and Trauma, San Diego, California, September 2008.
60. Kurzweil, Ray. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (New York: Penguin Books, 2006).
61. Lammer, Dr. Helmut. Milabs: Military Mind Control and Alien Abductions (Illuminet Press, 1999).
62. Larry King Live. Guest Patty Hearst. CNN, January 22, 2002.
63. Leedom, Liane, MD. "Coercive Persuasion, Mind Control and Brainwashing." Lovefraud.com, August 31, 2007.
64. Leiser, Ken. "ACLU Study Warns of Unchecked Rise of Surveillance Cameras in St. Louis." St. Louis Dispatch, October 14, 2014.
65. Lifton, Robert J. Thought Reform and the Psychology of Totalism (University of North Carolina Press, July 1989).
66. MacMatzen, Morris. "Brain Hacking is Having Incredible Effects, and It's Just Getting Started." Yahoo.com Business Insider, August 16, 2014.
67. Madsen, Wayne. "James Holmes Family Tied to DARPA and Mind Manipulation Work." Blacklisted News, July 27, 2012.

68. Marks, John. The Search for the "Manchurian Candidate": The CIA and Mind Control (New York: Times Books, 1991).
69. McGowan, David. Programmed to Kill: The Politics of Serial Murder (iUniverse, 2004).
70. Monks, Kieron. "Spy Satellites Fight Crime From Space." CNNTech, August 12, 2014.
71. "Mystery Cults in the Greek and Roman World," Metropolitan Museum of Art Website. www.metmuseum.org/toah/hd/myst/hd_myst.htm. Naylor, Gloria. 1996 (Chicago, Ill.: Third World Press, 2006).
72. Neighbors, Jacob. "Obey Your Father: Jim Jones' Rhetoric of Deadly Persuasion." San Diego State University, "Alternative Considerations of Jonestown and Peoples Temple," March 20, 2014.
73. Osmundsen, John A. "Matador With a Radio Stops Wired Bull." New York Times, July 9, 2014.
74. Pegues, Jeff. "NYPD: Threat of Terrorists With Drones Is a Growing Concern." New York CBSLocal.com, October 29, 2014.
75. Pehanick, Maggie. "Revolutionary Suicide: A Rhetorical Examination of Jim Jones' 'Death Tape.'" San Diego State University "Alternative Considerations of Jonestown and Peoples Temple."
76. Persinger, M.A. "On the Possibility of Directly Accessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorithms." Perceptual and Motor Skills 80 (1995): 791.
77. Rath, Tom, and Donald O. Clifton, PhD. How Full Is Your Bucket? (New York: Gallup Press, 2004).
78. "The Reckoning: The Father of Sandy Hook Killer Searches for Answers." The New Yorker, March 17, 2014.
79. Redfern, Nick. Close Encounters of the Fatal Kind (Pompton Plains, N.J.: New Page Books, 2014).

80. Ross, Colin A. The CIA Doctors: Human Rights Violations by American Pyschiatrists (Richardson, Tex.: Manitou Communications, 2006).
81. Rutz, Carol. A Nation Betrayed: The Chilling True Story of Secret Cold War Experiments on Our Children and Other Innocent People (Grass Lake, Mich.: Fidelity Publishing, 2001).
82. "The Relevancy of Mind Control Today." MKZine, Winter/2003/2004.
83. Sample, Ian. "Neuroscience Could Mean Soldiers Controlling Weapons With Minds." The Guardian (UK), February 7, 2012.
84. Sasson, Remez. "The Power of Positive Thinking."
85. Successconciousness.com, September 2014.
86. "Senate MKUltra Hearing: Appendix C—Documents Referring to Subprojects," page 167 (in PDF document page numbering). Senate Select Committee on Intelligence and Committee on Human Resources, August 3, 1977.
87. Shachtman, Noah. "Big Brother Gets a Brain." Village Voice, July 8, 2003.
88. Simon, George K. In Sheep's Clothing: Understanding and Dealing With Manipulative People (Chicago, Ill.: Parkhurst Brothers, 1996).
89. Singer, Dr. Margaret. "Coercive Mind Control Tactics." F.A.C.T.Net.org.
90. Streatfeild, Dominic. Brainwash: The Secret History of Mind Control (New York: Picador, 2008).
91. "Stunning Tale of Brainwashing, the CIA and an Unsuspecting Scots Researcher." The Scotsman, 2007.
92. Sullivan, Kathleen. Unshackled: A Survivor's Story of Mind Control (Dandelion Books, LLC, 2003).
93. Sweeney, H. Michael. RFID, the TIAO, and the Mark of the Beast, Third edition (The Professional Paranoid [www.paranoidpress.com], 2005).

94. Sweeney, H. Michael. "Your Cell Phone Is a Government Agent Spying on You." Blog post. ProParanoid, July 20, 2012.
95. Taylor, Eldon. Mind Programming: From Persuasion and Brainwashing, to Self-Help and Practical Metaphysics (Carlsbad, Calif.: Hay House, 2010).
96. Taylor, Kathleen. Brainwashing: The Science of Thought Control (New York: Oxford Press, 2006).
97. Thompson, Clive. "How to Keep the NSA Out of Your Computer." Mother Jones Magazine, August 2013.
98. Thomson, Helen. "Consciousness On-Off Switch Discovered Deep in Brain." New Scientist, July 2, 2014.
99. Thorn, Victor. Conspireality (Stafford, Va.: Life and Liberty Publishing, 2013).
100. Timberg, Craig. "New Surveillance Technology Can Track Everyone in an Area for Several Hours at a Time." Washington Post, February 5, 2014.
101. Vincent, James. "Mass Surveillance of UK Citizens on Facebook, YouTube and Google is Legal, Says Official." The Independent (UK), June 17, 2014.
102. Wall, Judy. "Mind Control With Silent Sounds and Super Computers." Nexus Magazine, October/November 1998.
103. Waugh, Evelyn. The Ordeal of Gilbert Pinfold (New York: Back Bay Books, a division of Hachette, 2012).
104. Weinberger, Sharon. "Mind Games." Washington Post, January 14, 2007.
105. West, Nicholas. "7 Future Methods of Mind Control." Activist Post, July 1, 2013.
106. "Mind Control Scientists Claim Ability to Turn Off Consciousness." The Sleuth Journal, July 11, 2014.
107. Zimbardo, Dr. Philip G. "Mind Control: Psychological Reality or Mindless Rhetoric?" APA.org, November 2002.

প্রজন্ম পাবলিকেশনের আরো কিছু বই

ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	কয়েদী ৩৪৫ | গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর	সামী আলহায	২৩৫৳
২	আফিয়া সিদ্দিকী | গ্রে লেডি অব বাগরাম	টিম প্রজন্ম	২২০৳
৩	দ্য কিলিং অব ওসামা	সিমর হার্শ	২১৬৳
৪	আয়না | কাশ্মীরের স্ব[illegible] প্রতিচ্ছবি	আফজাল গুরু	৩২০৳
৫	আজাদির লড়াই | কাশ্মীর কেস ফর ফ্রিডম	অরুন্ধতী রায়	২০৪৳
৬	উইঘুরের কান্না	মহসিন আব্দুল্লাহ	২৬৪৳
৭	অ্যাম্বাসেডর	আব্দুস সালাম জাইফ	২৩৫৳
৮	পার্মানেন্ট রেকর্ড	এডওয়ার্ড স্নোডেন	৩৫০৳
৯	মুখোশের অন্তরালে	নাজমুল চোধুরী	৩০০৳
১০	মোসাদ এক্সোডাস	গ্যাড সিমরণ	২৫০৳
১১	পুঁজিবাদ	অরুন্ধতী রায়	১৭৫৳
১২	জাতীয়তাবাদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫০৳
১৩	গুজরাট ফাইলস	রানা আইয়ুব	৩০০৳
১৪	দ্য রোড টু আল-কায়েদা	মুনতাসির আল-যায়াত	৩৩০৳
১৫	মৌলবাদী নাস্তিক	কাজী ম্যাক	২৮০৳
১৬	একটি ফাঁসির জন্য	অরুন্ধতী রায়	৩৩০৳
১৭	নয়া পাকিস্তান	তীলক দেভাশের	৩২০৳
১৮	ইলুমিনাতি এজেন্ডা ২১	ডীন ও জীল হ্যান্ডারসন	
১৯	এনিমি কমব্যাটান্ট	মোয়াজ্জেম বেগ	
২০	ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা	এস.এম. মুশরিফ	
২১	ম্যালকম এক্স | নির্বাচিত বাণী	ম্যালকম এক্স	৪০০৳
২২	পেট্রোডলার ওয়ারফেয়ার	উইলিয়াম ক্লার্ক	
২৩	বাউন্ডিং দ্য গ্লোবাল ওয়ার অন টেররিজম	জেফরি রেকর্ড	
২৪	ডিরেক্টরেট এস	স্টিভ কোল	
২৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব | বিপ্লবী ভাষণ	আহমদ মুসা	৩৫০৳
২৬	শেখ মুজিবুর রহমান | নির্বাচিত বাণী	আহমদ মুসা	২০০৳
২৭	এফবিআই'স মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান	দাউদ গজনভী	
২৮	না বলতে শিখুন	ওয়াহিদ তুষার	৩০০৳

মূল্য
২০০৳
২২০৳
২১৬৳
৩২০৳
২০৪৳
২৬৪৳
২৩৫৳
৩৫০৳
৩০০৳
২৫০৳
১৭৫৳
১৫০৳
৩০০৳
৩৩০৳
২৮০৳
৩৩০৳
৩২০৳
৪০০৳
৩৫০৳
২০০৳
৩০০৳

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। বিশ্বের মানুষ এবং নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্ষমতা দখল আর প্রভাব বিস্তারের জন্য আর কোনো যুদ্ধ হবে না। আসলেই হয়নি। ওদিকে ফুকুয়ামা দাবী করে বসলেন, এ সভ্যতা পূর্ববর্তী সব সভ্যতার ভালোটা নিয়ে সবচেয়ে সেরা সভ্যতা। এর চেয়ে ভালো কিছু হবে না, হতে পারে না। বিশ্বও সানন্দে মেনে নিলো ফিরিঙ্গিদের শ্রেষ্ঠত্ব, ভাসতে চাইল স্বাধীনতার ভেলায়।

পাঠক! আপনিও কি তাদের একজন? আপনিও কি সেই নতুন পৃথিবীর স্বাধীন মানুষ? আমি আগাম দুঃখিত, বইটি আপনাকে হতাশ করবে। আপনি কি সত্য জানতে চান? তাহলে বইটি আপনার চিন্তার খোরাক যোগাবে।

বইটি শুরুই হবে আজকের 'মহান' সভ্যতার ভয়াবহ অতীত দিয়ে। দেখাবে, কীভাবে অতীত থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে। একে একে আপনি পরিচিত হতে থাকবেন আপনার মানসিকতা, চিন্তা নিয়ন্ত্রণের ভয়াবহ সব পদ্ধতি, শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, নজরদারী, ভয়াবহ সব শারীরিক এক্সপেরিমেন্ট ও মাফিয়া-গডফাদারদের সাথে। পৃথিবীর নিকৃষ্টতম নাজি বিজ্ঞানীদের পূণর্বাসন, ওরওয়েলিয়ান স্টেটের চেয়েও জঘন্য মানের নজরদারী দেখে আপনার মনে হবে, এ সভ্যতা পূর্ববর্তী সব সভ্যতার খারাপটা নিয়ে সবচেয়ে জঘন্য সভ্যতা।

ও হ্যাঁ, আপনার জঘন্য মনে হবে না। কেননা তারা এটাও নিশ্চিত করেছে, আপনি যেন অবচেতন মনেই দাসত্বকে স্বাধীনতা, যুদ্ধকে শান্তি, অজ্ঞতাকেই শক্তি হিসেবে মেনে নেন—ঠিক যেমন জর্জ ওরওয়েল বলেছেন। নোম চমস্কি ঠিকই বলেছিলেন, "স্বৈরাচারি রাষ্ট্রের হাতিয়ার মেশিনগান, আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্ত্র হলো Mind Control বা বিবেক নিয়ন্ত্রণ।"

পাঠক! স্বাগতম আপনাকে।

BDT ৳ 330
USD $ 20

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-95187-1-6